অতিপ্রাকৃত কাহিনি

অভিশপ্ত রক্ত

আফজাল হোসেন

BanglaBook.org

অতিপ্রাকৃত কাহিনি

অভিশপ্ত রক্ত

আফজাল হোসেন

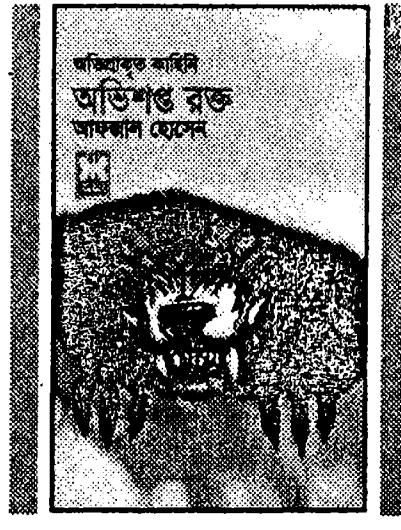

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

অতিপ্রাকৃত কাহিনি

অভিশপ্ত রক্ত

আফজাল হোসেন

মাঝে-মাঝে আমরা এমন কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার
মুখোমুখি হই যে চেনা জগৎটাকেই অচেনা মনে হয়।
থমকে ভাবি, যা দেখছি, যা শুনছি, যা অনুভব করছি
তা কি সত্যি? নাকি এর গভীরে এমন কিছু রহস্য
লুকিয়ে রয়েছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।
এমনই কিছু অতীন্দ্রিয়, ব্যাখ্যাতীত, অতিপ্রাকৃত কাহিনি
স্থান পেয়েছে এই সঙ্কলনে।
নিখাদ মৌলিক, বিচিত্র ও ভিন্ন স্বাদের এই অতিপ্রাকৃত
কাহিনিগুলোর জগতে সববয়সী পাঠক-পাঠিকাকে আমন্ত্রণ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী. শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ABHISHAPTO RAKTO
A Collection of Supernatural Stories
By: Afzal Husain

আটাশি টাকা

সূচী

প্রায়শ্চিত্ত	৫
ঘুমবাড়ি	৩০
কালো সিন্দুক	৬৪
শুকনো গোলাপ	৭৩
পিশাচবাড়ি	৯০
মৃত্যু	১২৭
প্রেয়সী	১৩৮
দুঃস্বপ্ন	১৬৫
অপঘাত	১৭০
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ	২০২
অভিশপ্ত রক্ত	২১৭

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রায়শ্চিত্ত

সুতীব্র শীতের কুয়াশা-ঢাকা আবছায়া অন্ধকার রাত। পৌনে বারোটার মত বাজে। ঘন কুয়াশার বুক চিরে মোবারক হোসেন বাড়ি ফিরছেন। মোবারক হোসেনের হাতে পাঁচ ব্যাটারির বড় টর্চ। টর্চের আলো ফেলে-ফেলে তিনি এগোচ্ছেন। কুয়াশার শামিয়ানা ভেদ করে সেই আলো তেমন একটা বিস্তার লাভ করছে না।

মোবারক হোসেনের পরনে খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির উপর হাফ হাতা সোয়েটার। তার উপর শাল জড়ানো। মাথায় বাঁদুরে টুপি। পায়ে জুতো। হাতে দস্তানা। এর পরও তিনি শীতে খুবই কাবু। যেন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছেন।

মোবারক হোসেন নবাবপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই অঞ্চলের খুবই গণ্যমান্য একজন ব্যক্তি। লোকে তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাঁর ন্যায়-নীতি, আদর্শ, সততার সুনাম সবার মুখে-মুখে। আশপাশের অন্তত দশ গ্রামের বিচার-সালিসিতে তাঁর ডাক পড়ে। আজও গিয়েছিলেন পাশের গ্রাম বাছিতপুরের মিয়া বাড়িতে একটা সালিসি করতে।

সালিসির বিষয় খুবই নোংরা। বাছিতপুরের হতদরিদ্র রহিমা বেগমের বাপ মরা মেয়ে রেবা, মিয়া বাড়িতে অনেক দিন ধরে ঝিয়ের কাজ করত। মেয়েটার বয়স আঠারো-উনিশ। হারুন মিয়ার বড় ছেলে শামসু নাকি প্রেমের অভিনয় করে, বিয়ের

আশ্বাস দিয়ে, ফুসলিয়ে দিনের পর দিন সহজ-সরল রেবাকে ভোগ করে। এক পর্যায়ে রেবা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। লোক জানাজানি হয়। শামসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু শামসু সব অভিযোগ অস্বীকার করে। সব মিথ্যে বানোয়াট বলে দাবি করে। রাগে ফেটে পড়ে। অন্য কারও পাপ তার মাথায় চাপিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখানোয় রাগে অন্ধ হয়ে রেবা এবং রেবার মা রহিমা বেগমের উপর চড়াও হয়। প্রচণ্ড মারধর করে। মেরে রহিমা বেগমের পা ভেঙে দেয়। রেবার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এই নিয়ে সালিসি।

মিয়ারা এই অঞ্চলের খুবই দাপুটে, প্রভাবশালী আর অবস্থাসম্পন্ন ধনী পরিবার। তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারও নেই। হারুন মিয়ার ছেলে শামসু যে সত্যিই রেবা মেয়েটার সর্বনাশ করেছে এটা সবাই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বুঝেও কারও কিছু করার নেই। বিচারে উল্টো রেবাকে নষ্টা, চরিত্রহীনা সাব্যস্ত করে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। রেবা, রেবার মা, সালিসদারদের হাত-পা ধরে অনেক কান্নাকাটি করে এতটা অবিচার তাদের উপর না করার জন্য। গ্রাম ছেড়ে তারা কোথায় যাবে! কোথায় থাকবে! কী করবে! কী খাবে!

সালিসি শেষে মিয়া বাড়িতে সালিসদারদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। পোলাও, গলদা চিংড়ি, বড়-বড় তেল কৈ, হাঁসের মাংস, গিলা-কলিজা-চামড়া দিয়ে করা মুগ ডালের ঘন্ট আর সব শেষে খেজুরের রসের পায়স।

ভর পেট খাওয়া শেষে সবাই হাসি মুখে মিয়া বাড়ি থেকে বিদায় নেয়।

BanglaBook.org

কৃষ্ণার খালের সাঁকো পেরুলেই ওপারে নবাবপুর গ্রামের শুরু। মোবারক হোসেন সাঁকো পেরিয়ে ওপারে যাবেন। সাঁকোটা বেশ

নড়বড়ে হয়ে গেছে। অনেক দিন হলো মেরামত হয়নি। সাঁকোতে উঠতেই সাঁকোটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে আপত্তি জানাল।

খুব সাবধানে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে মোবারক হোসেন সাঁকো পেরোতে লাগলেন। তিনি সাঁকোর মাঝ বরাবর পৌঁছে গেছেন। নীচে খালের কালো পানি টলমল করছে। শীতকাল বলে খালে পানি খুব একটা বেশি নেই। বড় একটা কী মাছ যেন হঠাৎ ঘাই মারল। টর্চের আলো ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন মোবারক হোসেন। ঘাই-মারা জায়গাটা থেকে অসংখ্য বুদ্বুদ উঠছে। বড় কোনও মাছ বোধহয়।

বুদ্বুদের সঙ্গে পানির নীচ থেকে কী যেন একটা ভেসে উঠছে। মাছই বোধহয়। পানির উপর থেকেই হালকা রূপালী রঙ বোঝা যাচ্ছে। পানির নীচ থেকে রূপালী জিনিসটা সম্পূর্ণ উপরে ভেসে উঠল। মুহূর্তে মোবারক হোসেনের চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল। মাছ-টাছ কিছু নয়, ছোট একটা বাচ্চার লাশ! লাশটার গায়ের রঙ অতিরিক্ত ফ্যাকাসে বলে পানির নীচে যখন ছিল তখন রূপালী রঙের মাছ মনে হয়েছে।

বাচ্চাটা ভেসে আছে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে। খুবই ছোট আর শীর্ণকায়। বোধহয় নির্দিষ্ট সময়ের আগে মায়ের পেট থেকে গর্ভপাত হওয়া অপরিণত বাচ্চা। পেটের নীচে নাভি থেকে একটা নাড়ীও ঝুলছে। মায়ের পেটে থাকাকালীন ওই নাড়ীর মাধ্যমেই মায়ের শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

কার না কার বাচ্চা, কোথা থেকে ভেসে এসেছে কে জানে?! বাচ্চার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনরাও বা কেমন, মরা বাচ্চাটাকে এভাবে খালে ভাসিয়ে না দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিতেও তো পারত। মোবারক হোসেন এসব ভাবতে ভাবতে যে মুহূর্তে বাচ্চাটার ভাসমান লাশ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে গেলেন ঠিক তখনই বাচ্চাটা যেন একটু নড়েচড়ে উঠল। পরক্ষণেই ঝট করে

BanglaBook.org

উপুড় হওয়া মাথাটা তুলল। মুখটা দেখা গেল। মোবারক হোসেনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এ কী দেখছেন তিনি! যা দেখছেন তা কি সত্যি, নাকি বিভ্রম?

বাচ্চার মুখটা দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর। বিড়ালের মত জ্বলজ্বলে নীলাভ চোখ। মুখের চামড়া বুড়ো মানুষের মত ভাঁজ-ভাঁজ, কুঁচকানো। এতই কুঁচকানো যে মুখ-নাক আলাদা করা যায় না। ভয়ঙ্কর চেহারার বাচ্চাটা পানিতে হাত-পা নেড়ে সাঁতার কেটে সাঁকোর খুঁটির কাছে চলে এল। খুঁটি বেয়ে ধীরে-ধীরে উপরে উঠতে লাগল। ভয়ে পাথরের মত জমে-যাওয়া মোবারক হোসেন কোনওক্রমে পায়ে সাড় এনে ছুটে পালানোর জন্য পা চালালেন। অমনি হুড়মুড় করে সাঁকোটা ভেঙে পড়ল। তিনি পানিতে পড়ে গেলেন। অবশ্য খালের কিনারা ঘেঁষে। শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় বোধহয় ছোট-খাট চোট লেগেছে। সেদিকে আমল না দিয়ে তিনি খালের পাড় বেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে লাগলেন। প্রায় পাড়ের উপরে উঠে গেছেন এমন সময় টের পেলেন, পিছন থেকে কে যেন তাঁর ডান পা-টা জড়িয়ে ধরেছে। তিনি মাথা ঘুরিয়ে দেখেন সেই ভয়ঙ্কর চেহারার বাচ্চাটা। আতঙ্কে হাউমাউ করে উঠে জোরে-জোরে পা ছুঁড়ে তিনি পা থেকে বাচ্চাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন। বাচ্চাটা মুখটা বিকট হাঁ করে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর গা শিউরানো খিক-খিক শব্দে হেসে উঠল। বাচ্চাটার মুখ ভর্তি কাঁচির আলের মত অসংখ্য ছোট-ছোট দাঁত। দাঁতগুলো দেখতে কিছুটা তরমুজের বিচির মত। এক পর্যায়ে প্রচণ্ড আক্রোশে বাচ্চাটা তাঁর পায়ে কামড় বসাল। তিনি তীব্র ব্যথায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠে জ্ঞান হারালেন।

BanglaBook.org

দুই

খুব ভোরবেলা ভাঙা সাঁকোর পাশে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা মোবারক হোসেনকে উদ্ধার করল গ্রামবাসীরা। জল-কাদায় তাঁর সমস্ত শরীর মাখামাখি। গ্রামবাসীরা তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেল।

মোবারক হোসেনের ডান পায়ের গোড়ালির উপরে বড় একটা জখম ছাড়া তাঁর শরীরের অন্যান্য জায়গায় তেমন কিছু হয়নি। সামান্য ছড়ে-ছিলে গেছে। তবে পায়ের জখমটা মারাত্মকই বলা যায়। অনেকখানি জায়গা নিয়ে দগদগে ঘায়ের মত ক্ষত। উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তাররা পায়ের ক্ষতস্থানটা ভালভাবে পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছেন।

মোবারক হোসেনের জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফিরতেই তিনি ভয়ার্ত চোখে ফ্যাল-ফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে পাশে দেখে বোধহয় আশ্বস্ত হলেন। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি এখন কোথায়?'

মোবারক হোসেনের স্ত্রী সালেহা বেগম মোবারক হোসেনের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সাঁকো ভেঙে পড়লে কী করে?'

প্রশ্নটা শুনে মোবারক হোসেনের চোখের আতঙ্কিত ভাবটা আবার ফিরে এল। তিনি চুপ করে রইলেন। কিছু বললেন না।

সালেহা বেগম বলতে লাগলেন, 'রাতে তুমি না ফেরায় দুশ্চিন্তা আর ভয়ে আমাদের যে কী অবস্থা হয়েছিল! ভেবে অস্থির হয়ে

BanglaBook.org

উঠি, কেন তুমি ফিরছ না! কী হলো তোমার! তবে কি রাত বেশি হয়ে গেছে বলে মিয়া বাড়িতেই থেকে গেছ? ঘরে কোনও পুরুষ লোক না থাকায় কাউকে যে তোমার খোঁজে পাঠাব সেটাও সম্ভব হয়নি। অত রাতে কাকে বলব তোমার খোঁজ নিতে? ঘরে আমরা তিনজন মেয়ে মানুষ–আমাদের পক্ষে তো অত রাতে ঘর থেকে বেরুনো সম্ভব নয়। রাতটা যে কীভাবে কেটেছে! এখন তোমার কেমন লাগছে? ডাক্তাররা বলেছেন তেমন কোনও আঘাত লাগেনি। ইচ্ছে করলে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি।'

মোবারক হোসেন বসে-যাওয়া গলায় বললেন, 'বাড়ি চলে যাওয়ার ব্যবস্থাই করো।'

মোবারক হোসেনের বড় মেয়ে দিনা আহ্লাদি গলায় বলল, 'বাবা, তুমি আর রাত-বিরাতে বিচার-সালিসি করতে যেতে পারবে না। তুমি বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত রাতে ভয়ে আমরা ঘুমাতে পারি না। আজ যদি তোমার মারাত্মক কিছু হয়ে যেত!'

মোবারক হোসেন আদরমাখা গলায় বললেন, 'কেন, মা, কীসের ভয় পাস?'

দিনা বলল, 'চোর-ডাকাতের ভয় পাই। তোমার জন্য দুশ্চিন্তা হয়।'

'নারে, মা, চোর-ডাকাতের ভয় পেতে হবে না। আমার বাড়িতে চোর-ডাকাত আসবে না। শুধু আমাদের গ্রামে নয় আশপাশের অন্তত দশ গ্রামের মানুষ আমাকে ভালবাসে, সম্মান করে। কাল তো মিয়া বাড়িতে বসে সবাই ধরল, আগামী ইলেকশনে আমাকে দাঁড় করানোর জন্য।'

মোবারক হোসেন সেদিনই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বাড়ি চলে আসেন। তাঁর পায়ের ক্ষতটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। দু'-এক দিনের মধ্যেই বোধহয় স্কুলে যোগ দিতে পারবেন। এক সপ্তাহের জন্য স্কুল

BanglaBook.org

থেকে ছুটি নিয়েছেন। সারা দিন বাড়িতেই শুয়ে-বসে কাটান। এভাবে তাঁর ভাল লাগছে না। স্কুলে অন্যান্য শিক্ষকদের উপর খবরদারি করা, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়া, বিভিন্ন বিচার-সালিসি করা–এর মধ্যে আলাদা এক মজা আছে।

সেই রাতে সাঁকো ভেঙে পড়ে যাওয়ার সময় কী-কী ঘটেছিল পুরোটা কাউকে বলেননি তিনি। বিশেষ করে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর চেহারার শিশুটার কথা। ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলেছেন। তিনি গ্রামের অতি গণ্য-মান্য একজন ব্যক্তি, সবাই তাঁকে আগামী ইলেকশনে চেয়ারম্যান পদে দাঁড় করাতে চাইছে–এমন মুহূর্তে ওসব কথা জানাজানি হলে একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার ঘটবে। কেউ ভাববে তাঁর মাথায় সমস্যা আছে, কেউ আবার তাঁকে ভূতে-পাওয়া ভাববে। তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তিনি ভয়ঙ্কর চেহারার শিশুটার কথা নিজের মধ্যেই গোপন রেখেছেন। স্ত্রী-মেয়েদেরকেও বলেননি।

মোবারক হোসেনের বাড়িটা দোতলা টিনশেড। দোতলার পাশাপাশি দু-কামরায় দু-মেয়ে থাকে। নীচ তলায় রান্নাঘর, খাবারঘর, বসারঘর এবং তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর শোবারঘর।

মোবারক হোসেন নীচতলার খোলা বারান্দায় কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন। মাগরিবের নামাজ পড়ে তিনি বারান্দায় এসে বসেছেন। স্ত্রীকে চা দিতে বলেছেন। তাঁর স্ত্রী সালেহা বেগম রান্নাঘরে চা বানাতে গেছেন। মেয়েরা দোতলায়। তিনি একা-একা বসে আছেন। ধীরে-ধীরে তরল অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল উঠানের নারকেল গাছটার দিকে। নারকেল গাছটা বেয়ে কী যেন একটা উপরে উঠছে। বিড়াল বা কাঠবিড়ালি জাতীয় কিছু হবে হয়তো। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র কালো একটা শারীরিক অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ভালভাবে লক্ষ্য করে তিনি চমকে উঠলেন। বিড়াল বা কাঠবিড়ালি জাতীয় কিছু নয়, একটা ছোট্ট বাচ্চা! সেই রাতে সাঁকোর কাছে দেখতে-পাওয়া সেই বাচ্চাটা। মুহূর্তে তিনি মাঘ মাসের শীতেও ঘেমে-নেয়ে উঠলেন। গা থেকে চাদরটা খুলে ফেললেন। বাচ্চার অবয়বটা ধীরে-ধীরে নারকেল গাছের মাথায় পৌঁছে মাথার ঝোপের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সালেহা বেগম চা নিয়ে বারান্দায় এসে মোবারক হোসেনের চেহারা দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার? এমন দেখাচ্ছে কেন!'

মোবারক হোসেন বসা গলায় বললেন, 'না, কিছু না।' এরপরই গলা খাঁকারি দিতে লাগলেন। যেন গলায় কফ জমে আছে, গলা পরিষ্কার করছেন।

'কিছু না, তবে তোমার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন? কপালে ঘাম, মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—যেন কোনও কিছু দেখে ভয় পেয়েছ।'

মোবারক হোসেন বিরক্ত-হওয়া গলায় বললেন, 'বললাম তো কিছু না। চা এনেছ? চা দাও।'

সালেহা বেগম বললেন, 'কয়েকটা কুমড়ো ফুলের বড়াও ভেজে এনেছি। তাই তো চা নিয়ে আসতে দেরি হলো।'

মোবারক হোসেন কুমড়ো ফুলের বড়া নিলেন না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ছোট-ছোট চুমুক দিতে লাগলেন। এমন সময় বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে স্কুলের দপ্তরি সালামের গলার আওয়াজ ভেসে এল, 'ও ছ্যর, ছ্যর, ছ্যর বাড়িতে আছেন?'

মোবারক হোসেন গলার স্বর উঁচু করে ডাকলেন, 'কে, সালাম নাকি? আসো, এদিকে আসো।'

উঠান পেরিয়ে দপ্তরি সালাম বারান্দায় এসে পৌঁছল।

'সালামালিকুম, ছ্যর। ছ্যরের শইলডা এহন কেমন, হেই

BanglaBook.org

খোঁজ নিতে আইলাম।'

'বসো, সালাম, বসো। শরীর এখন বেশ ভাল। দু'-এক দিনের মধ্যেই মনে হয় স্কুলে জয়েন করতে পারব।' সালেহা বেগমের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'যাও, সালামের জন্য চা নিয়ে আসো।' কুমড়ো ফুলের বড়া ভরা প্লেটটা সামনেই, সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, বড়া খাও। তোমার ভাবি এই একটু আগে ভেজে এনেছে। এখনও বোধহয় গরম আছে।'

মোবারক হোসেন দপ্তরি সালামকে খুবই পছন্দ করেন। সালাম তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন লোক।

সালাম মোড়ায় বসে প্লেট থেকে বড়া তুলে নিয়ে কামড় বসিয়ে চিবোতে-চিবোতে বলল, 'ঘটনা হুনছেন, ছ্যর?'

'কী ঘটনা?'

'বাছিতপুরের মিয়া বাড়িতে হেইদিন যে রহিমা আর রহিমার মাইয়্যার সালিসিতে গেছিলেন, হেই রহিমা আর রহিমার মাইয়্যা রেবা আইজ ট্রেনের নীচে কাটা পইড়্যা মারা গেছে। সবাই কয়, মনে অয় আত্মহত্যা করছে।'

'কী বলো! মা-মেয়ে দু'জনেই ট্রেনের নীচে পড়ে আত্মহত্যা করেছে!!'

'হ, ছ্যর। ভালই হইছে! রহিমার মাইয়্যা রেবা মাগি তো একটা খানকি আছিল। দেহেন না, কার না কার লগে আকাম-কুকাম কইরা পেট বাধাইছিল। হের পর মিয়া বাড়ির পোলার ঘাড়ে চাপাইতে চাইছিল। মনে করছে যদি কিচু জরিমানা আদায় করন যায়। তা তো হেদিন সালিসিতে অগো গ্রাম ছাড়নের নির্দেশ দেয়া হয়। হেই কারণেই মনে হয় আত্মহত্যা করছে। গ্রাম ছাইড়্যা যাইবে কোতায়! তয় খানকি পাড়ায় গিয়া উঠতে পারত।'

মোবারক হোসেনের মনটা খারাপ হলো। সেদিন সালিসিতে রহিমা আর রহিমার মেয়েকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ

BanglaBook.org

দেবার প্রসঙ্গ প্রথমে তিনিই তুলেছিলেন। ইচ্ছে করলে অন্য কোনও শাস্তিও দেয়া যেত। একশো একবার জুতো পেটা করা। অথবা মাথার চুল কামিয়ে দেয়া। অথবা এক ঘরে করা। বিচারে ওসব নির্দেশ না দিয়ে আগ বাড়িয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়ার পেছনে তাঁর মনের গোপনে সূক্ষ্ম একটা উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো মিয়া বাড়ির লোকদের খুশি করা। ইলেকশনে জিততে হলে মিয়া বাড়িওয়ালাদের মত প্রভাবশালীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয়।

দপ্তরি সালাম এক-এক করে প্লেটের সব ক'টা কুমড়ো ফুলের বড়া শেষ করার পর আয়েশ করে চা খেল। এরপর পান মুখে দিয়ে উঠল। যাওয়ার আগে বলল, 'ছ্যর, যত তাড়াতাড়ি পারেন স্কুলে আসা ধরেন। আফনে নাই, ভারপ্রাপ্ত হেড মাস্টার জলিল ছ্যরের যা ভাবভঙ্গি! যেন স্কুলটাই হের! সময় মত ঘণ্টা পেটাইতে হইব, একটু এদিক-ওদিক হইলে চলবে না! ছ্যরেগো ঘণ্টা পড়ার লগে-লগে ক্লাসে ঢুকতে হইব! ক্লাস চলাকালীন তিনি আবার বারান্দায় ঘুইরা-ঘুইরা দেহেন কোন্ ছ্যর কেমন পড়াইতেছে। ছ্যরেরা বা অন্য কেউ স্কুলের বারান্দায় বা স্কুল কম্পাউণ্ডের ভিতরে বইস্যা সিগ্রেট-বিড়ি খাইতে পারবে না! এহানে-সেহানে পানের পিক ফেলান যাইবে না! ঝামেলার একসা! দুই দিনের বৈরাগীর এত নাচার দরকার কী!'

BanglaBook.org

তিন

মোবারক হোসেনের বড় মেয়ে দিনা হাজী আব্দুল কাদের কলেজের ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। ছোট মেয়ে মিনা ক্লাস টেনে

পড়ে। দুই বোনের মধ্যে খুব ভাব। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে তারা দু'জন অনেকক্ষণ গুটুর-গুটুর নানান গল্প করে। তাদের দু'জনার কামরা দোতলায় পাশাপাশি। ঘুম চলে আসার পর যে যার কামরায় ঘুমাতে চলে যায়।

আজও দু-বোন গল্প করছে। হঠাৎ দিনা গল্প থামিয়ে কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করতে লাগল। তার মনে হচ্ছে ঘরের টিনের চালের উপর কেউ খুব সাবধানে পা টিপে-টিপে হাঁটছে। মচ-মচ মৃদু শব্দ হচ্ছে। সে খুবই ভীতু টাইপের মেয়ে। ভয়ে জড়সড় হয়ে ফিস-ফিস করে মিনাকে বলল, 'ঘরের চালের উপর কেউ রয়েছে! আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছে!'

মিনা হাসতে হাসতে বলল, 'কে থাকবে?!! কী যে বলো, আপু! বিড়াল-টিড়াল হবে হয়তো।'

'নারে, কেউ আছে! সে শুধু আমাদের কথাই শুনছে না, আমাদেরকে দেখছেও! আমার যেন কেমন গা ছমছম করছে!'

'আপু, তুমি যে কী! কে আমাদের দেখবে?! ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ, কীভাবে দেখবে?'

'জানি না! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কেউ আমাদের দেখছে।'

'বুঝেছি, তোমার ঘুম পেয়েছে। ওঠো, আজ আর গল্প করার দরকার নেই। যে যার রুমে ঘুমাতে চলে যাই। এমনিতেও আজ যা শীত পড়েছে, লেপের ভিতরে ঢুকলেই আরাম।'

যে যার কামরায় ঘুমাতে চলে গেল। দিনার গা ছমছমে ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। তার বার-বারই মনে হচ্ছে কেউ তাকে আড়াল থেকে দেখছে। সে লেপের ভিতর ঢুকে লেপ মুড়ি দিয়ে ফেলল।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে, দিনার চোখে ঘুম নেই। মিনা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনার কামরা থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

হঠাৎ দিনার মনে হলো কেউ তার খাটের নীচে রয়েছে। মৃদু খচ-মচ আওয়াজ হচ্ছে। এই তো, আবার কাগজ ছেঁড়ার মত শব্দ হচ্ছে। দিনা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। শক্ত কাঠ হয়ে পড়ে রইল। লেপের নীচ থেকে মুখ বের করে মিনাকে যে ডাকবে তাও সাহসে কুলাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ বাদে সমস্ত আওয়াজ থেমে গেল। নেমে এল ভুতুড়ে নীরবতা। দিনা শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে লেপের ভিতর থেকে বের হয়ে উঠে বসল। তার খুব পিপাসা পেয়েছে। টেবিলের উপর পানি ভর্তি জগ আর গ্লাস রয়েছে।

দিনা বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালল। ঘর আলোকিত হতেই মনে হলো, টেবিলের নীচ থেকে কিছু একটা চোখের পলকে খাটের নীচে গিয়ে লুকোল। দিনার বুকটা ধক করে উঠল। পরক্ষণেই ধরে ফেলল আসলে কী ব্যাপার। বুঝতে পারল খাটের নীচে এতক্ষণ কীসের আওয়াজ হয়েছে।

দিনার খাটের নীচে অনেকগুলো বই রয়েছে। সরকারি বই। সরকারের তরফ থেকে এই বই বিনা মূল্যে স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য দেয়া হয়েছে। তার বাবা নামে মাত্র কিছু বই ছাত্রদের মধ্যে বিলি করে বাকিটা বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। মিনার খাটের নীচেও রাখা হয়েছে। তার বাবা-মায়ের খাটের নীচেও আছে। অনেক বই। বইয়ে ঘর বোঝাই। বইগুলো কয়েক দিনের মধ্যে শহরের লাইব্রেরী থেকে লোক এসে রাতের আঁধারে ভ্যান বোঝাই করে নিয়ে যাবে। দর-দাম আগেই ঠিক করে রেখেছে। বেশ মোটা অংকের টাকা পাবেন তার বাবা।

সেই নতুন বইয়ের গন্ধেই বোধহয় খাটের নীচে ইঁদুর এসে জুটেছে। এতক্ষণ সে ইঁদুরের বই কাটার আওয়াজই পেয়েছে। অথচ সে মনে করেছে কী-না-কী! শুধু-শুধু ভয়ে আধমরা হয়েছে। আলো জ্বালার পরও একটা ইঁদুর টেবিলের নীচ থেকে ছুটে খাটের

BanglaBook.org

নীচে ঢুকেছে।

ইঁদুরের কাণ্ড বুঝতে পেরে মুহূর্তে দিনার মন থেকে সমস্ত ভয় কর্পূরের মত উবে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে খাটের নীচে উঁকি মারল। ইঁদুর কতগুলো বইয়ের সর্বনাশ করল দেখার জন্য।

হায়! হায়! ইঁদুর তো অনেকগুলো বই কেটে কুটি-কুটি করেছে। দিনা খাটের নীচে খানিকটা এগিয়ে গেল, আরও ভালভাবে দেখার জন্য। খাটের নীচটা বেশ অন্ধকার। তার মধ্যে স্তূপ-স্তূপ করে রাখা বই।

অন্ধকারে কিছুটা চোখ সয়ে আসতেই দিনার চোখে পড়ল বিড়ালের মত সাদা রঙের কী যেন একটা ঘাপটি মেরে খাটের নীচে এক কোনায় বসে আছে। চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে। ইঁদুর ধরার লোভে মনে হয় বিড়ালও এসে জুটেছে।

বিড়ালটা ধীরে-ধীরে দিনার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমশ দিনার চোখে প্রাণীটা স্পষ্ট হচ্ছে।

কী আশ্চর্য! ওটা তো বিড়াল নয়! খুবই ছোট একটা মানব শিশু!! যেন এই মাত্র মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছে! সমস্ত গা আঠাল তরলে মাখামাখি। গায়ের রঙ শ্বেতী রোগীদের মত। কুৎসিত ভয়ঙ্কর চেহারা। চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাচ্চাটা এসে লাফ দিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে দিনার গলা পেঁচিয়ে ধরল। দম বন্ধ হয়ে এল দিনার। হাঁস-ফাঁস করতে-করতে দিনা দু-হাতে টেনে বাচ্চাটাকে গলা থেকে ছাড়াতে চাইছে। কিছুটা আলগাও করে ফেলল। তারপর বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দিনার চিৎকার শুনে পাশের কামরা থেকে ধড়মড় করে মিনা জেগে উঠে ছুটে এল। দিনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে

BanglaBook.org

দেখে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল। নীচতলা থেকে তাদের বাবা-মাও ছুটে এলেন।

সবাই মিলে ধরাধরি করে দিনাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। চোখে-মুখে পানি ছিটানোর পর দিনার জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরতেই দিনা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বিকারগ্রস্তের মত এলোমেলো বকতে লাগল, 'বাচ্চা! বাচ্চা! ছোট একটা বাচ্চা! একেবারে ছোট বাচ্চা!...মানুষের বাচ্চার মত দেখতে, কিন্তু মানুষের বাচ্চা নয়! আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল! খাটের নীচে ছিল ওটা!'

মিনা এবং সালেহা বেগম, দিনাকে দু-পাশ থেকে আগলে ধরে মাথায়-পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে নানানভাবে বুঝিয়ে শান্ত করতে চাইছে। মোবারক হোসেন চিন্তিত মুখে খাটের নীচে টর্চের আলো ফেলে-ফেলে দেখতে-দেখতে বলতে লাগলেন, 'কই, খাটের নীচে তো কিছু নেই। তবে অনেকগুলো বই ইঁদুরে কেটেছে। মনে হয় ইঁদুর দেখেই ভয় পেয়েছে। অনেক সময় বড়, ধাড়ি ইঁদুর প্রায় মানুষের ছোট বাচ্চার সাইজের হয়। নাকি কোনও বিড়াল ছিল কে জানে...'

মোবারক হোসেন মুখে ওসব কথা বললেও মনে-মনে তিনি বেশ শঙ্কিত। তিনি নিজেই তো সেই রাতে সাঁকোর ওখানে ওরকম একটা ভৌতিক শিশুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। দু'দিন আগে সন্ধ্যায় উঠানের নারকেল গাছেও তো তিনি সেই শিশুটাকে দেখতে পেয়েছেন। তবে কি সেই রাতে সাঁকোর ওখান থেকে অশরীরীটা তাঁর পিছু নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত এসে গেছে? এখন বাড়ির অন্যান্যদের ভয় দেখাতে শুরু করেছে। ভাল একটা ওঝা ডেকে বাড়ি থেকে ভূত-প্রেত তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

BanglaBook.org

চার

মোবারক হোসেন নাম করা এক ওঝা ডেকে এনে বাড়িতে ঝাড়-ফুঁক করান। বাড়ির সীমানার চার কোনায় চারটা তাবিজ মাটিতে পুঁতে বাড়ি বন্ধ করান। এমনকী বাড়ির প্রত্যেকের জন্য শরীর বন্ধ তাবিজও গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দোয়া-দরুদ-মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়া মন্ত্রপূত গোলাপ জলের পানি সমস্ত বাড়িতে ছিটানো হয়। ওঝার মাধ্যমে এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাড়ি শুদ্ধি করানো হয়। এরপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে আর কোনও অস্বাভাবিকতার মুখোমুখি হয়নি বাড়ির কেউ। সব কিছু আবার আগের মত স্বাভাবিক নিয়মে চলছে।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙার পরপরই দিনা টের পেল তার শরীরটা ভীষণ ম্যাজম্যাজ করছে। সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা। সকালে নাস্তার টেবিলে বসেও কিছু খেতে পারল না। খাবার মুখের সামনে নিলেও বমি পায়। ওয়াক-ওয়াক করে দু'-দু'বার বমি করার মত অবস্থা হলো। তাই দেখে সালেহা বেগম চিন্তিত মুখে মেয়ের দিকে তাকালেন। দিনার চোখ-মুখ বেশ ফোলা-ফোলা। যেন তার শরীরে পানি এসেছে। চোখের নীচে কালি জমেছে। চোখ দুটো লাল। ঠোঁট ফ্যাকাসে।

সালেহা বেগম এগিয়ে গিয়ে দিনার কপালে হাত রাখলেন। হাত রেখেই তিনি চমকে উঠলেন। দিনার গায়ে অনেক জ্বর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তখুনি তিনি দিনাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। এরপর ঘণ্টা খানিক দিনার মাথায় পানি ঢাললেন। তাতে জ্বর কিছুটা কমল। দিনা ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি দিনার পাশ থেকে

BanglaBook.org

উঠে ঘরের কাজ, রান্না-বান্নায় মন দিলেন। বাড়িতে এই মুহূর্তে দিনা আর তিনি ছাড়া কেউ নেই। অবশ্য দিনার বাবা আর মিনা বাড়ি থেকে বের হবার আগে দিনার জ্বর দেখে গেছে। দিনার বাবা বলে গেছেন, মিনার কাছে তিনি জ্বরের ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেবেন। মিনা তার বাবার স্কুলেরই ছাত্রী। মিনা আজ দু'-একটা ক্লাস করেই স্কুল থেকে ফিরে আসবে।

সালেহা বেগম রান্নাঘরে রান্না করছেন। ডিম ভুনা করছেন। এমন সময় ঘরের ভিতরে দিনার ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি রান্না ফেলে দৌড়ে দিনার কাছে ছুটে এলেন। দিনা মাকে দেখে ভীত কাঁদো-কাঁদো গলায় বলতে লাগল, 'মা, মনে হলো বুকের উপর কেউ চেপে বসে আছে। আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে দেখি সেই ভয়ঙ্কর চেহারার বাচ্চাটা বুকের উপর বসে আছে।'

দিনার কথা শুনে সালেহা বেগম বুঝতে পারলেন দিনা জ্বরের ঘোরে উল্টোপাল্টা দেখেছে। তিনি দিনার কপালে হাত রেখে দরদ মাখা গলায় বলতে লাগলেন, 'মা, তোর গায়ে খুব জ্বর তো তাই ওসব দেখছিস। দিনের বেলা ভূত আসবে কোথেকে! এখনই মিনা জ্বরের ওষুধ নিয়ে চলে আসবে। ওষুধ খেলেই জ্বর কমে যাবে। তখন আর ওসব উল্টোপাল্টা দেখবি না।'

দিনা ব্যাকুল হয়ে বলল, 'বিশ্বাস করো, মা, ওটা সত্যিই আমার বুকের উপর চেপে বসা ছিল!! তোমার আসার শব্দ পেয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়! সত্যিই ছিল ওটা! আমি ভুল দেখিনি!'

সালেহা বেগম ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে দিনার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে বললেন, 'আচ্ছা, এখন চুপ করে একটু শুয়ে থাক। আমি তোর পাশেই আছি।'

BanglaBook.org

রাতে দিনার জ্বর প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল। সেই সঙ্গে পেটে ভয়ানক

ব্যথা। ব্যথায় সে কুঁকড়ে যেতে লাগল। আর জ্বরের ঘোরে বিভিন্ন প্রলাপ বকতে থাকল। জ্বরের ওষুধ বা মাথায় পানি ঢালা কোনও কিছুতেই জ্বর মোটেও কমছে না।

দিনার পাশে সালেহা বেগম আর মিনা জেগে বসে রয়েছে। মোবারক হোসেনও ছিলেন। একটু আগে তিনি ঘুমাতে গেছেন। জানেন আজ আর চোখে ঘুম আসবে না। এরপরও চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবেন। সকাল হবার অপেক্ষা করবেন। সকাল হলেই দিনাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তাররা দিনার শরীরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে পেটের আলট্রাসনোগ্রাফিও করেন। পেটের আলট্রাসনোগ্রাফিতে দেখা যায় দিনা গর্ভবতী। পেটে তিন মাসের বাচ্চা। বিষয়টা তাঁরা মোবারক হোসেন এবং সালেহা বেগমকে জানান।

কথাটা শোনার পর সালেহা বেগম কান্নায় ভেঙে পড়েন। হায়! হায়! তাঁর মেয়ের এমন সর্বনাশ কে করল?! মোবারক হোসেন রাগে পাগলের মত হয়ে যান। মুহূর্তে মেয়ের প্রতি সমস্ত ভালবাসা রূপ নেয় ঘৃণায়। লোক জানাজানি হলে সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে? সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন। সালেহা বেগমের সঙ্গে অনেকক্ষণ গর্জানোর পর নিজেকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে বলেন, 'হারামজাদীরে জিজ্ঞেস করো—কার সঙ্গে লষ্টামি করে এই অবস্থা। শিগ্‌গির জানো। সেই শুয়োরের বাচ্চারে ধরে এনে এক্ষণ বিয়ের ব্যবস্থা করি।'

দিনা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেডে শোয়া, বেডের পাশে সালেহা বেগম বসা। দিনার শারীরিক অবস্থা এখন কিছুটা ভাল। তবে সে

BanglaBook.org

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তার পেটে তিন মাসের বাচ্চা–ব্যাপারটা সে নিজেও এখন জানে। বিষয়টা জানার পর থেকে সে অপ্রকৃতিস্থের মত আচরণ করছে। চিৎকার করে-করে কেঁদে উঠছে। আবার কিছুক্ষণ বিড় বিড় করছে। পরক্ষণেই খলখল করে হাসছে। কখনও আবার অস্থির হয়ে উঠছে। চিৎকার, চেঁচামেচি, উদ্দেশ্যহীনভাবে কাউকে গালি-গালাজ করছে। ডাক্তার, নার্স কেউ কাছে এলে তাঁদেরকে আঁচড়, খামচি, কামড় দিতে চাইছে। তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেডে বেঁধে রাখা হয়েছে। ডাক্তাররা বলছেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন। সে যে প্রেগন্যান্ট এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তাই সে সাময়িকভাবে স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

সালেহা বেগমের দিনার পাশে বসে থাকতে বেশ ভয়-ভয় লাগছে। হাত-পা বাঁধা বলে কিছুটা ভরসা পাচ্ছেন। নিজের মেয়েকে তিনি যেন চিনতেই পারছেন না! দিনার চেহারায় কেমন বিকৃতি চলে এসেছে। মুখ কিছুটা বাঁকা হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোনা বেয়ে নামছে লালা। গলা দিয়ে বেরোচ্ছে আহত পশুর মত ঘড়-ঘড় শব্দ।

সালেহা বেগম ভয়ে-ভয়ে দিনার কপালে হাত রাখলেন। দিনা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল, কপালে হাত রাখার সঙ্গে-সঙ্গে ঝট করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কী ভয়ঙ্কর কলজে হিম করা চাউনি! সালেহা বেগম কেঁপে উঠে হাত সরিয়ে ফেললেন। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোর এখন কেমন লাগছে?'

দিনা কিছু বলল না। তবে গলা দিয়ে বের-হওয়া ঘড়-ঘড় শব্দ থেমে গেল।

সালেহা বেগম আবার সংকুচিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোর এমন সর্বনাশ কে করল? কার পাপের ফল তোর পেটে?'

দিনা এবারেও কিছু বলল না। এক দৃষ্টে সালেহা বেগমের

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল। তাই দেখে সালেহা বেগম ব্যাকুল গলায় বললেন, 'বল, মা, বল। তার নামটা বল। তোর বাবা জানতে চেয়েছে। তার সঙ্গেই তোর বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।'

হঠাৎ দিনা হিংস্র পশুর মত গর্জন করে উঠল। ভয় পেয়ে সালেহা বেগম ছিটকে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই দিনা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে ভাঙা গলায় বলল, 'না, মা, কেউ আমার সর্বনাশ করেনি। কেউ সর্বনাশ করেনি। আমার কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।' বলা শেষে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

সালেহা বেগম আবার বিছানার পাশে বসে দিনার কপালে হাত রেখে বললেন, 'মা, তুই লুকাচ্ছিস। আর লুকিয়ে রাখিস না। সত্যিটা জানা। এখন আর কিছুই গোপন করার নেই। তোর ভালর জন্যই বলতে বলছি।'

মুহূর্তেই দিনার চেহারা ক্রুদ্ধ রূপ ধারণ করল। বিকট পুরুষালি গলায় বলে উঠল, 'অ্যাই, কুত্তী, বললাম না কেউ আমার সর্বনাশ করেনি। পাপ! সব পাপের ফল! তোর স্বামীর পাপের ফল!'

এমন সময় মধ্যবয়স্কা এক নার্স এল। নার্স সালেহা বেগমকে বলল, 'রোগীকে এখন আর বিরক্ত করবেন না। কড়া ডোজের ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি। রোগীকে ঘুমাতে দিন।'

দিনা যে কারও নাম বলছে না, সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে, উল্টো খেপে উঠে গালি-গালাজ করছে–সালেহা বেগম বাইরে এসে সেসব কথা কাঁদতে-কাঁদতে মোবারক হোসেনকে জানালেন। সব শুনে প্রথমে মোবারক হোসেন প্রচণ্ড হুংকার, চেঁচামেচি, গর্জন করতে লাগলেন, '...হারামজাদী ওর নাগরের নাম বলবে না। হারামজাদীরে জ্যান্ত মাটি চাপা দেব। গর্ত করে গলা পর্যন্ত পুঁতে

BanglaBook.org

পাথর মারতে-মারতেই মেরে ফেলব। আবার তেজ দেখায়, গালি-গালাজ করে...'

গর্জাতে-গর্জাতেই মোবারক হোসেন কেমন চুপ মেরে গিয়ে দিনার বলা 'তোর স্বামীর পাপের ফল' কথাটা নিয়ে ভাবনায় পড়ে যান। এই কথার মানেটা কী? কথাটা সালেহা বেগমকে বলেছে। সালেহা বেগমের স্বামী মানে তিনি। তিনি এমন কী পাপ করেছেন যাতে তাঁর নিজের অবিবাহিতা মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। কী কুৎসিত কথা!! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!!!

মোবারক হোসেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। অনেক বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন তাঁর যুবক বয়স। বিয়ে-শাদী করেননি। বর্তমানে তাঁর মালিকানাধীন যে বাড়িটি, ওই বাড়িতেই এক সময় তাঁদের এবং তাঁর চাচার ঘর ছিল পাশাপাশি। তাঁর বাবা এবং চাচার পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া বাড়ি। বাড়িতে তাঁদের দুই ভাইয়ের সমান ভাগ ছিল। মোবারক হোসেনের বাবা ঠিকাদারি করতেন। তাই তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। অন্যদিকে চাচার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তিনি ছিলেন জনমভর ভয়ানক অ্যাজমার রোগী। সারা বছর বিছানায়ই পড়ে থাকতেন। রোগের কারণে কাজ-কর্ম কিছুই করতে পারতেন না। মানুষের কাছে হাত পেতে, ধার-দেনা করে কোনও রকমে তাঁর সংসার চলত। মোবারক হোসেনদের সুবিশাল দোচালা টিনের ঘরের পাশে চাচার বাঁশের চাটাই আর গোলপাতার ছাউনির তৈরি ঘরটা ছিল একেবারেই বেমানান। সেই ঘরেই চাচা তাঁর মা মরা একমাত্র মেয়ে শেফালিকে নিয়ে থাকতেন। চাচার মেয়ে শেফালি মোবারক হোসেনের চেয়ে বয়সে তিন-চার বছরের ছোট ছিল। শেফালি মোবারক হোসেনদের ঘরে বলা যায় কাজের মেয়ের মত সাংসারিক বিভিন্ন কাজ-কর্ম করে দিত। সারা দিন খাটত। বিনিময়ে শেফালি এবং শেফালির বাবাকে তাঁদের ঘর থেকে

BanglaBook.org

দু'বেলার খাবার দেয়া হত।

কীভাবে যেন শেফালির সঙ্গে মোবারক হোসেনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক এক পর্যায়ে রূপ নেয় দৈহিক মেলামেশায়। এক সময় শেফালি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। শেফালি সেই কথা মোবারক হোসেনকে জানায়, বিয়ের কথা বলে। মোবারক হোসেন ভয়ানক খেপে উঠে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তিনি অবস্থাপন্ন বাপের একমাত্র ছেলে, উচ্চ শিক্ষিত, লম্বা-চওড়া, চেহারা সুরতও ভাল। কোথায় তাঁর অবস্থান আর কোথায় শেফালি! শেফালির চেহারাও তেমন ভাল না। গায়ের রঙ শ্যামলা। শেফালির মত মেয়েদের ভোগ করা যায়, বিয়ে করে ঘরের বউ বানানো যায় না। তাঁর জন্য কত ভাল-ভাল সম্বন্ধ আসছে। মেয়ের বাবারা নগদ টাকাসহ অনেক কিছু যৌতুক দিতে চাইছে। সেসব মেয়ে দেখতেও শেফালির চেয়ে অনেক সুন্দরী। সেখানে হতদরিদ্র শেফালিকে বিয়ে করবেন কোন্ দুঃখে!

শেফালি হাতে-পায়ে পড়ে অনেক কান্নাকাটি করে। কিন্তু কিছুতেই মোবারক হোসেনের মন গলে না। উল্টো হুমকি দেন, শেফালি যদি তাঁর নাম মুখেও নেয়, তা হলে গ্রামের সবার কাছে শেফালিকে নষ্টা-ভ্রষ্টা প্রমাণ করে শেফালি এবং তার বাবাকে গ্রামছাড়া করবেন।

শেফালি মেয়েটা ভাল ছিল। মুখচোরা লাজুক স্বভাবের। কাউকে কিছু না বলে একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মোবারক হোসেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কিছুদিন বাদে সালেহা বেগমের সঙ্গে ধুমধাম করে তাঁর বিয়ে হয়। তবে একটা পথের কাঁটা থেকে যায়। তা হলো শেফালির বাবা। শেফালির বাবা বোধহয় শেফালির আত্মহত্যার কারণ কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। মেয়ের মৃত্যুর পর অসুস্থ রুগ্ন লোকটা কেমন অপ্রকৃতিস্থের মত হয়ে যান। সারাক্ষণ চিৎকার করে-করে মেয়ের নাম ধরে বিলাপ

BanglaBook.org

করতে থাকেন। রাতের বেলা বিলাপগুলো খুব কানে লাগত। অ্যাজমার রোগী হুঁস-হুঁস করে শ্বাস টেনে-টেনে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলতেন, '...জানি! জানি তো কে আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে! পাপ কাউকে ছাড়বে না! আল্লাহ সইবে না! সইবে না আল্লাহ! ও, আল্লাহ, তুমি পাপের শাস্তি দিয়ো! আল্লাহ, তুমি কোথায়! পাপীকে শাস্তি দাও!'

চাচার বিলাপ মোবারক হোসেনের কানে তীরের মত বিঁধতে থাকত। দিনের পর দিন। মোবারক হোসেন আর সইতে না পেরে এক রাতে চুপিচুপি গিয়ে শেফালির বাবার মুখের উপর বালিশ চাপা দেন। অ্যাজমার রোগী, সামান্য জোর খাটিয়ে মুখের উপর বালিশ চেপে রাখতেই একেবারে শান্ত হয়ে যান। কেউ কিছু জানতে পারে না। সবাই মনে করে এমনিতেই মারা গেছে রুগ্ন, জরাগ্রস্ত লোকটা। শেফালির বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বসত-ভিটাটুকুও মোবারক হোসেন নিজের নামে করে নেন।

মাঝ রাত। দিনার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই সে জবাই দেয়া পশুর মত ছটফট করছে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে শরীরটাকে মোচড়াচ্ছে। গলা দিয়েও বের হচ্ছে জান্তব শব্দ।

ডাক্তাররা বুঝতে পারছেন দিনার ভয়ঙ্কর পেটে ব্যথা হচ্ছে। তাঁরা একটার পর একটা ব্যথানাশক ইনজেকশন দিচ্ছেন। কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না।

দিনার পেটটা ঢোলের রূপ নিয়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পেটের ভিতর কিছু নড়াচড়া করছে। সারা পেট জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন পেটের ভিতর থেকে পেট চিরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ডাক্তাররা এমনটা আগে কোনও দিনও দেখেননি যে, তিন মাসের বাচ্চা এভাবে পেটের ভিতরে নড়াচড়া করে। তিন

BanglaBook.org

মাসের বাচ্চা কেন, পরিণত বাচ্চাও পেটের ভিতর এমন ভয়ঙ্করভাবে নড়ে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসেই বোধহয় এমন কেস হিস্ট্রি নেই।

ডাক্তার-নার্সদের ব্যস্ত ছোটাছুটি। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন–এখনই অপারেশন করে দিনার পেটের ভিতরের ওই অদ্ভুত শিশুটাকে বের করে ফেলবেন। রোগীকে বাঁচাতে হলে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় তাঁদের জানা নেই।

দিনার বেড ঘিরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্যান্য রোগী এবং তাদের সঙ্গে থাকা লোকেরা ভিড় করেছে। দিনার পাশে তার বাবা-মা-বোন তারাও আছে। ডাক্তাররা সবাইকে সরে যেতে বলছেন। এখনই দিনাকে স্ট্রেচারে উঠিয়ে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হবে।

স্ট্রেচারে ওঠানোর আগেই এক অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল। তাই দেখে উপস্থিত অনেকেই বিকট চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কেউ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কেউ আবার হড়-হড় করে বমি করে ফেলল। দিনার মা-বোন অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। শুধু মোবারক হোসেন বজ্রাহতের মত বাক্‌শূন্য নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

দিনার পেটের ভিতরের দানবটা নাভির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে দিনার শরীর। সত্যিই একটা খুদে দানব! কোনও মানব শিশু বলা ঠিক হবে না। দেখতে কিছুটা দানব আকৃতির শুঁয়োপোকার মত। শুধু মুখটা মানুষের মুখের মত। মানুষের মত চোখ-নাক-ঠোঁট-কান-মাথা সবই আছে। গলার নীচ থেকে শুঁয়োপোকার গঠন। হাত-পা কিছুই নেই।

নাভির ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বাইরে বের হবার পর দানবটা রক্তে মাখামাখি অবস্থায় দিনার নিথর শরীর বেয়ে শুঁয়োপোকার মত ঢেউ খেলিয়ে ঢেউ খেলিয়ে নামতে লাগল।

BanglaBook.org

বছর তিনেক কেটে গেছে। মোবারক হোসেনের বড়ই দুর্দিন। কোনও দিনও তাঁর যে রোগ ছিল না, তিনি এখন সেই রোগে ভুগছেন। দিনার মৃত্যুর পরপরই তাঁর সাংঘাতিক অ্যাজমা হয়। সারা দিন-রাত বিছানায়ই পড়ে থাকেন। টেনে-টেনে অনেক কষ্টে শ্বাস নেন। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। জলের মত টাকা খরচ হয়েছে। এই রোগের চেয়ে কষ্ট বোধহয় আর কোনও রোগে নেই। এরচেয়ে মৃত্যুও ভাল।

বছর দুই আগে মোবারক হোসেনের স্ত্রী সালেহা বেগম হঠাৎ করে মারা যান। সালেহা বেগমের মৃত্যুর কিছু দিন পর এক রাতে ভয়ানক ঘূর্ণিঝড়ে মোবারক হোসেনের টিনশেড ঘরটা পড়ে যায়। তিনি আর তাঁর ছোট মেয়ে মিনা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। রোগে-শোকে তাঁর আর্থিক অবস্থা এমনিতেই একেবারে তলানিতে, তার উপর ঘর পড়ে যাওয়ায় তিনি মহা বিপদে পড়েন। কোনওমতে বাঁশের চাটাই আর গোলপাতার ছাউনির একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেন।

মোবারক হোসেন তাঁর বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চাইছেন। তাও পারছেন না। তাঁর বাড়ির কাগজ-পত্র, দলিল নাকি ঠিক নেই। কেউ তাঁর বাড়ি কিনতে চাইছে না। তবে বর্তমান চেয়ারম্যান দবির বেপারী কম দামে বাড়িটা কিনতে আগ্রহী। দবির বেপারী অত্যন্ত ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক। কম দামে বাড়িটা কিনে কাগজ-পত্র ঠিক করে নেবে।

মোবারক হোসেনের আর্থিক অবস্থা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে বোধহয় শেষ পর্যন্ত দবির বেপারীর কাছেই বাড়িটা বিক্রি করে দিতে হবে। বলা যায় ওষুধ কিনে খাওয়ার মত সামর্থ্যও ফুরিয়ে এসেছে।

ছোট মেয়ে মিনা সংসারের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে। সে

BanglaBook.org

এইচ.এস.সি পাশ করার পর থেকে বিভিন্ন বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছোট-ছোট বাচ্চাদের টিউশনি করে। খুবই সামান্য আয়। তবে কয়েক মাস ধরে একটা ভাল টিউশনি পেয়েছে। চেয়ারম্যান দবির বেপারীর বড় ছেলের মেয়েকে পড়ানো। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বেবি সিটারের মত ওই বাচ্চা মেয়েটাকে দেখাশোনা করার সঙ্গে-সঙ্গে শেখাতে-পড়াতে হয়। আজকাল অবশ্য মিনাকে বাচ্চা মেয়েটার দেখা-শোনার ফাঁকে-ফাঁকে চেয়ারম্যান বাড়ির বিভিন্ন সাংসারিক কাজ-কর্মেও হাত লাগাতে হয়।

রাতে মিনা চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে তাদের বাপ-বেটির জন্য খাবার নিয়ে ফেরে।

মাঝে-মাঝে একটা ব্যাপার লক্ষ করে মোবারক হোসেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তা হলো–প্রায়ই রাতে চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে ফেরার পর মিনা লুকিয়ে ফুঁচ-ফুঁচ করে কাঁদে। সেই রাতে মিনা কিছু খায়ও না। না খেয়েই শুয়ে পড়ে। তিনি শুনেছেন, চেয়ারম্যানের ছোট ছেলেটা নাকি লম্পট স্বভাবের। কে জানে সেই লম্পটটা মিনার সঙ্গে কোনও বদমায়েশি করার চেষ্টা করে কিনা। গরিব হওয়ার অনেক জ্বালা। গরিবদের অনেক কিছুই মুখ বুজে সইতে হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঘুমবাড়ি

ভর দুপুর। চারদিক অন্ধকার করে মেঘ করেছে। মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রমিজ মিয়া ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি বলে ছাতাটা তিনি না মেলে হাতে ধরে হাঁটছেন। দ্রুত লম্বা-লম্বা পা ফেলছেন। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মুষলধারে বৃষ্টি নামল বলে।

রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য। একেবারে ফাঁকা। এমনিতেও ভর দুপুরে গ্রামের পথ-ঘাটে তেমন একটা লোকজনের দেখা পাওয়া যায় না। যে যার বাড়িতে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ভাতঘুম দেয়।

রমিজ মিয়া বেরিয়েছেন তাঁর ছাগলটাকে খুঁজতে। তিনি একটা পাঁঠা ছাগল পোষেন। পাঁঠাটা পুষছেন এক কবিরাজের নির্দেশে। তাঁর ভয়ঙ্কর অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে। ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য কিছুই বাদ দেননি। কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষপর্যন্ত বয়স্ক এক কবিরাজ পরামর্শ দেন, একটা পাঁঠা ছাগল পোষার। রাতে পাঁঠাটাকে তাঁর খাটের নীচে রেখে ঘুমানোর। পাঁঠার গায়ের গন্ধে নাকি অ্যাজমার সমস্যা কমবে।

বছরখানেক ধরে রমিজ মিয়া কবিরাজের নির্দেশ মোতাবেক তাই করছেন। সত্যিই এতে তাঁর অ্যাজমার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। তিনি সেই কবিরাজের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে পাঁঠাটার প্রতিও তাঁর মনে এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ আর স্নেহ-

BanglaBook.org

মমতার জন্ম নিয়েছে। পাঁঠাটাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন।

পাঁঠাটা সারা দিন ছেড়ে দেয়া অবস্থায় সমস্ত গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যায় ঠিকই আবার এসে রমিজ মিয়ার খাটের নীচে আশ্রয় নেয়। কিন্তু আজ ঝড়-বৃষ্টিতে কোথায় না কোথায় আটকে যায়, না পথ হারিয়ে ফেলে–সেই আশঙ্কায় তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন।

গ্রামের বাজারে রমিজ মিয়ার একটি মুদি দোকান আছে। মুদি দোকান কাম ভ্যারাইটিস স্টোরও বলা যায়। তাঁর দোকানে সুঁই-সুতা, কাগজ, কলম থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়। বাজারে তাঁরটিই সবচেয়ে বড় দোকান। বেচা-বিক্রিও জমজমাট। সকালে এবং সন্ধ্যায় উপচে পড়া ভিড় হয়। একা সামাল দিতে পারেন না বলে দোকানের জন্য ছেলে-ছোকরা টাইপের কর্মচারী রাখেন। কিন্তু তাদের কেউ বেশি দিন টেকে না। কারও চুরির অভ্যাস থাকে, কেউ আবার হিসাব-নিকাশ কিছুই বোঝে না, কেউ-কেউ ফাঁকিবাজ। গত তিন মাস ধরে তিনি একাই দোকান সামলাচ্ছেন। ভেবেছেন আর লোকই রাখবেন না। নিজে যতটুকু বেচা-বিক্রি করতে পারেন তাতেই তাঁর চলবে। তাঁর চাহিদা কম। সংসারে তিনি আর তাঁর স্ত্রী, মাত্র দু'জন মানুষ। পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া টিনশেড দোতলা বিশাল বাড়ি। বাড়িতে প্রায় সব ধরনের দেশি ফলের গাছ আছে। বিশাল পুকুর আছে। পুকুর ভর্তি মাছ। এক সময় বেশ কয়েকটা দুধেল গাইও ছিল। গাই পালার জন্য ভাল রাখাল না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত গাইগুলো বিক্রি করে দিতে হয়েছে। বাড়ির পেছনে শূন্য গোয়াল ঘরটা এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির আঙিনায় লাউ, শিম, শশা...এই জাতীয় বেশ কিছু সবজি তাঁর স্ত্রী চাষ করে ফলান। সেই সঙ্গে অনেকগুলো হাঁস-মুরগি-কবুতর পালেন। কোনও কিছুরই অভাব নেই তাঁদের সংসারে।

BanglaBook.org

রমিজ মিয়ার একটাই দুঃখ, তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এখন পর্যন্ত একটা সন্তানের মুখ দেখা হলো না। ছেলে-পুলেহীন শূন্য ঘরটা খাঁ-খাঁ করে। আর বোধহয় সন্তানের মুখ দেখা হবেও না। আশা ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রীর বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। ভাগ্যের লিখন মেনে নেয়া ছাড়া কী আর করার আছে! অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। কেউ বলেছে, তাঁর সমস্যা। আবার কেউ বলেছে, তাঁর স্ত্রীর সমস্যা। সমবয়সী বন্ধু পর্যায়ের অনেকে পরামর্শ দিয়েছে, আবার বিয়ে করার। কিন্তু তাতে তিনি রাজি হননি। তিনি তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বেগমকে খুব ভালবাসেন। মরিয়ম বেগমের ঋণ তিনি কোনও দিনও শোধ করতে পারবেন না। আজ তিনি যে খেয়ে-পরে সুখে আছেন এর পিছনে সম্পূর্ণ অবদান মরিয়ম বেগমের।

এক সময় রমিজ মিয়ার মুদি দোকান ছিল না। কোনও কাজ-টাজই তিনি করতেন না। সারাদিন শুয়ে-বসে কাটাতেন। একদিন মরিয়ম বেগম বললেন, 'এভাবে শুয়ে-বসে না থেকে কিছু একটা কাজ-টাজ ধরো।'

তিনি অলস গলায় বলেন, 'কী করব? আমাদের তো খাওয়া-পরার কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'

মরিয়ম বেগম বললেন, 'সারা জীবন কি আর এভাবেই চলবে?! খাওয়া-পরার ঠিকই সমস্যা হচ্ছে না, তাই বলে আমাদের জমা-জমতি বলেও তো কিছু নেই। হঠাৎ বড় কোনও অসুখ-বিসুখ বা কত প্রয়োজনে টাকা-পয়সার দরকার হতে পারে। তখন কী করবে? মানুষের কাছে হাত পাতবে? আমাদের একটা সন্তানাদি হলে তার জন্যেও তো কিছু ধন-সম্পদের প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া পুরুষ মানুষ শুয়ে-বসে কাটালে পুরুষ থাকে না। সময় কাটানোর জন্য হলেও পুরুষ লোকের কিছু একটা করা

BanglaBook.org

দরকার।'

'কিন্তু আমি কী করতে পারি?! আমার আবার বেশি পরিশ্রম সহ্য হয় না।'

মরিয়ম বেগম বললেন, 'গ্রামের বাজারে একটা দোকান দিয়ে বসতে পারো।'

'কীসের দোকান?'

'এই ধরো মুদি দোকান।'

'তাতে তো অনেক ক্যাশ টাকা লাগবে! তা পাব কোথায়?!'

মরিয়ম বেগম বললেন, 'আমার গয়নাগুলো বিক্রি করে দিয়ে যা হয় তাই দিয়ে না হয় শুরু করো।'

রমিজ মিয়া স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে ব্যবসা শুরু করতে কিছুতেই রাজি হতে চাননি। মরিয়ম বেগম অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করান। মরিয়ম বেগম বোঝান, ব্যবসায় যদি উন্নতি হয় তখন আবার এমন গয়না গড়িয়ে নেয়া যাবে। এরচেয়ে বেশিও হয়তো যাবে।

সত্যিই দিনে দিনে রমিজ মিয়ার মুদি ব্যবসা জমে ওঠে। তিনি মরিয়ম বেগমকে একের পর এক গয়না গড়িয়ে দেন। বলা যায় আগে যা ছিল তারচেয়ে এখন দ্বিগুণ গয়না মরিয়ম বেগমের। ব্যাংকেও বেশ কিছু টাকা জমিয়েছেন।

বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। রমিজ মিয়া মাথার উপর ছাতা মেলে এগোচ্ছেন। চলার পথের আশপাশে তাঁর চোখ দুটো খুঁজে ফিরছে পাঁঠাটাকে। নাহ, কোথাও পাঁঠাটাকে দেখা যাচ্ছে না।

দেখতে-দেখতে বৃষ্টি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। রীতিমত ঝড়ো হাওয়া বইছে। সেই সঙ্গে বিকট শব্দে এক-একটা বাজ পড়ছে। ছাতায় কাজ হচ্ছে না। হাওয়ার তোড়ে ছাতা মাথার উপর ধরে

BanglaBook.org

রাখাও যাচ্ছে না। রমিজ মিয়া ভিজে যাচ্ছেন। ভিজলে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর অ্যাজমার প্রকোপ বেড়ে যাবে। কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। তিনি চলে এসেছেন গ্রামের একেবারে উত্তর মাথায়। এখানে কোনও লোকবসতি নেই বললেই চলে। তবে কিছুটা সামনে এগোলে একটা পরিত্যক্ত জুট মিল পাবেন। বহু বছর ধরে মিলটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই বোধহয় জুট মিলটা বন্ধ হয়ে যায়।

রমিজ মিয়া পরিত্যক্ত জুট মিলের ভিতরে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছেন। বিশাল লম্বা টিনশেড বিল্ডিং। ভিতরে মেশিন-টেশিন কিছুই নেই। শুধুই ফাঁকা, অন্ধকার, লম্বা একটা ঘর। ধুলো, ময়লা, মাকড়সার ঝুলে ভর্তি। কেমন গুমোট ভাপসা গন্ধ। খুব একটা ভিতরে ঢোকেননি তিনি। বৃষ্টি থেকে গা বাঁচাতে প্রবেশদ্বার থেকে যতটুকু ঢোকার প্রয়োজন ততটুকু।

ঝড়-বৃষ্টি আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। কাছাকাছি বিকট কড়কড় শব্দে বাজ পড়ছে। সেই শব্দে তিনি কেঁপে-কেঁপে উঠছেন। প্রবেশদ্বার থেকে আরও কিছুটা ভিতরে সরে এলেন।

টিনের চালে ঝমঝম করে ঝড়-বৃষ্টির প্রবল শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে কেমন এক অদ্ভুত শূন্যতা ঘিরে ধরল রমিজ মিয়াকে। যেন তিনি লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আর কোনও দিনও লোকালয়ে ফিরে যেতে পারবেন না। তাঁর গা ছমছম করছে।

হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কেমন এক জান্তব গোঙানির শব্দ শুনতে পেলেন রমিজ মিয়া। তিনি চমকে উঠলেন। শব্দটা আসছে জুট মিলের ভিতর থেকেই। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত। কোনও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারও কি তাঁর মত এখানে আশ্রয় নিয়েছে?! পাগলা কুকুরও হতে পারে! গোঙানির শব্দটা পাগলা কুকুরের ক্রোধের শব্দের

BanglaBook.org

মতই লাগছে।

মুহূর্তে ভয়ে পুরোপুরি জমে গেলেন। সেই সঙ্গে হাঁপানির টান উঠে গেল। তিনি হাপরের মত বুক ফুলিয়ে-ফুলিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। ওদিকে জান্তব গোঙানির শব্দ ক্রমেই জুট মিলের অন্ধকারের ভিতর থেকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি ছুটে পালানোর প্রবল তাগিদ অনুভব করছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর জমে যাওয়া পা নাড়াতে পারছেন না।

গোঙানির শব্দ একেবারেই তাঁর কাছে চলে এসেছে। প্রবেশদ্বার থেকে আসা বিজলি চমকানোর নীল আলোতে এবারে তিনি যে গোঙাচ্ছে তাকে দেখতে পেলেন। একটা মেয়ে! অস্বাভাবিক ফর্সা, রোগা পাট কাঠির মত লিকলিকে শরীরের একটা মেয়ে। বয়স হয়তো বিশ-একুশ বা তারচেয়েও কম। গায়ে কোনও পোশাক নেই। উলঙ্গ। মেয়েটা এগিয়ে আসছে গোঙাতে-গোঙাতে পশুর মত চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে। ঝুঁকে থাকার ফলে মাথা ভর্তি উষ্কখুষ্ক জঙ্গুলে চুলগুলো মুখের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। তাতে তার শরীরও এই আধো আলোতে পুরোপুরি স্পষ্ট হচ্ছে না। রমিজ মিয়ার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বুকে সাহস ফিরে পেলেন। হাঁপানির টানও মুহূর্তেই অনেকটা কমে গেল। অল্প বয়সী একটা পাগলি! অমন রোগা লিকলিকে একটা পাগলি তাঁর কিছুই করতে পারবে না।

পাগলি মেয়েটা একেবারে তাঁর পায়ের কাছে চলে এসেছে। তাঁর পা জড়িয়ে ধরতে চাইছে। তিনি সজোরে একটা লাথি মেরে পিছিয়ে গেলেন। লাথি খেয়ে মেয়েটা ছিটকে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মেয়েটা এতই দুর্বল যে ঠিক মতন কাঁদতেও পারছে না। কাঁদতে গিয়ে দম আটকে-আটকে যাচ্ছে।

রমিজ মিয়া মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলেন এটা ভেবে যে জিজ্ঞেস করবেন, কে সে, কোথা থেকে এসেছে, বাড়ি

BanglaBook.org

কোথায়–এসব। কিন্তু মেয়েটা তাঁকে এগোতে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে পিছু হটতে লাগল। মনে করছে আবার হয়তো তিনি লাথি মারবেন।

তিনি এগোতে-এগোতে বললেন, 'ভয় নেই, আর তোকে কিছু বলব না। কে তুই সেটা বল?'

মেয়েটা আবার গোঙাতে লাগল। ভালভাবে খেয়াল করে শুনে রমিজ মিয়া বুঝলেন, না, মেয়েটা গোঙাচ্ছে না। সে আসলে বলতে চাইছে, ক্ষুধা, খুব ক্ষুধা, খুব ক্ষুধা পেয়েছে। হাত মুখের কাছে তুলে ইশারায়ও বোঝাতে চাইছে, খুব ক্ষুধা পেয়েছে, খেতে চায়। তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সে অনেক দিনের অভুক্ত।

মেয়েটা যে অসম্ভব ক্ষুধার্ত একজন, এটা বুঝতে পেরে রমিজ মিয়ার মনটা খুব খারাপ হলো। লাথি মারায় মনে তীব্র অনুশোচনা জাগল। পাগলি হোক আর যা হোক ক্ষুধার্ত অসহায় একটা মেয়ে। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি বিয়ে করার কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর যদি একটা মেয়ে সন্তান হত, তা হলে সেই মেয়েও এখন এই পাগলি মেয়েটার বয়সীই হত। মেয়ের বয়সী বাচ্চা মেয়েটাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে লাথি মারায় খুব অনুশোচনা হচ্ছে! খুউব!!!

রমিজ মিয়া তাঁর গায়ের পাঞ্জাবি খুলে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'নে, এই পাঞ্জাবিটা পরে নে। বৃষ্টি কমে এসেছে। তোকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব।'

BanglaBook.org

দুই

সন্ধ্যা নাগাদ রমিজ মিয়া পাগলি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি

ফিরলেন। বাড়ি ফিরে শোনেন, পাঁঠাটা ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবার আগেই বাড়ি ফিরে আসে। শুধু-শুধুই তিনি ওটাকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়েছেন।

পাগলি মেয়েটাকে দেখে রমিজ মিয়ার স্ত্রী মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বললেন, 'এ কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ?'

রমিজ মিয়া মরিয়ম বেগমকে পাগলি মেয়েটাকে কীভাবে পেয়েছেন তা বিস্তারিত জানালেন। এরপর তিনি মেয়েটাকে কিছু খেতে দিতে বললেন, মেয়েটা ক্ষুধায় একেবারে ভেঙে পড়েছে।

মরিয়ম বেগম মেয়েটাকে শরবত, দুধ, ডিম পোচ, বিস্কিট, কলা, এই জাতীয় হালকা কিছু খাবার দিলেন। মেয়েটা পশুর মত হামলে পড়ে দু-হাত দিয়ে ধরে খাবারগুলো নিমিষে গপাগপ খেয়ে শেষ করে ফেলল। তাই দেখে রমিজ মিয়া বললেন, 'ওকে ভাত খেতে দাও। পেট ভরে ভাত খাক। ওর পেটে অনেক খিদে।'

মরিয়ম বেগম বললেন, 'আগে ওকে গোসল করিয়ে নিই। ওর গা থেকে কেমন টকটক গা গোলানো বাসি গন্ধ আসছে।'

রমিজ মিয়া পোশাক পাল্টে দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি না করে এখনই গিয়ে দোকান খোলা দরকার। সন্ধ্যায় দোকানে বেচা-বিক্রি ভাল হয়।

রমিজ মিয়া যাবার পর মরিয়ম বেগম গরম পানি করে, সাবান মাখিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাগলি মেয়েটাকে ভালভাবে গোসল করালেন। গোসলের পর তাঁর একটা শাড়ি পরালেন। এরপর অনেকক্ষণ ধরে যত্ন করে মেয়েটার চুল আঁচড়ে দিলেন। চুল আঁচড়ে দিতে বসে তাঁর মনে হয় বহুদিন মেয়েটার চুলে চিরুনির আঁচড় পড়েনি। এরই মধ্যে তিনি অনেকবার মেয়েটার নাম-ধাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু মেয়েটা কিছুই বলে না। শুধু

BanglaBook.org

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মাঝে-মাঝে অবশ্য জড়ানো গলায় গোঁ-গোঁ করে কিছু বলতে চায়। তা তিনি বোঝেন না। তবে মেয়েটার ভাব-ভঙ্গি দেখে এটা বুঝতে পারছেন, সে খেতে চাইছে, তার পেটে ভীষণ খিদে।

এক সময় মেয়েটাকে খেতে বসালেন। আজকে রান্না করেছেন ভাত, ডিম ভুনা, হাঁসের মাংস আর ডাল চচ্চড়ি।

মরিয়ম বেগম মেয়েটার পাতে ভাত তুলে দিয়ে ডিম ভুনা দিতে যাবেন, তার আগেই মেয়েটা হামলে পড়ে ডিমের বাটি থেকে একটা ডিম দু-হাতে তুলে মুখে পুরে সঙ্গে-সঙ্গে খেয়ে ফেলল। এরপর ডিমের বাটি থেকে আরও একটা ডিম তুলে নিল। তবে এবারে ডিমের সাদা অংশটা দু-হাতে ছাড়িয়ে, ছুঁড়ে ফেলে, শুধু হলুদ কুসুমটা মুখে পুরল। কুসুমটা খাওয়া শেষ হতেই আবার একটা ডিম তুলে নিয়ে সাদা অংশটা ছাড়িয়ে ভিতরের কুসুমটা মুখে পুরল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটা পশুর মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার করে ডিম আর হাঁসের মাংস খেয়ে শেষ করে ফেলল। ভাত-ডাল ছুঁয়েও দেখল না। ডিম ভুনা আর হাঁসের মাংস শেষ হতেই গোঙানির মত গোঁ-গোঁ শব্দ করে এবং হাতের ইশারা, ভাব-ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইল—ও ধরনের খাবার সে আরও খেতে চায়।

মরিয়ম বেগম স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। ডিম ভুনার বাটিতে দশটা ডিম আর হাঁসের মাংসের বাটিতে পুরো একটা হাঁসের মাংস ছিল। সব মুহূর্তে খেয়ে শেষ করে এখন আবার খেতে চাইছে! এ কি রাক্ষস নাকি! অথচ কী লিকলিকে রোগা শরীর। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। তবে শরীরের তুলনায় পেটটা বড়। মাকড়সার যেমন বড় পেট থাকে তেমন।

BanglaBook.org

রাত দশটা নাগাদ রমিজ মিয়া বাড়ি ফিরলেন। মুখ-হাত ধুয়ে খেতে

বসলেন। খেতে বসে শুধু ভাত আর ডাল দেখে বললেন, 'আর কিছু রাঁধনি?'

মরিয়ম বেগম বললেন, 'হাঁসের মাংস আর ডিম ভুনাও করেছিলাম। তা তোমার ওই পাগলিটা একাই সাবাড় করেছে।'

রমিজ মিয়া দরদ মাখা গলায় বললেন, 'আহারে, বেচারির পেটে কী খিদেই না ছিল! আমাকে একটা ডিম ভেজে দাও।'

'ডিম পাব কোথায়? ঘরে একটা ডিমও নেই।'

'কী বলো! গতকালই না বললে, কতগুলো ডিম নাকি জমা হয়েছে? তোমার ওই ঘরে-পালা দেশি হাঁস-মুরগির ডিম। আমাকে না কিছু ডিম দোকানে নিয়ে গিয়ে বেচতেও বললে।'

'ছিল তো, চল্লিশ-পঞ্চাশটার কম না। পাগলিটারে খাইয়ে-দাইয়ে আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে আসি। কিছুক্ষণ পর আবার খোঁজ নিতে যাই। গিয়ে দেখি, সে বিছানায় নেই। খাটের নীচ থেকে মৃদু চপচপ আওয়াজ কানে আসে। নুয়ে খাটের নীচে উঁকি মেরে দেখি, সেখানে পাগলিটা। কী করছে জানো?! আমি যে সাজিটার মধ্যে ডিমগুলো জমিয়েছিলাম সেটা দেখি তার সামনে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একটার পর একটা ডিম ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছে। ডিমের সাদা লেই ঝেড়ে ফেলে শুধু হড়হড়ে কুসুমটা গিলছে। হলুদ কুসুমের ধারা তার দু-ঠোঁটের কোনা বেয়ে গড়াচ্ছে। থুতনিতেও মেখেছে। গা গুলিয়ে ওঠার মত দৃশ্য!'

'কী বলো! অতগুলো ডিম সব ওভাবে কাঁচা খেয়ে ফেলেছে?!'

'সব খেয়ে ফেলেছে! খাওয়া শেষে, হাতে, ঠোঁটে, থুতনিতে–যেসব জায়গায় কুসুম লেগেছিল সেসবও আঙুল দিয়ে মুছে-মুছে এনে চেটেপুটে খেয়েছে!'

রমিজ মিয়া নিজের ঘরে ঘুমাতে এসেছেন। টর্চ মেরে খাটের নীচে পাঁঠাটাকে দেখে নিলেন। পাঁঠাটা বসে-বসে জাবর কাটছে।

BanglaBook.org

তাঁকে দেখে ভ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা করে একবার ডেকে উঠল।

খাটের নীচে পাঁঠা নিয়ে ঘুমান বলে মরিয়ম বেগম এখন আর তাঁর সঙ্গে ঘুমান না।

আলাদা ঘরে থাকেন। মরিয়ম বেগম পাঁঠার গায়ের গন্ধ একদমই সহ্য করতে পারেন না। রমিজ মিয়ার এই 'পাঁঠা চিকিৎসা' গ্রহণের কারণে তাঁদের দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি, মন কষাকষি হয়। ঝগড়ার মুহূর্তে মরিয়ম বেগম তাঁকে নানান ভর্ৎসনা করেন। রমিজ মিয়ার গা থেকেও নাকি আজকাল পাঁঠা-পাঁঠা গন্ধ আসে। এই ঘরে যে দুটো প্রাণী থাকে, দুটোই পাঁঠা। একটা খাটের উপরে থাকে, অন্যটা খাটের নীচে। দুটোর উচিত এক সঙ্গে গলাগলি করে ঘুমানো।

প্রথম দিকে রমিজ মিয়াও পাঁঠার গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। ধীরে-ধীরে সয়ে গেছে। বরং আজকাল পাঁঠার গায়ের গন্ধ ছাড়া তিনি ঘুমাতে পারেন না। এর মধ্যে একদিন পাঁঠাটা খাটের নীচে প্রস্রাব-পায়খানা করে একেবারে ভরিয়ে ফেলেছিল। বোধহয় সেদিন পাঁঠাটার ডায়রিয়া হয়েছিল। দুর্গন্ধে টেকা দায়। ওই অবস্থা দেখে মরিয়ম বেগম তাঁকে সেই রাতে মরিয়ম বেগমের ঘরে ঘুমাতে নিয়ে যান। তিনি অবশ্য মরিয়ম বেগমের ঘরে যেতে চাননি। মরিয়ম বেগম মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, 'এক রাত পাঁঠার সঙ্গে না ঘুমিয়ে মানুষের সঙ্গে ঘুমালে এমন কী ক্ষতি হবে?' তখন বাধ্য হয়ে মরিয়ম বেগমের ঘরে ঘুমাতে যান। কিন্তু সারা রাতে এক ফোঁটাও ঘুম হয় না তাঁর। মরিয়ম বেগমের গা থেকে কেমন বোটকা গন্ধ পান। শেষ রাতের দিকে নিজের কামরায় ফিরে বালিশে মাথা রাখতেই ঘুম চলে আসে। কী সুন্দর মনমাতানো পাঁঠার গায়ের গন্ধ! সেই সঙ্গে প্রস্রাব-পায়খানার গন্ধ মিলে গন্ধের নেশাটা সেদিন আরও বাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে যান। সকালে ঘুম ভাঙে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে।

BanglaBook.org

স্বপ্নে তিনি নিজেকে একটা পাঁঠা রূপে দেখতে পান। তাঁকে যেন মা-কালীর মূর্তির সামনে বলি দেয়া হচ্ছে। তাঁকে বলি দিচ্ছেন মরিয়ম বেগম। বলি হবার ঠিক আগ মুহূর্তে মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখেন, মূর্তিটাও মরিয়ম বেগমের—মা-কালীর নয়!

রমিজ মিয়া শোবার জন্য বিছানায় পা উঠিয়ে বসলেন। তাঁর ঘরে মশারি খাটানোর প্রয়োজন হয় না। এই ঘরে মশা আসে না। বোধহয় পাঁঠার গন্ধে।

বিছানায় বসে তিনি জোরে-জোরে বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছেন। শোবার আগে এমনটা তিনি প্রতি রাতেই করেন। মূলত তিনি বুক ভরে পাঁঠার গন্ধ নেন। এভাবে কয়েকবার নিলেই চোখে ঘুম চলে আসে।

বিছানার পাশে টেবিলের উপর হ্যারিকেন জ্বলছে। হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে শুয়ে পড়বেন। তাঁদের গ্রামে এখন পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি এসে পৌঁছয়নি। তবে গ্রামের বাজার পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। কিছুদিনের মধ্যে বোধহয় গ্রামেও পৌঁছে যাবে।

এমন সময় তাঁর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে মরিয়ম বেগম ঢুকলেন। মরিয়ম বেগমকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এত রাতে তুমি পাঁঠার ঘরে?!'

মরিয়ম বেগম এসে তাঁর প্লাশে বসতে-বসতে ভীত গলায় বললেন, 'আমার কেমন ভয়-ভয় লাগছে! আজ আমি তোমার সঙ্গে ঘুমাব।'

রমিজ মিয়া অবাক-হওয়া গলায় বললেন, 'কেন, ভয় লাগছে কেন?!'

মরিয়ম বেগম ফিসফিস করে বললেন, 'ওই পাগলিটাকে ভয় লাগছে!'

BanglaBook.org

রমিজ মিয়া বিরক্ত-হওয়া গলায় বলে উঠলেন, 'কী যে বলো! ওই রোগা-পাতলা-দুর্বল মেয়েটা তোমার কী করবে?! ওর গায়ে তো ঠিক মতন হাঁটা-চলা করার শক্তিটুকুও নেই।'

মরিয়ম বেগম চিন্তিত গলায় বললেন, 'আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে, ওই মেয়েটা স্বাভাবিক কেউ না!'

'স্বাভাবিক কেউ তো না-ই! পাগল, মাথা খারাপ!'

'রাতে দোকান থেকে ফেরার পর তুমি আর মেয়েটাকে দেখেছ?!'

'না, কেন বলো তো?!'

'গোসলের পর আমার একটা লাল শাড়ি পরিয়ে, চুল আঁচড়ে দেবার পর মেয়েটাকে দেখে তো আমি তাজ্জব হয়ে গেছি! মেয়েটা ঠিকই ভীষণ রোগা-পাতলা কিন্তু ওর চেহারা তো খুবই সুন্দর! আশ্চর্য রকমের সুন্দর! কয়েক দিন ঠিকমত খাওয়া-পরা জুটলে এই মেয়ে তো পরীর চেয়েও রূপবতী হয়ে উঠবে। ওর সৌন্দর্য আমার কেমন অস্বাভাবিক লাগছে! রাস্তার একটা পাগলি কেন এত সুন্দর হবে?!'

রমিজ মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'অমন একটা মেয়ে যদি আমাদের থাকত!!!'

BanglaBook.org

তিন

পাগলি মেয়েটা রমিজ মিয়ার বাড়িতে প্রায় এক মাস হয় আছে। এতদিনে রমিজ মিয়া এবং মরিয়ম বেগম মেয়েটার আচরণে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়া মেয়েটাও এখন বেশ কিছুটা সভ্য হয়ে উঠেছে। মেয়েটার অস্বাভাবিকতার মধ্যে লক্ষণীয়

যা, তা হলো–সে খেতে পছন্দ করে। সারাক্ষণ শুধু খেতে চায়। অবশ্য সে সব ধরনের খাবার খায় না। যে কোনও ধরনের মাংস, ডিমের কুসুম, গরু-খাসির কলিজা, মগজ, চর্বি...এসব খাবার খেতে পছন্দ করে। রমিজ মিয়া রোজ-রোজ অনেকগুলো ডিম, মাংস, কলিজা, মগজ, মাখন...এসব বাজার করে আনেন। মরিয়ম বেগম সযত্নে সেগুলো রান্না করে মেয়েটাকে খাওয়ান। মেয়েটা অবশ্য রান্না করার আগে কাঁচাই সব খেয়ে ফেলতে চায়।

রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম, দু'জনের মনেই মেয়েটার প্রতি এক ধরনের তীব্র মায়া জন্ম নিয়েছে। মেয়েটার কোনও অস্বাভাবিকতাই এখন আর তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। মেয়েটার বেশি-বেশি খাওয়ার কারণ তাঁরা ধরে নিয়েছেন, মেয়েটা যেহেতু খুবই রোগা-পাতলা–তাই বেশি-বেশি খেয়ে তার শরীরের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করছে। যখন ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে তখন আর এত খাবে না।

এরই মধ্যে মেয়েটার শরীর অনেকটাই সেরে উঠেছে। তাকে আজকাল অপ্সরার মত রূপবতী লাগে।

রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম আজকাল মেয়েটার জড়ানো গলায় বলা অস্পষ্ট কথা কিছু-কিছু বুঝতে পারেন। মেয়েটাকে তার নাম-ধাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করলে এলোমেলো ছাড়া-ছাড়া যা বলে তা হলো–তার বাড়ি নদীর পাশ-ঘেঁষা এক গ্রামে। গ্রামের একমাত্র পানির উৎস সেই নদী। গ্রামের মানুষ নদীর পানিই নাওয়া-খাওয়া সহ সব কাজে ব্যবহার করে। তাদের গ্রামে খুব বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে প্রায়ই লোক মারা যায়। তার বাবা বনজ গাছ-গাছালির শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা দিয়ে ওষুধ বানায়। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তার বাবার কাছে চিকিৎসা নিতে আসে। তার বাবার বানানো ওষুধে যে কোনও রোগই সেরে যায়। তাদের গ্রামে অনেক পুরানো একটা কালী মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মূর্তিটা

BanglaBook.org

কষ্টিপাথরের...

তবে সে গ্রামের নাম, বাবার নাম, এসব কিছুই বলতে পারেনি। মেয়েটার মুখে ওসব শুনে রমিজ মিয়ার একটা গ্রামের কথাই বার-বার মনে হয়। তা হলো—তাঁদের গ্রাম থেকে বহু দূরে চিত্রা নদীর ওপারে শেখপুর থেকে কয়েক গ্রাম ছাড়িয়ে বজ্রথুথুপুর নামে এক গ্রামের কথা। সেই গ্রামে নাকি বজ্রপাতে খুব লোকজন মারা যায়। তাই গ্রামের নাম হয়ে গেছে বজ্রথুথুপুর। গবেষকরা বলেছেন, ওখানকার মাটিতে লৌহ জাতীয় উপাদান বেশি বলে নাকি বজ্রপাত বেশি আঘাত হানে। শুনেছেন সেখানে একটা কালী মন্দিরও আছে। খুব জাগ্রত মন্দির। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। জনশ্রুতি রয়েছে মা-কালী ক্ষিপ্ত হয়ে শুধুমাত্র পাপিষ্ঠদের উপরই বজ্রাঘাত করে শাস্তি দেন।

রমিজ মিয়া একদিন সেই গ্রামে খোঁজ নিতে যান। সেদিন ছিল সেই গ্রামের হাটবার। হাটে ঢুকে তিনি একে-ওকে ধরে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের গ্রামে কোনও নামকরা বড় কবিরাজ আছেন? যার ওষুধ খেলে যে কোনও রোগ সেরে যায়?'

কেউ কেউ বলে, 'অনেক আগে ছিল, এখন নেই।'

তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'মাসখানিক আগে সেই কবিরাজের কোনও মেয়ে কি নিখোঁজ হয়েছে?'

এই প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত-হওয়া গলায় জবাব মেলে, 'কী যে বলেন! এটা ঠিক যে ভবেশ কর নামে এক নামকরা কবিরাজ ছিলেন একসময়। তিনি তো মারা গেছেন প্রায় বছর বিশেক আগে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে-মেয়েরা সপরিবার ইণ্ডিয়া চলে যায়। মাসখানিক আগে তাঁর মেয়ে এই গ্রাম থেকে নিখোঁজ হবে কীভাবে?!'

তখন তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, মাসখানিক আগে কি আপনাদের গ্রামের পাগলি ধরনের কোনও মেয়ে নিখোঁজ

BanglaBook.org

হয়েছে?'

'না, হয়নি।'

অনেককে জিজ্ঞেস করার পর এক সময় রমিজ মিয়া নিশ্চিত হয়ে যান, পাগলি মেয়েটা যে গ্রামের বর্ণনা দিয়েছে এটা আসলে সেই গ্রাম নয়। শুধু-শুধু একে-ওকে জিজ্ঞেস করে লোকজনদের বিরক্ত করছেন। হাট খোলার একটা মিষ্টির দোকান থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে ফিরে আসার কথা ভাবেন। পাগলি মেয়েটা মিষ্টি, রসগোল্লা, সন্দেশ...এসব খেতেও খুব পছন্দ করে।

রসগোল্লা কেনার পর দাম মিটিয়ে দিতে গিয়ে মিষ্টির দোকানের ম্যানেজারকে কী মনে করে যেন আবার জিজ্ঞেস করে ফেলেন, 'আপনাদের গ্রামে কি কোনও নামকরা কবিরাজ আছেন?'

দোকানের বৃদ্ধ ম্যানেজার কৌতূহলী গলায় উল্টো প্রশ্ন করেন, 'কেন বলুন তো?'

তিনি আসল কারণ না বলে, ঘুরিয়ে বলেন, 'আমার খুব অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে। লোকমুখে শুনেছি, আপনাদের গ্রামে নাকি নামকরা এক কবিরাজ আছেন। তাই অনেক দূর থেকে সেই কবিরাজের চিকিৎসা নিতে এসেছিলাম।'

ম্যানেজার ভদ্রলোক বলেন, 'ছিলেন একজন। এখন নেই। বছর কুড়ি আগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর চিকিৎসার হাত খুব ভাল ছিল। যে কোনও রোগই ভাল করে দিতে পারতেন।'

রমিজ মিয়া বলেন, 'অনেকের কাছেই কবিরাজের খোঁজ করে এই একই কথা শুনেছি। ছিলেন একজন, এখন নেই-বছর কুড়ি আগে মারা গেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরাও নাকি সব তাঁর মৃত্যুর পর ইণ্ডিয়া চলে যায়। কিন্তু আমি যাকে খুঁজছি...'

রমিজ মিয়ার বলা শেষ হবার আগেই ম্যানেজার লোকটা বলতে থাকেন, 'ওনার ছেলে-মেয়েরা সবাই-ই ইণ্ডিয়া চলে গেছে, এটা ঠিক নয়। ভুল কথা। ওনার এক ছেলে ঢাকায় থাকে। ঢাকায়

BanglaBook.org

বাড়ি-গাড়ি আছে। ডাক্তার। ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতালের বড় ডাক্তার। এ ছাড়া কবিরাজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ঘরে যে মেয়েটা হয়েছিল সে-ও হয়তো এই দেশেই থাকে। সেই মেয়েটা বিশ-একুশ বছর বয়সে নিখোঁজ হয়ে যায়। সবার ধারণা, সে কোনও মুসলমান ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। তাই আর বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। সেই মেয়েটাও নিশ্চয়ই তার মুসলমান স্বামীর সঙ্গে বাংলাদেশে বাস করে। হিন্দুদের প্রতি আপনাদের ধারণা ঠিক না। সবাই-ই যে ইণ্ডিয়া চলে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়।'

রমিজ মিয়া আগ্রহী গলায় জানতে চান, 'কবিরাজের সেই বিশ-একুশ বছর বয়স্কা মেয়েটা কবে নাগাদ নিখোঁজ হয়? মাসখানিক আগে নাকি?'

ম্যানেজার বলতে লাগেন, 'আরে নাহ! বছর পঁচিশের কম হবে না। তখন কবিরাজও জীবিত ছিলেন। সেই মেয়েটা বড়ই অদ্ভুত ছিল...'

'বছর পঁচিশের কম হবে না,' এটা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে রমিজ মিয়া সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বছর পঁচিশ আগে যে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে, সেই মেয়ে তো আর কোনওভাবেই তাঁর বাড়ির পাগলি মেয়েটা হতে পারে না। ম্যানেজার ভদ্রলোক বলেই যাচ্ছিলেন। বয়স্করা পুরানো দিনের গল্প করতে পছন্দ করেন। ভদ্রতাবশত রমিজ মিয়াকে বাধ্য হয়ে সেসব শুনতে হয়েছে।

'...মেয়েটার চাল-চলন, কথা-বার্তা-আচরণ সবই অদ্ভুত ছিল। মেয়েটা সব সময় কেমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় পাথরের মূর্তির মত বসে থাকত। তার মধ্যে এমন সব অদ্ভুত রহস্যময় ক্ষমতা ছিল যা কোনও সাধারণ মানুষের থাকে না। যেমন সে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারত। কবে ঝড় হবে, কবে বৃষ্টি হবে, কবে নদীতে বান ডাকবে—সব আগে আগেই বলে

BanglaBook.org

দিত। গ্রামের কেউ মারা যাবার আগেও বলে দিত। তার ভবিষ্যৎ বর্ণনা কখনও ভুল প্রমাণ হয়নি। চোখ বন্ধ করে বহু দূরের মানুষ সম্পর্কেও সব কিছু বলে দিতে পারত। দূরের মানুষটা কী করছে, কী ভাবছে, কেমন আছে, কোথায় আছে, তার কোনও বিপদ হয়েছে কিনা—সব!

'পশু-পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারত। পশু-পাখিরাও তার কথা বুঝত, সে-ও পশু-পাখিদের কথা বুঝত। মাঝে-মাঝে সে তার মত করে কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মুরগিকে পরিচালনা করত।

'ধরুন, গাছের মগডালে একটা আম ঝুলছে। তার সেই আমটা খেতে ইচ্ছে করছে। সে নীচে দাঁড়িয়ে আমটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমটা এমনি-এমনি বোঁটা ছিঁড়ে নীচে পড়বে। এভাবে সে নারকেল গাছের ডাবের কাঁদির দিকে তাকিয়ে থেকে একটার পর একটা ডাব পেড়ে ফেলত।

'সে রেগে গেলে, তার আশপাশে যদি তখন কোনও কাচের জিনিস-পত্র থাকত তা এমনি-এমনি বিকট শব্দ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আর যার ওপর রাগত তার প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা হত এবং নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে শুরু করত। তাই ভয়েও কেউ কখনও তাকে খেপাত না।

'এ ছাড়া সে পানির নীচে ডুব দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারত। অনেকে নাকি তাকে শূন্যে ভেসে উঠতেও দেখেছে। অন্ধকারেও নাকি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পেত। বলা যায় তার কারণেই তার বাবার কবিরাজ হিসেবে অত নাম-ডাক হয়েছিল। যে কোনও রোগীকে দেখে, সে তার বাবাকে বলে দিত কী ওষুধ দিতে হবে। কোন্-কোন্ গাছের শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতে হবে। সেই সব শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা কোথায় পাওয়া যাবে তাও বলে দিত।

'মেয়েটার জন্মের আগেও একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটে। সে

BanglaBook.org

তখন তার মায়ের পেটে। এক দিন বজ্রসহ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঝড়-বৃষ্টি দেখছিলেন। জানালায় ছিল লোহার শিক। মহিলা লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা বাজ তাঁর উপর আঘাত হানে। তিনি ছিটকে পড়েন। কীভাবে যেন বেঁচে যান। তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে তাঁর স্বামীর কবিরাজি চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে এর পর থেকে তাঁর মধ্যে মানসিক বিকারগ্রস্ততা দেখা দেয়। উদ্ভট আচরণ করতে থাকেন। হাঁস-মুরগি, কুকুর, বিড়াল, ছাগল...এসব ধরে-ধরে পেটটা চিরে কলিজাটা বের করে খেয়ে ফেলেন। অবস্থা এমন হয় যে এক সময় তাঁকে শিকল্ দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। মেয়েটার জন্মের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কবিরাজ আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেন...'

চার

মাঝ রাত।

রমিজ মিয়ার হাঁপানির টান উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। হুস-হুস করে টেনে-টেনে অনেক কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন। মনে হচ্ছে এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন।

আজ রাতে তিনি দোকান থেকে বাসায় ফিরেছেন বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে। ভুলে ছাতা নিয়ে বের হননি। তাতেই ঠাণ্ডা লেগে এই অবস্থা।

মরিয়ম বেগম গরম সরিষার তেল রমিজ মিয়ার বুকে মালিশ করে দিচ্ছেন। কিন্তু হাঁপানির প্রকোপ তাতে একটুও কমছে না। বরং যেন বেড়ে যাচ্ছে। তিনি মুখ হাঁ করে খাবি-খাওয়া মাছের মত

BanglaBook.org

করছেন।

মরিয়ম বেগমের খুব অস্থির লাগছে। এত রাতে ডাক্তার ডেকে আনার উপায়ও নেই। তার ওপর বাইরে সাংঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না! খাটের নীচে পাঁঠাটা মাঝে মাঝে ভ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা করে ডেকে উঠছে।

পাগলি মেয়েটা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে জেগে উঠে রমিজ মিয়াকে দেখতে এসেছে। রমিজ মিয়ার অবস্থা দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

রমিজ মিয়ার শ্বাসকষ্ট শুরু হবার পর মরিয়ম বেগম ইচ্ছে করেই পাগলি মেয়েটাকে জাগাননি। পাগলিকে জাগিয়ে কী হবে! শুধু-শুধু ঝামেলা বাড়বে।

মেয়েটা কিছুক্ষণ রমিজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। তাই দেখে মরিয়ম বেগমও উঠে মেয়েটার পিছু-পিছু গেলেন। পাগলি আবার কী পাগলামি করার জন্য ছুটে গেল তা দেখার জন্য। তেমন কিছু করলে বাধা দেবেন।

মেয়েটা সোজা সদর দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। মরিয়ম বেগম পিছন থেকে অনেক ডাকলেন, 'এই মেয়ে, তুই এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস?! এই মেয়ে, এই...'

মেয়েটার কানে যেন মরিয়ম বেগমের ডাক ঢুকলই না। সে চোখের পলকে বাইরে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

মরিয়ম বেগম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে আবার এসে রমিজ মিয়ার পাশে বসলেন। এ ছাড়া তাঁর কী-ই বা করার আছে?! তিনি তো আর পাগলিকে আটকাতে এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পিছু-পিছু ধাওয়া করতে পারেন না। রাস্তার একটা পাগলি, যা খুশি তাই করুক—যেখানে ইচ্ছে যাক! তাতে তাঁর কী যায়-আসে!

রমিজ মিয়া এখন টেনে-টেনে হুস-হুস করে শ্বাস নেবার সঙ্গে-

BanglaBook.org

সঙ্গে গোঁ-গোঁ শব্দ করছেন। ঠোঁটের কোনা বেয়ে লালা গড়িয়ে নামছে। মরিয়ম বেগমের ভয় লাগছে, লোকটা বোধহয় আজ রাতেই মারা যাবে! রমিজ মিয়া মারা গেলে তাঁর কী উপায় হবে?! এত বড় পৃথিবীতে তাঁর আপনজন বলতে এই একজন! সন্তানাদিও নেই! কাকে নিয়ে থাকবেন তিনি?! মরিয়ম বেগমের চোখ ভিজে উঠতে লাগল।

ঘণ্টাখানিক পেরিয়ে গেছে। রমিজ মিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। হুঁপ-হুঁপ করে দম আটকে-আটকে অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন। কোনও হুঁশ-জ্ঞান নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধহয় চিরতরে শ্বাস নেয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

মরিয়ম বেগম আকুল হয়ে কেঁদে-কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। কে যেন বাইরে থেকে সদর দরজায় দুম-দুম শব্দ করছে। কে এসেছে? পাগলি কি আবার ফিরে এসেছে? মরিয়ম বেগমের ইচ্ছে করছে না উঠে গিয়ে দরজা খুলতে। তাঁর মন বলছে, তিনি রমিজ মিয়ার পাশ থেকে সরলেই রমিজ মিয়া মারা যাবেন!

দরজায় দুম-দুম শব্দ বেড়েই চলেছে। যেন দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছে। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক সময় বাধ্য হয়ে মরিয়ম বেগম চোখ মুছতে-মুছতে গিয়ে দরজা খুললেন।

দরজার সামনে পাগলি দাঁড়ানো। ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে তার চেহারা একেবারে ঝড়ো কাকের মত বিধ্বস্ত।

দরজা খুলে পাগলিকে দেখেই মরিয়ম বেগম ঠাস-ঠাস করে সজোরে কতগুলো চড় বসিয়ে দিলেন মেয়েটার দু'গালে।

মেয়েটা তাতে কিছু মনে করল বলে মনে হলো না। সে তার জড়ানো গলায় হাউমাউ করে কিছু বোঝাতে চাইছে। হাত বাড়িয়ে ধরেছে। দুই হাতের মুঠো ভর্তি কতগুলো বুনো শিকড়-বাকড় আর লতা-পাতা।

BanglaBook.org

পাগলি মেয়েটা কী বলছে তা মরিয়ম বেগম বুঝতে পারলেন। মেয়েটা তাঁকে এই শিকড়-বাকড়-লতা-পাতার রস করে রমিজ মিয়াকে খাওয়াতে বলছে।

প্রথমে মরিয়ম বেগম রাজি হতে চাননি। পাগলি, কোথা থেকে কী সব শিকড়-বাকড় নিয়ে এসেছে তা খাওয়ালে পরে কিনা রমিজ মিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হয়। মেয়েটা কাঁদতে-কাঁদতে হাত জোড় করে অনুরোধ করতে থাকে। মরিয়ম বেগম ঠিক ভেবে পান না কী করবেন। ওদিকে রমিজ মিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বলা যায় এখন নাভিশ্বাস উঠছে। হঠাৎ মরিয়ম বেগমের মনে হয়, পাগল, মাথা খারাপ ধরনের লোকের মধ্যে কখনও-কখনও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখা যায়। এদের দেয়া কিছু অবহেলায় ফেলে দিতে নেই। দেখাই যাক না পাগলির আনা শিকড়-বাকড়-লতা-পাতার রস করে খাইয়ে কী অবস্থা হয়।

পাগলির আনা শিকড়-বাকড়-লতা-পাতার রস করে খাওয়ানোর পর আশ্চর্যজনকভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে রমিজ মিয়ার হাঁপানির টান কমে গেল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

মরিয়ম বেগম কৃতজ্ঞ চোখে পাগলির দিকে তাকালেন। মেয়েটা অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি উঠে গিয়ে মেয়েটার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'মা, তোকে যে এতগুলো চড় মারলাম, খুব ব্যথা পেয়েছিস, না?'

মেয়েটা বরাবরের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তার ফর্সা গাল দুটোতে চড় মারার দাগ পড়ে রয়েছে। মরিয়ম বেগম দু-হাত দিয়ে গাল দুটো চেপে ধরে বলতে লাগলেন, 'কী করব বল, মা! তোর চাচার অবস্থা দেখে আমার মাথা ঠিক ছিল না! তার মধ্যে এই গভীর রাতে তুই কিছু না বলে বাইরে চলে গেলি। খুব রাগ লাগছিল! তখন তো আর বুঝিনি, তুই তোর চাচাজানের জন্য গাছ-

BanglaBook.org

গাছড়ার শিকড়-বাকড় আনতে গিয়েছিস। আমাকে ক্ষমা করে দে। আমার ভুল হয়ে গেছে!'

মেয়েটার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। দু-চোখ ছাপিয়ে দর-দর করে চোখের পানি ঝরতে লাগল। মরিয়ম বেগম মেয়েটার দু-চোখ তাঁর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিতে-দিতে ধরা গলায় বললেন, 'কে বলেছে তুই পাগলি! তুই মোটেও পাগলি নস! তোর চাচাজান সুস্থ হয়ে উঠলে তোকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে বলব। তোকে আমরা সুস্থ করে তুলব। আমাদের কোনও ছেলে-পুলে নেই! এখন থেকে তুই-ই আমাদের মেয়ে। তুই আমাকে এখন থেকে মা বলে ডাকবি। ডাক না 'মা' বলে। আমি জীবনেও কোনও দিন কারও মুখে মা ডাক শুনিনি!!!'

মেয়েটা স্পষ্ট স্বরে মা বলে ডেকে উঠল। সব সময়ের মত মোটেও জড়ানো গলায় বলেনি। মরিয়ম বেগম যুগপৎ আনন্দিত এবং অবাক হলেন। আনন্দে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'আবার ডাক তো, মা! আবার ডাক!'

মেয়েটা আবার ডাকল, 'মা।'

মরিয়ম বেগম আবেগে আপ্লুত হয়ে পাগলিকে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায়-পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। এক সময় আশ্চর্য-হওয়া গলায় বললেন, 'মা, তোর গায়ে দেখি এখনও ভেজা শাড়ি! যা গিয়ে শিগ্‌গির পাল্টে নে।' এই বলে জড়িয়ে ধরা অবস্থা থেকে ছেড়ে দিলেন

মেয়েটা ছাড়া পেতেই কিছু মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে কোমরে হাতড়ে শাড়ির ট্যাক থেকে আবার কিছু লালচে রঙের শিকড় বের করল। শিকড়গুলো মরিয়ম বেগমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বরাবরের মত জড়ানো গলায় বলল, 'মা, এগুলো আপনার জন্য এনেছি। আপনি এগুলো রস করে খান।'

মরিয়ম বেগম শিকড়গুলো হাতে নিলেন। মুখে বললেন, 'তুই

BanglaBook.org

যখন দিয়েছিস, অবশ্যই আমি খাব। আমি জানি, নিশ্চয়ই এতে আমার ভাল হবে।'

একটু বেলা করে রমিজ মিয়ার ঘুম ভাঙল। ঝড়-বৃষ্টির রাতের পর রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকঝকে সকাল।

রমিজ মিয়া বিছানা থেকে উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙলেন। তাঁর গায়ে মোটেও জ্বর নেই। নেই সামান্যতম শ্বাসকষ্ট। একেবারে ঝরঝরে-তরতরে লাগছে শরীরটা। যাদের অ্যাজমার সমস্যা থাকে তাদের সব সময়ই বুকে হালকা চাপ-চাপ অনুভব হয়। তা-ও নেই! মনে হচ্ছে যেন তাঁর অ্যাজমা বলে কিছুই নেই। সুস্থ-সবল একজন পুরুষ। মনের ভিতর কেমন তারুণ্যের ফুর্তি-ফুর্তি ভাব জাগছে।

রমিজ মিয়া নিম ডালের মাজন দিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে বাড়ির খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। উঠানে মরিয়ম বেগম গোসলের পর ভেজা কাপড় রোদে মেলে দিচ্ছেন। মরিয়ম বেগমের গায়ে জলপাই রঙের শাড়ি-ব্লাউজ। এ কী, মরিয়ম বেগমকে আজ এত সুন্দর লাগছে কেন?! বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে গোসলের পর মরিয়ম বেগমকে দেখে তিনি যেমন মুগ্ধ হয়ে যেতেন, তেমনি বিমোহিত হয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলেন। যেন সেই প্রথম জীবনের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে!

মরিয়ম বেগমের চোখ পড়ল তাঁর স্বামীর দিকে। চোখ পড়তেই বলে উঠলেন, 'শরীর এখন কেমন ঠেকছে?'

'ভাল! খুব ভাল! তোমাকে দেখে শরীর এখন আরও ভাল লাগছে। একটু কাছে এসো না!'

মরিয়ম বেগম লজ্জা-পাওয়া গলায় বললেন, 'বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরল নাকি?!'

মরিয়ম বেগম মুখে ওকথা বললেও ভিতরে-ভিতরে খুব খুশি হচ্ছেন। কী জানি, পাগলি মেয়েটার দেয়া শিকড়ের রস খাওয়ার

BanglaBook.org

পর থেকেই তাঁর ভিতর কেমন কিশোরী-কিশোরী ভাব চলে এসেছে!

রমিজ মিয়া এগিয়ে আসছেন। মরিয়ম বেগমের খুব লজ্জা লাগছে। বিয়ের পর প্রথম দিকে যেমন লজ্জা লাগত তেমন!

পাঁচ

রমিজ মিয়ার সুখের দিন। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বেগম সন্তানসম্ভবা। এই বয়সে গর্ভধারণ করার কথা নয়। কী করে যেন আশ্চর্যজনকভাবে অসম্ভব ব্যাপারটা ঘটেছে! বোধহয় পাগলি মেয়েটার দেয়া ওষধি গাছের শিকড়ের রস খাওয়ার কারণে। নিশ্চয়ই ওই মেয়েটার ওপর জিনের আছর আছে! জিনের মাধ্যমেই সে হয়তো ওই ওষধি শিকড় এনে দিয়েছে। রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগমের এত দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। তাঁরা এখন পাগলি মেয়েটাকে আগের চেয়েও বেশি পছন্দ করেন।

পাগলি মেয়েটা এখন আর আগের মত ততটা খায় না। সে খাওয়া-দাওয়া একদমই কমিয়ে দিয়েছে। তার শরীরের পুষ্টির ঘাটতি বোধহয় পূরণ হয়ে গেছে। তার রোগা-পাতলা শরীর এখন পুরোপুরিই সেরে উঠেছে। সে এখন স্বাস্থ্যবতী, লাবণ্যময়ী, অপরূপ রূপবতী এক তরুণী। সারা পৃথিবী খুঁজেও বোধহয় তার চেয়ে সুন্দরী পাওয়া যাবে না! এদিকে গর্ভধারণ করার পর থেকে মরিয়ম বেগমের খাওয়া-দাওয়া খুবই বেড়ে গেছে। তিনি আজকাল সারাক্ষণ পাগলি মেয়েটার পছন্দের খাবার মাংস, ডিম; কলিজা, মগজ...এসব খেতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন, এই খাওয়া তাঁর জন্য নয়, তাঁর পেটের বাচ্চাটার জন্য।

BanglaBook.org

পাগলি মেয়েটাকে আজকাল আর পাগলি বলাও ঠিক হচ্ছে না। সে পুরোপুরি সভ্য-শান্ত হয়ে গেছে। আজকাল কথাও বলে স্পষ্ট স্বরে। কথা বলার সময় জিভ জড়িয়ে যাবার সমস্যা আর নেই। তবে খুব কম কথা বলে। সারাক্ষণ চুপচাপ ঝিম মেরে কোথাও বসে থাকে। অবশ্য নতুন করে আর একটা অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। সে হাতের কাছে ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, খড়কুটো যা পায় তাই মুখের লালা দিয়ে জুড়ে-জুড়ে পাখির বাসার মত কিছু একটা বানাতে চায়। মাঝে-মাঝে মাঝ রাতে তাকে ঘরে পাওয়া যায় না। ফজরের আযানের আগে-আগে ফিরে আসে। তখনও তার হাতে-মুখে ময়লা, ঝুল, খড়কুটো, শুকনো ঘাস, লতা-পাতার টুকরো লেগে থাকতে দেখা যায়।

গভীর রাতে সে যে বাইরে যায়; এই ব্যাপারটা মরিয়ম বেগমের চোখে কয়েকবার ধরা পড়েছে। মরিয়ম বেগম আজকাল রমিজ মিয়ার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমান। রমিজ মিয়ার খাটের নীচে এখন আর পাঁঠা রাখা হয় না। তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর আর কোনও দিনও অ্যাজমার সমস্যা হবে না।

মরিয়ম বেগম রাতে পানি খাওয়ার জন্য যখন ওঠেন তখন একবার পাগলির শোবার ঘর থেকেও ঘুরে যান। মেয়েটাকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খুব ভালবেসে ফেলেছেন। কিছুতেই মেয়েটাকে হারাতে চান না।

রাতে খোঁজ নিতে এসে মরিয়ম বেগম যখন মেয়েটাকে বিছানায় দেখতে পান না তখন তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। আর বুঝি মেয়েটা ফিরবে না! তিনি বসে-বসে মেয়েটার ফেরার অপেক্ষা করেন। ব্যাপারটা তিনি রমিজ মিয়াকেও জানিয়েছেন। রমিজ মিয়া বলেছেন, 'ওর ব্যাপারে এত মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ও স্বাভাবিক কোনও মেয়ে নয়! জিনের আছর থাকা মেয়ে! এমনও হতে পারে ও নিজেই একটা পরী! আমাদের সংসারে ও আশীর্বাদ

BanglaBook.org

হয়ে এসেছে! এই নিয়েই আমরা তুষ্ট থাকি।'

সন্ধ্যা রাত।

রমিজ মিয়ার দোকানে মোমের আলো। ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেল থেকে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। একটু ঝড়-বৃষ্টি হলেই ইলেকট্রিসিটি একেবারে নেই হয়ে যায়। পল্লী বিদ্যুৎ-এর এই-ই দশা! দোকানে কোনও কাস্টমারও নেই।

তবে রমিজ মিয়া দোকানে একা নন। তাঁর সঙ্গে হাজী সলিমউল্লাহ হাই স্কুলের সায়েন্স শিক্ষক জালাল উদ্দিন রয়েছেন। জালাল উদ্দিনের সঙ্গে রমিজ মিয়ার ছোটবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। তাঁরা একে অপরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন।

রমিজ মিয়া ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে, লেখা-পড়া বাদ দেন। অথচ জালাল উদ্দিন ঢাকা ভার্সিটি থেকে প্রাণিবিজ্ঞানের উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বের হন।

জালাল উদ্দিন খুবই জ্ঞানী লোক। অনেক পড়াশোনা তাঁর। কে জানে কী কারণে এই গ্রামের স্কুলে পড়ে রয়েছেন! চিরকুমার। সারাক্ষণ পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে তাঁর ভাল লাগে। ঘর ভর্তি মোটা-মোটা বিজ্ঞানের বই। এ ছাড়া বিভিন্ন বিদেশি পত্রিকাও সংগ্রহ করেন। সেসব পত্রিকার সায়েন্স জার্নালগুলোর প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি। নিজেও মাঝে-মাঝে দেশি-বিদেশি পত্রিকায় ফিচার লেখেন।

জালাল উদ্দিন প্রতি সন্ধ্যায়ই রমিজ মিয়ার দোকানে আসেন। আড্ডা দিতে নয়, খবরের কাগজ পড়তে। রমিজ মিয়া প্রতিদিন দুটো করে খবরের কাগজ রাখেন। তাঁর নিজের তেমন খবরের কাগজ পড়ার আসক্তি নেই। জালাল উদ্দিনের জন্যই রাখেন। জালাল উদ্দিনকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। জ্ঞানী মানুষ, তাঁর জ্ঞানী-জ্ঞানী কথাবার্তা শুনতে ভাল লাগে। অনেক কিছু জানা যায়।

BanglaBook.org

রমিজ মিয়া এমনিতে কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করেন না। তবে জালাল উদ্দিনের সঙ্গে সব কথাই বলেন। পাগলি মেয়েটাকে কোথায়-কীভাবে পেয়েছেন, মেয়েটার আচার-ব্যবহার, মেয়েটার দেয়া শিকড়-বাকড়-লতা-পাতার রস খেয়ে তাঁর অ্যাজমা চিরতরে ভাল হয়ে গেছে, তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে–শুরু থেকে এসবই জানিয়ে আসছেন। পাগলি মেয়েটাকে ইদানীং তাঁর যে পরী বলে সন্দেহ হয় তাও বলেছেন।

জালাল উদ্দিনের মতে জিন-পরী বলতে বাস্তবে কিছুই নেই। সবই গল্পগাথা। জিন-পরীর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে তিনি ভিতরে-ভিতরে পাগলি মেয়েটাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবছেন। মেয়েটাকে তিনিও স্বাভাবিক মানুষ মনে করছেন না। কিছু একটা ব্যাপার আছে! একদিন তিনি রমিজ মিয়ার বাড়ি গিয়েছিলেন মেয়েটাকে দেখতে। মেয়েটাকে দেখে তিনি চমকে যান। অমন নিখুঁত সুন্দরী সাধারণত খুব কমই দেখা যায়। গা থেকে যেন উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে! চোখে চোখ পড়তেই তাঁর কেমন অস্বস্তি হয়। মনে হয় মেয়েটা যেন তাঁর মাথার ভিতর ঢুকে গেছে! খোলা বইয়ের মত তাঁকে পড়ে ফেলছে! তিনি যে মেয়েটাকে অতিমানবী পর্যায়ের কিছু সন্দেহ করছেন, এটাও বুঝে ফেলেছে! তাঁর মাথার ভিতরে ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখ সরিয়ে নেবার আগে দেখেন, মেয়েটার ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

আজও পাগলি মেয়েটাকে নিয়ে কথা হচ্ছে রমিজ মিয়া আর জালাল উদ্দিনের মধ্যে।

রমিজ মিয়া যেই বললেন, পাগলি মেয়েটা আজকাল কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। সারাক্ষণ মুখের লালা লাগিয়ে-লাগিয়ে খড়কুটো, ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, শুকনো ঘাসের টুকরো জুড়ে-জুড়ে পাখির বাসার মত কী যেন বানাতে চায়। এরপর থেকেই

BanglaBook.org

জালাল উদ্দিন কেমন ঝিম মেরে গেছেন।

অনেকক্ষণ পর জালাল উদ্দিন মুখ খুললেন, 'বজ্রথুথুপুর গ্রামের সেই কবিরাজের মেয়েটা কবে নাগাদ জানি নিখোঁজ হয়েছিল?'

রমিজ মিয়া অবাক হয়ে বললেন, 'সেটা জেনে কী করবে?! পঁচিশ বছর আগে মনে হয়।'

'ও, আচ্ছা। সেই মেয়েটা তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তো তার মায়ের উপর একবার বজ্রপাত হয়েছিল; তাই না?'

'হ্যাঁ। মহিলা কীভাবে যেন বেঁচে গিয়েছিলেন!'

'সেই মেয়েটাই নাকি তার কবিরাজ বাবাকে বলে দিত, কোন্ রোগীকে কোন্ গাছের শিকড়-বাকড়, রস দিয়ে ওষুধ বানিয়ে দিতে হবে। তা কি তোমার খেয়াল আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে ওষধি গাছের শিকড়-বাকড় এনে দিয়েছে তোমার বাড়ির পাগলি মেয়েটা। এতে তুমি কোনও মিল খুঁজে পাওনি?'

'না তো! মাথা খারাপ, পাগলদের মধ্যে অনেক সময় এধরনের ওষধি গাছ-গাছড়ার শিকড়-বাকড় জোগাড় করে দেবার ক্ষমতা দেখা যায়। এটা তারা কীভাবে করে জানি না। অনেকে বলে জিনের মাধ্যমে করে। তুমি কি বলতে চাচ্ছ, পঁচিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া কবিরাজের সেই মেয়েটাই এই পাগলি মেয়েটা! সেটা কোনও দিনও সম্ভব?! সেই মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছিল বিশ-একুশ বছর বয়সে। পঁচিশ বছর পরও তার বয়স বিশ-একুশ থাকবে, তা কী করে হয়?!'

'তোমার-আমার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যা ভাবছি, সে যদি তাই হয়, তা হলে সম্ভব।'

'তুমি কী ভাবছ?'

'চলো, আগে যাচাই করে দেখি। তারপর বলছি আমি কী

BanglaBook.org

সন্দেহ করছি।'

রমিজ মিয়া আশ্চর্য-হওয়া গলায় বললেন, 'কোথায় যাব?!'

'মেয়েটাকে তুমি যেখান থেকে পেয়েছ সেখানে। মানে, পরিত্যক্ত জুট মিলটায়। সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখি আমার সন্দেহ মিলে যায় কিনা।'

রমিজ মিয়া আর জালাল উদ্দিন পরিত্যক্ত জুট মিলের ভিতরে। তাঁদের দু'জনের হাতে বড়-বড় দুটো টর্চ। টর্চের আলো ফেলে-ফেলে তাঁরা খোলা, লম্বা জুট মিলের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ধুলো-ময়লা, মাকড়সার ঝুল আর ভাপসা গন্ধ ছাড়া কিছুই তাঁদের চোখে পড়ছে না।

তাঁরা জুট মিলের একেবারে ভিতরের দিকে শেষ মাথায় চলে এসেছেন। সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর মেঝেতে একটা লোহার শেডের পাটাতনের মত দেখতে পেলেন। দু'জনে মিলে পাটাতনটা তুলে ফেললেন। দেখা গেল একটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে।

তাঁরা বুঝতে পারলেন মেঝের নীচের ওই ঘরটা জুট মিলের গুদাম ঘর হিসেবে ব্যবহার হত।

তাঁরা সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেলেন। বেশ বড়সড় ফাঁকা একটা কামরা। স্যাঁতসেঁতে ভেজা-ভেজা গন্ধ। কেমন দম বন্ধ-দম বন্ধ পরিবেশ।

কয়েক পা এগোতেই তাঁদের টর্চের আলোতে ধরা পড়ল, সিলিং থেকে নামা মাকড়সার ঝুলের মত এক গুচ্ছ আঁশযুক্ত কিছুর মাথায় কোলবালিশের মত বিশাল একটা পোঁটলা ঝুলছে।

তাঁরা দু'জন সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পোঁটলাটা খড়কুটো, ছেঁড়া পাটের আঁশ আর নারকেল-সুপারি জাতীয় গাছের পাতা চিরে-চিরে লালা জাতীয় কিছু লাগিয়ে বাবুই পাখির বাসার মত

BanglaBook.org

ঠাসবুনটে তৈরি হয়েছে। দানব আকৃতির রেশম পোকার গুটির সঙ্গেও তুলনা করা যায়। পোঁটলার এক মাথা ডিমের খোসার মত ভাঙা। ভাঙা অংশটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ভিতরটা ফাঁপা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এর ভিতরে কিছু ছিল। মাথাটা ভেঙে ভিতর থেকে বের হয়ে গেছে।

রমিজ মিয়া বিস্মিত গলায় বলে উঠলেন, 'এটা কী?!'

জালাল উদ্দিন বিজ্ঞের মত বলতে লাগলেন, 'এটা ঘুমবাড়ি। এই ঘুমবাড়ির মধ্যেই তোমার বাড়ির পাগলি মেয়েটা পঁচিশ বছর ধরে ঘুমিয়ে ছিল। এই ঘুমকে বলে হাইবারনেশন। সাপ, ব্যাঙ, ক্যাটফিশ...কানাডা-উত্তর আমেরিকায় গ্রিজলি ভালুকরা এভাবে শীতের সময় শীতঘুম দেয়। ওরা অবশ্য এমন ঘুমবাড়ি বানায় না। কোনও গর্তে-টর্তে আশ্রয় নেয়। উন্নত-বুদ্ধিমান প্রাণীর কাজ-কর্ম উন্নত হবে এটাই স্বাভাবিক।'

রমিজ মিয়ার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কাছে জালাল উদ্দিনের কথা অবিশ্বাস্য লাগছে। তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ়-হওয়া গলায় বললেন, 'ওই মেয়েটা কেন পঁচিশ বছর ধরে ঘুমিয়ে কাটাবে?! সেটা কি কোনও মানুষ করতে পারে?!'

'পারে। অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পন্ন Homo Superior হলে পারে। Homo Superior হচ্ছে Homo Sapiens-এর উন্নত প্রজাতি। আমরা সাধারণ মানুষরা হচ্ছি Homo Sapiens। মিউটেশনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ডি.এন.এ পরিবর্তিত হয়ে Homo Superior তৈরি হবার কথা। পারমাণবিক রেডিয়েশন অথবা যে কোনও ধরনের রেডিয়েশনের প্রভাবে ডি.এন.এ পরিবর্তন হতে পারে। ওই মেয়েটা যখন তার মায়ের পেটে তখন তার মায়ের উপর বজ্রপাত হয়েছিল। বজ্রপাতের রেডিয়েশনের প্রভাবেই মেয়েটা হয়তো Homo Superior হয়ে জন্মেছিল।'

রমিজ মিয়া বসে-যাওয়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'সে যা-ই হোক,

BanglaBook.org

অন্য কিছু তো নয়–মানুষই তো! আমাকে এটা বোঝাও, পঁচিশ বছর ধরে ঘুমিয়ে কাটাবে কেন?!'

জালাল উদ্দিন আবার বিজ্ঞের মত বলতে লাগলেন, 'বুদ্ধিমান উন্নত প্রজাতির মানুষরা কখনওই আমাদের মত জাগতিক কাজে নিজেকে নিঃশেষ করবে না। তারা আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য–সবকিছু কম ব্যবহার করবে। এমনকী নিজেদের আয়ু পর্যন্ত। হাইবারনেশনের মাধ্যমে তারা এটা করে। তারা এক-একজন হাজার-হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকবে।'

রমিজ মিয়া আবার প্রশ্ন করলেন, 'ওই মেয়েটার মত উন্নত প্রজাতির মানুষ আর ক'জন আছে পৃথিবীতে?'

'আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও Homo Superior জন্ম নেয়নি। হতে পারে তোমার বাড়ির ওই পাগলি মেয়েটাই পৃথিবীর প্রথম Homo Superior। আমি ওই মেয়েটার কথা বিদেশি পত্রিকায় চিঠি লিখে জানাব। মেয়েটার কথা জানার পর জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে হইচই পড়ে যাবে। তারা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মেয়েটার ডি.এন.এ-র সিকোয়েন্সগুলো জেনে ফেলবে। মেয়েটাকে চোখে-চোখে রাখতে হবে। মেয়েটা খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, এর মানে ওর আবার গুপ্ত কোনও স্থানে হাইবারনেশনে যাবার সময় হয়ে এসেছে। হাইবারনেশনে থাকার মত পর্যাপ্ত চর্বি গায়ে জমিয়ে ফেলেছে। হাইবারনেশনে যাবার জন্যই এতদিন বেশি-বেশি খেয়ে গায়ে চর্বি জমিয়েছে। ওকে হারিয়ে ফেললে বিদেশি পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়ে কিন্তু কিছুই করা যাবে না।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

সকাল থেকে পাগলি মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। কোথাও নেই মেয়েটা। মেয়েটার জন্য তাঁদের খুব খারাপ লাগছে! মন কেমন করছে। বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে! তাঁরা দু'জনেই মেয়েটাকে বড্ড বেশি ভালবেসে ফেলেছেন!

রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম খুঁজতে-খুঁজতে এক পর্যায়ে তাঁদের বাড়ির পিছনের পরিত্যক্ত গোয়ালঘরটায় এসে ঢুকেছেন। গোয়ালঘরের মাঝ বরাবর আড়ার সাথে খড়কুটো, ছেঁড়া কাগজ, শুকনো ঘাস, লতা-পাতা দিয়ে বানানো বিশাল আকৃতির কোলবালিশের মত একটা পোঁটলা ঝুলছে।

মরিয়ম বেগম সাংঘাতিক আশ্চর্য হয়ে অস্ফুট গলায় বলে উঠলেন, 'এটা কী?!!'

রমিজ মিয়া ঘোরলাগা মানুষের মত বলতে লাগলেন, 'এটা ঘুমবাড়ি!!! এমনই একটা ফাঁকা ঘুমবাড়ি গতরাতে জালাল আমাকে জুট মিলের মাটির নীচের গুদাম ঘরেও দেখিয়ে এনেছে। দেখিয়ে বলেছিল, ওই ঘুমবাড়িটার মধ্যেই পাগলি মেয়েটা গত পঁচিশ বছর ধরে ঘুমিয়ে ছিল! মেয়েটা নাকি নতুন উন্নত প্রজাতির মানুষ! আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়। আমি তখন জালালের কথা বিশ্বাস করিনি। এখন বুঝতে পারছি জালাল যা বলেছে, তা ঠিক। মেয়েটা এখন এই ঘুমবাড়িটার ভিতরে! জালাল আমাকে এমনটাই বলেছিল যে, মেয়েটা এখন আবার কোনও গুপ্ত জায়গায় ঘুমবাড়ি বানিয়ে নেবে। জালালকে কি এই ঘুমবাড়ির কথা জানাব? জানানো

BanglaBook.org

কি ঠিক হবে? জালাল জানতে পারলে, চিঠি লিখে পৃথিবীর বড়-বড় বিজ্ঞানীদের এই ঘুমবাড়ির কথা জানিয়ে দেবে। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। ঘুমবাড়ি থেকে মেয়েটাকে বের করে গবেষণার জন্য নিয়ে যাবে। কিছু বলছ না কেন, জালালকে কি জানাব?'

মরিয়ম বেগম ঝিম মেরে রয়েছেন। তাঁর মাথার ভিতর কেউ কথা বলছে। কথা বলছে তাঁর পেটের ভিতরের অনাগত বাচ্চাটা। এর আগেও তাঁর এমনটা কয়েকবার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, পেটের ভিতরে বাচ্চাটা তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'এই, তুই ছেলে, না মেয়ে?'

জবাব দেয়, 'ছেলে।'

এরপর থেকে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান তাঁর ছেলেই হবে।

এখন আবার বাচ্চাটা পেটের ভিতর থেকে কথা বলছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন, 'মা, এই ঘুমবাড়ির কথা কাউকে জানিয়ো না। কাউকে জানিয়ো না। ভুলেও কাউকে জানিয়ো না। ভুলেও কখনও জানিয়ো না...ঘুমবাড়ির ভিতরের ওই মেয়েটার মত আমিও একজন নতুন প্রজাতির মানব। আমি এখন তোমার পেটের ভিতরের ঘুমবাড়িতে। কিছুদিনের মধ্যেই তোমার পেটের ভিতরের এই ঘুমবাড়ি থেকে আমি বের হয়ে জন্ম নেব। ওই মেয়েটাও আবার পঁচিশ বছর পর ঘুমবাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসবে। তখন আমার সঙ্গে ওই মেয়েটার বিয়ে হবে। আমাদের থেকেই ধীরে-ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নতুন প্রজাতির উন্নত মানব সম্প্রদায়। ততদিন আমাদের দু'জনকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের। ঘুমবাড়ির কথা ভুলেও কাউকে জানিয়ো না...'

BanglaBook.org

কালো সিন্দুক

দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসা ফজরের আযানের শব্দে জরিনার ঘুম ভাঙল। পাশে জরিনার স্বামী বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। স্বামীর নাম মতি। মাত্র দু'দিন হলো মতির সঙ্গে জরিনার বিয়ে হয়েছে।

মতি আত্মীয়-পরিজনহীন। একা মানুষ। কয়েক বছর আগে এক রাতে হঠাৎ আসা বানের পানি মতির বৃদ্ধা মা আর একমাত্র ছোট বোনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মতি কোনওক্রমে ঘরের চালে উঠে টিকে যায়। সেই থেকে দু'দিন আগ পর্যন্ত মতি একাই ছিল।

জরিনার গায়ের রং কালো। একেবারে পাতিলের তলার মত কালো। তবে মুখের আদল খুব একটা খারাপ না। টানা-টানা চোখ। প্রশস্ত কপাল। চিকন ভুরু। উঁচু নাক। পাতলা ঠোঁট। ছোট্ট চিবুক। মাথা ভর্তি দিঘল কালো চুল। তাতে কী হবে– গায়ের রং কালো বলে বিয়ে হচ্ছিল না। একটার পর একটা সম্বন্ধ এসে ফিরে যাচ্ছিল।

জরিনার বাবা আশপাশের বিভিন্ন হাটে-হাটে নারকেল-সুপারি বিক্রি করেন। যেদিন যে গ্রামে হাট বসে সেখানে গিয়ে তিনি নারকেল-সুপারির পসরা সাজিয়ে বসেন।

চন্দা নদীর পাশে রহমতখালী বাজার। রহমতখালী বাজারের সামনে বিশাল খোলা মাঠে প্রতি শুক্রবার হাট বসে। মতির রহমতখালী বাজারে একটা চা-পান-সিগারেটের দোকান আছে।

BanglaBook.org

সেখান থেকেই মতির সঙ্গে জরিনার বাবার পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই মতিকে জরিনার বাবার খুব মনে ধরে। যেমন নম্র-ভদ্র তেমন বিনয়ী, মৃদুভাষী ছেলে। অল্প কয়েক দিনের পরিচয়েই তাদের মধ্যে বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জরিনার বাবা প্রায়ই হাটের বেচা-কেনা শেষে রাতে ফেরার সময় মতিকে সঙ্গে করে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। বাড়িতে আগেই বলা থাকে সেদিন যেন ভাল-মন্দ কিছু রান্না করা হয়। মতি একা মানুষ। নিজের খাবার নিজেই হাত পুড়িয়ে রান্না করে। ব্যাটা ছেলে মানুষ, কী না কী রান্না করে কে জানে! তাই মাঝে মধ্যে ভাল খাওয়ানোর জন্য জরিনার বাবা সঙ্গে নিয়ে আসেন। অবশ্য জরিনার বাবার মনে আরও একটা গোপন বাসনাও থাকে—কোনওক্রমে পটিয়ে-পাটিয়ে মতির সঙ্গে যদি জরিনার বিয়েটা দেয়া যায়।

জরিনার বাবার ইচ্ছা পূরণ হয়। মতি জরিনাকে পছন্দ করে। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়। বিয়ের দিন-তারিখ ধার্য করা হয়। বিয়ের দিন ধার্য হয় গত শুক্রবার এশার নামাজের পর। অর্থাৎ গত পরশুর আগের দিন এশার নামাজের পর। গরিবের বিয়ে, আনুষ্ঠানিকতার তেমন বালাই নেই। এশার নামাজের পর মতি একটা নতুন পাঞ্জাবি পরে জরিনাদের বাড়ি উপস্থিত হবে। মসজিদের ইমাম সাহেবকে আগেই বলা থাকবে। ইমাম সাহেব এসে বিয়ে পড়িয়ে খেয়ে-দেয়ে বিদেয় হবেন। বাইরের অতিথি বলতে শুধু ইমাম সাহেব।

বিয়ের নির্ধারিত দিনে এশার নামাজের পর শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবার আগেই কোনওক্রমে ইমাম সাহেব এসে পড়েন। কিন্তু মতির দেখা নেই। জরিনার বাবার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। মতিকে রহমতখালী থেকে তাঁদের বাড়ি পৌঁছতে হলে খেয়ায় চন্দা নদী পার হতে হবে। চন্দা নদীর পশ্চিম পাড়ে হচ্ছে রহমতখালী গ্রাম আর পূর্ব পাড়ে জরিনাদের

BanglaBook.org

গ্রাম। ঝড়-বৃষ্টির সময় নদী ভয়ঙ্কর উত্তাল হয়ে ওঠে। খেয়ায় তখন নদী পেরোনো সম্ভব নয়। আর খেয়ায় নদীর মধ্যে থাকলে নির্ঘাত নৌকা উল্টে মরতে হবে।

রাত এগারোটা বেজে যায়। মতির দেখা নেই। ঝড়-বৃষ্টি থামারও কোনও লক্ষণ নেই। জরিনার বাবা দুশ্চিন্তায় ঝিম মেরে যান। ওদিকে ইমাম সাহেব খেতে বসার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি জরিনার বাবাকে বিভিন্ন বয়ান শুনিয়ে খাবার দিতে বলেন।

'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই তিন আল্লার হাতে। আমাগের তাতে কিছুই করার নেই। আফনার মেয়ের লগে যদি মতির বিবাহ লেখাই থাকে তাইলে আজ না হউক আরেকদিন ঠিকই বিবাহ হইবে। আর যদি লেখা না থাকে তাইলে শত চেষ্টায়ও কাম হইবে না। মতির কোনও বিপদ-আপদ হইল কিনা তা-ও তো ভাবছেন? ভাইব্যা কিছুই করতে পারবেন না। তার নসিবে যদি বিবাহের রাইতে নদীতে ডুইব্যা মৃত্যু লেখা থাকে তাইলে তাই হবে। ঝিম মাইরা বইস্যা না থাইক্যা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। খিদায় জান যায়। খাইয়া শুইয়া পড়ি। ঠাণ্ডা পড়ছে–রাইতে ঘুম আরামের হইবে।'

জরিনার বাবা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। খাবারের আয়োজন বেশ ভাল ছিল। পোলাও, ডিমের কোরমা, ইলিশ ভাজা, মুরগীর মাংস, নারকেল-চিংড়ির ঝাল ঝোল, গরুর মাংস ভুনা, মুরগীর চামড়া-পাখনা-গিলা-কলিজা দিয়ে করা মুগ ডালের ঘণ্ট আর শেষ পাতে দই। মতি যদি এসে পৌঁছত তা হলে দইয়ের সঙ্গে মিষ্টিও থাকত। মতির মিষ্টি নিয়ে আসার কথা ছিল।

ভদ্রতার খাতিরে ইমাম সাহেবের সাথে জরিনার বাবাও খেতে বসেন। ইমাম সাহেব গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁকে একা খেতে বসালে সেটা এক ধরনের অভদ্রতাই হবে। তাই প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও জরিনার বাবা খাবার সামনে নিয়ে বসেন। কিন্তু দুশ্চিন্তায় তিনি

BanglaBook.org

কিছু মুখে তুলতে পারেন না। থালার মধ্যে খাবার নাড়াচাড়া করতে থাকেন। ওদিকে ইমাম সাহেব পরম তৃপ্তির সঙ্গে প্রতিটা খাবার গোগ্রাসে গিলতে থাকেন। খেতে-খেতে তিনি একাই পরিবারের সবার জন্য যা রান্না করা হয় তা প্রায় শেষ করে ফেলেন। খাওয়ার মধ্যে বেশ কয়েকবার আয়েশি গলায় বলেন, 'রান্না জব্বর হইছে! অনেকদিন এমন ভাল রান্না খাই নাই। যার হাতের রান্না–ইচ্ছা করে তার হাতে একটা চুমা দিতে!'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ইমাম সাহেব পান মুখে দিয়ে চেহারায় পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে বলেন, 'একটা পাতলা কাঁথা এনে দেন, শুয়ে পড়ি–খুবই ঘুম আইছে। ঝড়-বৃষ্টি তো থামল না, মসজিদে ফিরি ক্যামনে।'

জরিনার বাবা পাতলা কাঁথা এনে দেন। ইমাম সাহেব বসার ঘরের চৌকিতে পাতলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন।

আর জরিনার বাবা বসার ঘরের চেয়ারে ভারাক্রান্ত মুখে ঝিম মেরে বসে থাকেন। মাঝে-মাঝে বিষাদ ভরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে থাকেন। ঘরের ভিতরে শোনা যায় জরিনার মা এবং জরিনার গুনগুন করে করুণ স্বরের কান্নার শব্দ। এসব কিছুই ইমাম সাহেবকে স্পর্শ করে না। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়েও পড়েন। নাক ডাকতে শুরু করেন। যাকে বলে আরামের ঘুম! মৌলভি ধরনের লোকগুলো বোধহয় অনুভূতিশূন্য হয়। আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, কষ্ট কোনও কিছুই এদের ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না।

রাত একটার দিকে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বাইরে শোনা যায় মতির গলার আওয়াজ। প্রথমে জরিনার বাবা চমকে ওঠেন। পরক্ষণে মতি এসেছে বুঝতে পেরে তাঁর চোখ আনন্দে চকচক করতে থাকে। ছুটে গিয়ে দরজা খোলেন।

দরজার সামনে মতি দাঁড়ানো। ভিজে চুপচুপে বিধ্বস্ত অবস্থা

BanglaBook.org

তার। চেহারায় থমথমে ভাব। যেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। জরিনার বাবা মতিকে জড়িয়ে ধরেন।

গভীর ঘুম থেকে ইমাম সাহেবকে জাগিয়ে সেই রাতেই মতির আর জরিনার বিয়ে পড়ানো হয়। ইমাম সাহেব ঘুম জড়ানো ঢুলু-ঢুলু চোখে কোনওক্রমে বিয়েটা পড়িয়ে আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন।

পুবের আকাশ কিছুটা ফর্সা হয়ে উঠেছে। জরিনা ঘুমন্ত স্বামীকে রেখে নদীর দিকে যাচ্ছে গোসল করার জন্য। মতিদের গ্রামে পানির একমাত্র উৎস চন্দা নদী। সবাই এই নদীর পানিই নাওয়া-খাওয়া-রান্না সহ যাবতীয় কাজে ব্যবহার করে। মতির বাড়ি থেকে পুব দিকে বিশ-পঁচিশ মিনিট এগোলেই নদী।

জরিনা এই গ্রামের নতুন বউ। তাই সে গ্রামের অন্যান্য লোকজন জেগে ওঠার আগেই নদী থেকে গোসল সেরে আসতে চায়। গত দু'দিনও এমনটাই করেছে। নতুন বউয়ের শরম-লজ্জার একটা ব্যাপার আছে।

জরিনা নদীতটে পৌঁছে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া গোসলের পর পরার শুকনো কাপড়গুলো উপরে রেখে নদীতে নেমে পড়ল। বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে, পরপর দুই-তিনটা ডুব দিয়ে দুই হাত দিয়ে শরীর ভালভাবে পরিষ্কার করার জন্য ডলতে শুরু করল। হঠাৎ তার থেকে দশ-পনেরো হাত দূরে নদীর তীর ঘেঁষে জন্মানো নলখাগড়া-কচুরিপানা আর ফাঁকা জঙ্গলের ভিতর চোখ আটকে গেল। সেখানে নলখাগড়া আর কচুরিপানার জঙ্গলে সাবেকি আমলের কালো রঙের আবলুস কাঠের একটা ভাসমান বাক্স আটকে রয়েছে। বাক্সটা বড়সড় ট্রাংকের চেয়েও অনেক বড়। উপরটায় পিতলের কারুকাজ করা। পুরানো কোনও সিন্দুক হবার সম্ভাবনাই বেশি। কোথাও থেকে ভেসে-ভেসে এসে বোধহয়

BanglaBook.org

ওখানে আটকেছে।

জরিনার মনে কৌতূহল জাগল–কী আছে ওই বাক্সের ভিতরে? যদি সত্যিই সিন্দুক হয়ে থাকে তাহলে তো ওটার ভিতরে দামি কোনও কিছু থাকার কথা–সোনা-দানা, রত্ন, মণি-মুক্তা...

জরিনা দোটানায় পড়ে গেল। একবার ভাবে বাক্সটাকে উপরে উঠিয়ে খুলে দেখবে কী আছে ওটার ভিতরে। আবার ভাবে অত বড় বাক্স সে কি টেনে উপরে উঠাতে পারবে? এ ছাড়া গ্রামের কেউ নতুন বউকে এমন অবস্থায় দেখে ফেললে কী ভাববে?

বাক্সটার কাছে যাবে কী যাবে না ভাবতে ভাবতে এক সময় জরিনা দেখতে পেল পুবের আকাশে ভোরের কমলা রঙের সূর্যটা সোনালি আভা ছড়িয়ে জেগে উঠছে। সূর্য উঠতে দেখে জরিনা বাক্স উঠানোর কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে তড়িঘড়ি করে গোসল সেরে বাড়ির পথ ধরল। বাড়ি ফিরে বাক্সটার কথা তার স্বামীকে বলবে।

জরিনা বাড়ি ফিরে দেখল, নদীতে গোসল করতে যাবার আগে সে যে তার স্বামীকে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে গেছে–সে এখন বিছানায় নেই। বিছানা খালি। মতি বাড়িতেই নেই। গত দু'দিনও এই একই ব্যাপার ঘটেছে। জরিনা নদী থেকে গোসল সেরে এসে দেখেছে মতি ঘরে নেই। বোধহয় মতি সকাল-সকাল তার দোকান খুলতে চলে যায়। চা-পান-সিগারেটের দোকান, সকালেই বোধহয় বেশি ভাল চলে। কারণ বেশির ভাগ লোকেরই সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস। আর চায়ের সাথে দোদারসে পান-সিগারেটও। মতি দুপুরেও খেতে বাড়ি আসে না। ফেরে একেবারে রাতে।

পরের দিন।

গত তিন দিনের মত ফজরের আযানের পর বাইরে কিছুটা

BanglaBook.org

ফর্সা হতেই জরিনা তার ঘুমন্ত স্বামীকে রেখে নদীতে গোসল করতে এল। গত দিনের মত বুক সমান পানিতে নেমেই তার চোখ পড়ল সেই ভাসমান কাঠের কালো বাক্সটার উপরে। বাক্সটা গতকালের মত সেই একই জায়গায় নলখাগড়া আর কচুরিপানার জঙ্গলে আটকে রয়েছে।

জরিনার বিস্ময়ের সীমা রইল না। একটা পুরো দিন চলে গেল অথচ বাক্সটা গ্রামের অন্য কারও চোখে পড়ল না! সে-ও বাক্সটার কথা ভুলে গিয়েছিল। রাতে তার স্বামী বাড়ি ফেরার পর স্বামীকে জানাতে মোটেই খেয়াল ছিল না।

বাক্সটা জরিনা নিজেই টেনে এনে খুলে দেখবে কি দেখবে না–গতকালের মত একই দোটানায় পড়ে ক্রমাগত ভাবতে-ভাবতে সে গোসল সেরে ফেলল। গোসল সেরে উঠে দ্রুত পা ফেলে বাড়ি ফিরতে লাগল, তার স্বামী যাতে বাড়ি থেকে বের হবার আগেই বাড়ি ফিরে বাক্সটার কথা তাকে জানাতে পারে।

জরিনা বাড়ি ফিরে দেখল, গত তিন দিনের মত তার ফেরার আগেই তার স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

তার পরের দিন।

জরিনা রোজকার মত ফজরের আযানের পর নদীতে গোসল করতে এল। আজও নদীতটে দাঁড়িয়েই তার চোখ পড়ে সেই পুরানো কালো কাঠের সিন্দুকের মত ভাসমান বাক্সটার উপর। বাক্সটা আজও নদীর একই জায়গায় আটকে রয়েছে। ভাগ্য ভাল দুটো দিন কেটে গেছে, কারও চোখেই পড়েনি। জরিনার গত রাতেও বাক্সটার কথা তার স্বামীকে জানাতে খেয়াল ছিল না।

আজ আর জরিনা কোনও ভুল করবে না। এখনই সে গিয়ে তার স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ডেকে আনবে।

জরিনা ছুটতে-ছুটতে বাড়ি ফিরে তার ঘুমন্ত স্বামীকে জাগিয়ে

BanglaBook.org

বাক্সটার কথা জানাল। এরপর সময় নষ্ট না করে অতি দ্রুত স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আবার নদীর পাড়ে ফিরে এল। আঙুল তুলে তার স্বামী মতিকে বাক্সটা দেখাল। মতিও বাক্সটা দেখার পর জরিনার মত কৌতূহলী হয়ে উঠল। ফিসফিস করে উত্তেজিত গলায় জরিনাকে বলল, 'নিশ্চয়ই পুরানো কোনও সিন্দুক। ভিতরে মনে অয় অনেক ধন-রত্ন আছে! আমাগো ভাগ্যেই আছে বইল্যা দুই দিনেও অন্য কারও চোখে পড়ে নাই।'

সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। তার ওপর আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে বলে চারপাশটা বেশ অন্ধকার-অন্ধকার। মতি লুঙ্গি মালকোঁচা দিয়ে নদীতে নেমে পড়ল। সে বাক্সটাকে টেনে-টেনে পাড়ের দিকে আনতে লাগল। বাক্সটা খুবই ভারী। টেনে আনতে তার অনেক কসরত হচ্ছে।

এক পর্যায়ে মতি বাক্সটা নদী থেকে উপরে তুলে ফেলল। শেষ মুহূর্তে জরিনাও মতির সঙ্গে হাত লাগাল। এবারে খোলার পালা। মতি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'বউ, তুমিই বাক্সটা খোলো। তোমার ভাগ্যেই তো এটারে পাইছি। তুমি না দেখলে তো অন্য কেউ পাইয়া যাইত।'

জরিনা বাক্সটা খুলতে লেগে পড়ল। বাক্সের ওপরে ডালাটা ট্রাংকের মত আলতারাফ দিয়ে আটকানো। তবে কোনও তালা ঝোলানো নেই। জরিনা অতি সহজে আলতারাফ তুলে ডালাটা খুলে ফেলল।

ডালাটা খুলতেই প্রচণ্ড মরা-পচা দুর্গন্ধ ভক করে ধাক্কা মারল জরিনার নাকে। সেই সঙ্গে বাক্সের ভিতরে সে দেখতে পেল অর্ধগলিত একটা লাশ। ভয়ার্ত গলায় প্রচণ্ড একটা চিৎকার দিয়ে সে ছিটকে বাক্সটা থেকে দূরে সরে গেল। এরপর ভয়ে-বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। তার ভয়ার্ত চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ দিয়ে গোঙানির মত এক জাতীয়

BanglaBook.org

শব্দ করতে-করতে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে আতঙ্কিত আর বিস্মিত জরিনা আরও কিছুটা পিছু সরে গেল।

জরিনার বিস্ময়ের কারণ—অর্ধগলিত লাশটার চেহারা হুবহু তার স্বামীর মত! তার স্বামী যেন একই সাথে বাক্সের ভিতরে লাশ হয়ে পড়ে রয়েছে আবার জলজ্যান্ত তার পাশে দাঁড়ানো।

ভয়ে-আতঙ্কে জমে যাওয়া জরিনা কোনওক্রমে মাথা তুলে তার পাশে দাঁড়ানো স্বামীর দিকে তাকাল। তার স্বামী তার ভীত-আতঙ্কিত চাহনি দেখে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ভয়ঙ্কর জান্তব গা শিউরানো বিকট হাসি। মেঘলা অন্ধকারাচ্ছন্ন থমথমে খাঁ-খাঁ পরিবেশে হাসিরত অস্পষ্ট সেই মুখটা দেখে জরিনা বুঝে গেল, ওই মানুষটা তার স্বামী নয়! ওটা কোনও মানুষই নয়! অন্য কিছু!!!

এক পর্যায়ে জরিনা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সেদিনের পর থেকে জরিনা সবার কাছে জরিনা পাগলি নামে পরিচিত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শুকনো গোলাপ

বরযাত্রী হয়ে বন্ধুর বিয়েতে যাচ্ছি। আমার তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। অবশ্য আমার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই-ও। অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু কারও সঙ্গেই সম্পর্কটা ততটা গাঢ় নয়। কোনও এক অদ্ভুত কারণে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউই আমাকে তেমন একটা পছন্দ করে না। গুরুত্বও দেয় না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনদের কারও বিয়ে-জন্মদিন বা এধরনের কোনও অনুষ্ঠানে আমি সাধারণত নিমন্ত্রণ পাই না। মাঝে-মাঝে ভাগ্যক্রমে দু'-একটা দাওয়াত মিলে যায়। তা-ও এভাবে, দেখা যায় কোনও একজনকে দাওয়াত দিচ্ছে, ঘটনাচক্রে আমি সেখানে উপস্থিত—তখন আমাকেও বলে, 'তুইও আসিস।'

বন্ধু মাহফুজের বিয়েতে কীভাবে যেন বিয়ের কার্ডসহ নিমন্ত্রণ মিলে গেল। তাই খুব খুশি মনে বরযাত্রী হয়ে বিয়েতে যাচ্ছি।

কনের বাড়ি হাবিবপুর গ্রামে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। বরযাত্রীদের যাওয়ার জন্য দশটা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। আর বরের জন্য ফুল দিয়ে সাজানো আলাদা প্রাইভেট কার।

হইচই করে সবাই মাইক্রোতে উঠে পড়ছে। বরের বন্ধুদের জন্য দুটো মাইক্রো, বরের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দুটো, বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য দুটো, মহিলাদের জন্য দুটো আর বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বিদের জন্য দুটো—এভাবে বরাদ্দ।

BanglaBook.org

বন্ধুদের জন্য বরাদ্দ দুটো মাইক্রোবাসের একটায়ও আমি খালি সিট পেলাম না। কেউ একজন বলল, পিছনের মাইক্রোতে খালি সিট আছে। পিছনে এক-এক করে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বরাদ্দ, বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ—কোনও মাইক্রোতেই আমার সিট মিলল না। আর মহিলাদের জন্য বরাদ্দ মাইক্রোতে সিট খুঁজতে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। ভাবলাম আমার বোধহয় যাওয়া হচ্ছে না। এমন সময় একেবারে পিছনের মুরব্বিদের জন্য বরাদ্দ সবচেয়ে লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা মাইক্রোটা থেকে কেউ একজন হাত তুলে আমাকে ডেকে বলল, 'এই মাইক্রোতে একটা খালি সিট আছে।'

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই মাইক্রোতে গিয়ে উঠে বসলাম। আমার পাশে হাস্যমুখ এক মুরব্বি। তাঁর মুখে পান। তিনি পান চিবোচ্ছেন আর অন্যান্যদের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত গলায় গল্প করছেন। তাঁর ঠোঁট বেয়ে রক্তের মত লাল পানের রস নামছে। মাঝে-মাঝে হাতের চেটো দিয়ে গড়িয়ে নামা পানের রস মুছে নিচ্ছেন। গা থেকে ভুরভুর করে বেরুচ্ছে জর্দার কড়া গন্ধ। সেই গন্ধে কেমন মাথা ঝিম-ঝিম করছে।

এক সময় বরযাত্রীদের গাড়িবহর চলতে শুরু করল। সামনে-সামনে বাইকে চড়া দুই যুবক ক্যামেরা দিয়ে চলন্ত গাড়িবহর ভিডিও করছে। একজন মোটর বাইকটা ধীরে-ধীরে চালাচ্ছে, অন্যজন পিছনে ঘুরে ভিডিওর কাজটা করছে। বোধহয় ভিডিওর দোকানের ভাড়া করা লোক। না হলে এমন চলন্ত অবস্থায় ভিডিও করা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

কিছুদূর যেতেই আবার গাড়িবহর থেমে গেল। দেখলাম সবার সামনে বরের গাড়ি থেকে বর নিজেই বেরিয়ে ভিডিও করারত দুই যুবককে ধমকাচ্ছে, 'ভিডিও করার কাজ কোথায় শিখছিস? তোদের ওস্তাদ কে, নাম বল? হারামজাদাকে ধরে এনে,

BanglaBook.org

হারামজাদার প্যান্ট খুলে নেংটা করে পাছায় কুত্তা দিয়ে কামড় খাওয়াব। বিয়ের বরকে বাদ দিয়ে অন্যদের ভিডিও করিস, বোকা কোথাকার!...সারাক্ষণ আমার দিকেই ক্যামেরা তাক করে রাখবি। নইলে জনমের মত তোদের ভিডিও করা শেখাব।'

ধমকাধমকি করে বিয়ের বর মাহফুজ আবার গাড়িতে উঠে বসল। মাহফুজ চিরকালই বদমেজাজি, রুক্ষ স্বভাবের। ইদানীং আবার বায়িং হাউজে চাকরির সুবাদে প্রচুর টাকা-পয়সা কামিয়েছে। অবশ্য বায়িং হাউজটাকে লোপাট করে। তাই টাকার গরমে মেজাজও বোধহয় আগের চেয়ে আরও চড়া হয়েছে। না হলে বিয়ের বর হয়ে ভিডিওর লোকদের অমন কুৎসিতভাবে গালি-গালাজ করতে পারত না।

আবার গাড়িবহর চলতে শুরু করেছে। গাড়ি চলা শুরু হবার পর থেকে দেখছি আমার পাশের মুরব্বি আগের চেয়েও দ্বিগুণ উৎসাহে গল্প বলছেন। সবই তাঁর বিভিন্ন বিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার অভিজ্ঞতা। কোথায় খাওয়া-দাওয়া বেশি ভাল হয়েছিল, কোথায় তিনি বত্রিশটা রোস্ট খেয়ে রেকর্ড করেছিলেন, কোথায় এক হাঁড়ি রসগোল্লা একাই সাবড়েছিলেন–এই সব। অনর্গল কথা বলায় তাঁর মুখ দিয়ে পানের রস ছিটকে-ছিটকে বেরুচ্ছে। তিনি জানালার পাশে বসায় বাতাসে উড়ে সেই রস এসে পড়ছে আমার গায়ে। আমার সাদা শার্টে লাল-লাল, ফোঁটা-ফোঁটা দাগ পড়ে যাচ্ছে।

কনের বাড়ি পৌঁছবার পর দেখি আমার সাদা শার্ট পানের রসের ছিটায় মোটামুটি ভিন্নধর্মী নতুন ডিজাইন নিয়েছে। মাইক্রোবাস থেকে নেমে রুমাল দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে সবার সঙ্গে এগোতে লাগলাম।

বরযাত্রীরা কনের বাড়ির রঙিন কাপড়ে পেঁচানো সুসজ্জিত বিশাল প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকছি। দু'পাশে কনের বাড়ির অল্প

BanglaBook.org

বয়েসী মেয়েরা আমাদের গায়ে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

ভিতরে ঢোকার পর বাড়ির উঠানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শামিয়ানা খাটানো। শামিয়ানার নীচে সারি-সারি চেয়ার-টেবিল সাজানো। টেবিলের উপর পানি ভর্তি কাচের জগ আর উপুড় করা ঝকঝকে প্লেট-গ্লাস। এক কোনায় বর-কনের স্টেজ। বরযাত্রীরা এক-এক করে চেয়ার দখল করে বসতে লাগল। আর বরকে নিয়ে যাওয়া হলো বর-কনের স্টেজে। সঙ্গে বরের বন্ধুরাও গিয়ে পাশে বসল। আমিও তো বরের বন্ধু, কিন্তু আমি জানি বরের পাশে বসার সুযোগ আমার হবে না। সামনের টেবিলে একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়লাম। বসেই দেখি পাশের চেয়ারে মাইক্রোতে আসার সময় যে মুরব্বির পাশে বসে এসেছি তিনি।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কনেকে এনে বরের পাশে বসিয়ে বিয়ে পড়ানোর কাজ সম্পন্ন হলো। কনের সঙ্গে কনের বান্ধবীরাও এসেছে। তাদের সঙ্গে বন্ধুরা দেখছি বিভিন্ন ঠাট্টা-মস্করা করছে।

বিয়ে পড়ানোর পরপরই টেবিলে-টেবিলে খাবার দেয়া শুরু হলো। পোলাও, টিকিয়া, রোস্ট, জলপাইয়ের আচার, মাছের কালিয়া, খাসির রেজালা, সালাদ, বোরহানি, গরুর মাংস ভুনা, মুগ ডালের ঘণ্ট, দই-মিষ্টি আর সব শেষে পান। পান দেখেই আমার পাশের মুরব্বি ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-খিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরলেন। আমারও খাওয়া শেষ পর্যায়ে। দেরি না করে সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়লাম। না হলে মুরব্বি হয়তো আমার সাদা শার্টের চেহারা আরও পাল্টে দেবেন।

জম্পেশ খাওয়া হয়েছে। খেয়ে ওঠার পর খুব গরম লাগছে। গরমে একেবারে হাঁসফাঁস ভাব। শামিয়ানার ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। শামিয়ানার পিছন দিকটায়। কিছুটা এগোতেই ফাঁকা-ফাঁকা ভাবে বেড়ে ওঠা বড়-বড় গাছ-গাছালিতে ভরা একটা

BanglaBook.org

বাগান।

বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। যতই সামনে এগোচ্ছি বিয়ে বাড়ির হই-হট্টগোলের শব্দ ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে। হই-হট্টগোল, ঝুট-ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। ছোটবেলা থেকেই এই অভ্যাস। আমাদের বাড়ি শহরতলির খুব নিরিবিলি এক জায়গায়। টিনশেড একতলা বিল্ডিং। বাড়িতে শুধু আমি আর আমার মা থাকি। আমি আমার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মা অসুস্থ, জরাগ্রস্ত। আমাদের বাড়ির রান্না-বান্না, সাংসারিক বিভিন্ন কাজ রহিমা নামে একটা ছুটা কাজের বুয়া করে দিয়ে যায়। আমি একটা বেসরকারি ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার। যা বেতন পাই তাতে আমাদের খেয়ে-পরে ভালই চলে যায়। অনেকদিন ধরে মা আমাকে বিয়ে করাতে চাইছে। কিন্তু আমি মত দিচ্ছি না। প্রমোশনের অপেক্ষা করছি। এখন যা বেতন পাই তাতে বিয়ে করতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

বাগানের শেষ মাথায় পৌঁছে তাজ্জব হয়ে গেলাম। সামনে ছায়াময় বিশাল এক দিঘি। দিঘির চার পাড় জুড়ে সারি-সারি নারকেল-সুপারিসহ বিভিন্ন বড়-বড় গাছ। দিঘিটা এতই বড় যে এপাড় থেকে ওপাড় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। অস্পষ্টভাবে হলেও দেখতে পাচ্ছি দিঘির অপর পাড়ে একটা বাঁধানো চওড়া ঘাটলা। ঘাটলার পাশ ঘেঁষেই বিশাল এক ঝাঁকড়া বট গাছ। ঘাটলায় বট গাছের ছায়া। মনে লোভ জাগল ওই ঘাটলায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসার।

দিঘির পাড় ধরে ঘাটলার উদ্দেশে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে-হাঁটতে এক সময় ঘাটলায় পৌঁছে গেলাম। ঘাটলার সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসলাম। মনটা অদ্ভুত এক ভাল লাগার অনুভূতিতে ছেয়ে গেল। দিঘির পানিতে ঢেউ তুলে প্রবল হাওয়া বইছে। চারদিকে খাঁ-খাঁ শূন্যতা। মাথার উপরে বট গাছের ডালে-ডালে দু'-একটা

BanglaBook.org

পাখি কিচির-মিচির করে ডাকছে। আকাশে একটা চিল উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া তুলোর মত সাদা মেঘ। দিঘির জলে সেই আকাশের প্রতিচ্ছায়া। হঠাৎ একটা খুবই মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠে চমকে উঠলাম।

'আপনি এখানে একা-একা বসে আছেন?'

ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি, আমার থেকে কয়েক হাত দূরে বেগুনি রঙের শাড়ি পরা পরীর মত রূপবতী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা শান্ত, কোমল, নিষ্পাপ। চোখ দুটো টানা-টানা, মায়াকাড়া। সেই চোখে বড়-বড় আঁখি পল্লব। বাঁশির মত নাক। ভেজা-ভেজা নরম পেলব ঠোঁট। গায়ের রং দুধে-আলতা। মাথা ভর্তি মেঘ কালো দীঘল চুল। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে।

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। বুকে শিহরন তোলা এমন রূপবতী এখানে এল কোত্থেকে?!

আমাকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা আবার বলল, 'বিয়ে বাড়িতে কত মজা হচ্ছে, আপনি এখানে একা-একা বসে আছেন! আপনার বন্ধুরা দেখি কনের বান্ধবীদের সঙ্গে জরি মাখামাখি করছে।'

আমি বসে-যাওয়া গলায় কোনওক্রমে বললাম, 'আপনি কি কনে পক্ষের কেউ?'

সে বলল, 'না, আমি কনে পক্ষের কেউ নই। ওই বিয়ে বাড়িরই কেউ নই।'

বলতে-বলতে আমার পাশে এসে বসল। তবে বেশ খানিকটা তফাতে।

তার গা থেকে খুবই মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছি। কোনও ফুলের গন্ধ। ধরতে পারছি না কী ফুলের গন্ধ।

সে আবার বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আপনি একা-একা

BanglaBook.org

ঘুরছেন। তাই আপনার জন্য মায়া লাগল।'

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। সে পাশে এসে বসায় খুব নার্ভাস লাগছে। জড়তা কাটাতে কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলাম।

'আচ্ছা, আপনার শার্টে রক্তের মত ছিটা-ছিটা এ কীসের দাগ?'

আমি বললাম, 'পানের রসের দাগ।'

'আপনি পান খান?!'

'না। আসার পথে এক মুরব্বির পাশে বসেছিলাম, তিনিই এই অবস্থা করেছেন।'

আমার কথা শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম। কারও হাসি যে এত সুন্দর হতে পারে তা আমার কল্পনায়ও ছিল না!

বাতাসে তার মুখের উপর উড়ে এসে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরাতে-সরাতে বলল, 'আপনার নাম কী?'

'আমার নাম মিলন। পুরো নাম সামদাদ হোসেন মিলন।'

'আমার নাম তোড়া। মানে ফুলের তোড়া।'

বলেই খিল-খিল করে হেসে উঠল। কেন হাসল বুঝলাম না। আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'ও, আচ্ছা। খুব সুন্দর নাম তো!'

তোড়া দিঘির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি জানেন এই দিঘিটা কত পুরানো?'

আমি বললাম, 'না তো।'

'এই দিঘিটা দেড়শো বছরের পুরানো।'

'তাই নাকি!!'

'দেড়শো বছর আগে মুজাহার আলী খান নামে এক জমিদারের মহল ছিল এখানে। তিনিই এই দিঘিটা কাটিয়েছিলেন, তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য। তাঁর মেয়ের খুব শখ ছিল সাঁতার কেটে গোসল করার। এই ঘাটলাটাও সেই আমলের বানানো।

BanglaBook.org

এই ঘাটলায় বসেই জমিদারকন্যা তার সখীদের নিয়ে হই-হল্লা করে গোসল করত। একদিন এই দিঘিতে ডুবেই জমিদারকন্যার মৃত্যু হয়। আজ সময়ের স্রোতে জমিদারমহলের সব চিহ্নই ধুয়ে-মুছে গেছে। শুধু দিঘিটা আর দিঘির বাঁধানো ঘাটলাটা রয়ে গেছে।'

আমি উদাস হয়ে বললাম, 'আসলে জগতের সবকিছুরই সৃষ্টি একদিন হারিয়ে যাবার জন্য।'

তোড়া বলল, 'আমিও এখন হারিয়ে যাব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মানে!'

'মানে, আমি এখন চলে যাব।'

তার চলে যাবার কথা শুনে আমার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। এতক্ষণ যেন সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম! ভর দুপুরে নির্জন দিঘির ঘাটলায় এমন রূপবতী কাউকে পাশে নিয়ে গল্প করা স্বপ্ন ছাড়া আর কী!

তোড়া বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি বলে আপনার কি খুব মন খারাপ লাগছে?'

আমি জবাব না দিয়ে তার চোখের দিকে তাকালাম। চোখে চোখ পড়ল। সে-ও গাঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

নীরবতা ভেঙে সে বলল, 'যাওয়ার আগে আপনাকে একটা উপহার দিয়ে যেতে চাচ্ছি।'

এতক্ষণ লক্ষ করিনি–তার হাতের মুঠোয় কী যেন লুকানো ছিল। সে হাতের মুঠো খুলল। দেখতে পেলাম শুকিয়ে দরকচা মারা কালচে রঙ ধারণ করা একটা ফুল।

শুকনো ফুলটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নিন, এই শুকনো গোলাপটা আপনাকে দিচ্ছি। আপনার মত আমিও খুব নিঃসঙ্গ একজন! বহু বছর ধরে এই গোলাপটা হাতে নিয়ে ঘুরছি কাউকে দেবার জন্য। দেবার মত কাউকে পাইনি। আজ

BanglaBook.org

আপনাকে দিচ্ছি। আপনার যদি আবার আমার দেখা পেতে ইচ্ছে করে তা হলে এই শুকনো গোলাপটা রাতে ঘুমানোর আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন গোলাপটা একেবারে তরতাজা টাটকা রূপ নিয়েছে। গোলাপটা পকেটে নিয়ে বাসা থেকে বেরোবেন। সেদিন কোথাও না কোথাও আমার দেখা পাবেন।'

আমি শুকনো ফুলটা হাতে নিলাম। ফুলটা আমার হাতে দিয়েই সে উঠে পড়ল। মুখে বলল, 'আচ্ছা, আসি তা হলে।'

পিছন থেকে আমি তার চলে-যাওয়া দেখছি। একবারও আর সে পিছন ফিরে তাকাল না। কিছুদূর যেতেই বন-জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সে চোখের আড়াল হবার পর শুকনো ফুলটার দিকে তাকিয়ে ভাবনায় পড়লাম, সত্যিই কি এই ফুল পানিতে ভিজিয়ে রাখলে তরতাজা হয়ে উঠবে?! সেই ফুল পকেটে নিয়ে বাসা থেকে বের হলে তার দেখা পাব?! এমনটা কোনও দিনও হয় নাকি?! নিশ্চয়ই কনে পক্ষের কোনও মেয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে গেছে।

ফেরার পথেও মাইক্রোবাসে আমার সিট মিলল সেই পান খাওয়া মুরব্বির পাশে। এবারে মুরব্বি বোধহয় আমায় পানের রসে নাইয়ে দিতে চাইছেন। আমি নির্বিকার। কোনও কিছুই আমাকে স্পর্শ করছে না। আমি বিভোর হয়ে ভাবছি তোড়ার কথা। আমার চোখের সামনে শুধুই ভেসে উঠছে তার অপরূপ সুন্দর মুখখানা। জানি সে আমার সাথে স্রেফ মজা করে গেছে। কিন্তু কিছুতেই আমি তাকে মন থেকে মুছতে পারছি না। আমাকে বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে তার দেয়া শুকনো গোলাপটা আমার শার্টের বুক পকেটে রয়েছে। বার-বার পকেটের উপর হাত বুলিয়ে সতর্ক থাকছি কিছুতেই যেন এই ফুলটা হারিয়ে না ফেলি। এটা আমি

BanglaBook.org

সারাজীবন সযত্নে আমার কাছে রেখে দিতে চাই।

বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে গতরাতে এক ফোঁটা ঘুম হয়নি আমার। সারারাত কেটে যায় তোড়ার কথা ভেবে অজানা এক অস্থিরতায়। বুকের ভিতর অদ্ভুত এক ব্যাকুলতায় তোলপাড় হতে থাকে। বার-বার বিছানা থেকে উঠে শুকনো গোলাপটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে থেকেছি। চোখ বন্ধ করে নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকেছি। মনে হয়েছে এই শুকনো ফুলটার মধ্যেই যেন তোড়া রয়েছে। তার স্পর্শ রয়েছে, তার গায়ের গন্ধ রয়েছে, তার ভালবাসা রয়েছে!

সারা দিন অফিসেও একটুও মন বসাতে পারিনি। সারাক্ষণ ঘুরেফিরে শুধু তার কথা মনে পড়েছে। সে আমায় কী জাদু করল জানি না!

আজ রাতেও ঘুমাতে এসে গতরাতের মত সেই একই অবস্থা। কিছুতেই দু-চোখের পাতা এক করতে পারছি না। একটু পর-পর উঠে শুকনো গোলাপটা দেখছি। গন্ধ শুঁকছি। বুকের সঙ্গে চেপে ধরছি।

জানি, তোড়া আমাকে রাতে ঘুমাবার আগে শুকনো ফুলটাকে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে বলেছে শুধুমাত্র বোকা বানাবার জন্য। কিন্তু কী মনে করে যেন শেষ পর্যন্ত আমি তাই করলাম। বেড সাইড টেবিলের উপর থাকা পিরিচ দিয়ে ঢাকা গ্লাসের পানিতে ফুলটাকে ভিজিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাতে কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। সকালে অ্যালার্ম-ঘড়ির শব্দে ঘুম ভাঙল। এত জলদি সকাল হয়ে গেল! চোখ বন্ধ অবস্থায়ই হাতড়ে বেড সাইড টেবিলের উপর থাকা অ্যালার্ম-ঘড়িটার অ্যালার্ম বন্ধ করতে গিয়ে পানির গ্লাসটা কাত করে ফেললাম। সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। বেড সাইড টেবিলের উপর

BanglaBook.org

মোবাইল ফোন, হাত ঘড়িটাও রয়েছে। পানিতে ভিজলে ওগুলোর সর্বনাশ হবে।

আশ্চর্য! এ কী দেখছি! বেড সাইড টেবিলের উপর কাত হওয়া গ্লাসের সামনে পড়ে আছে যেন একেবারে সদ্য ফোটা তরতাজা টকটকে লাল একটা গোলাপ! এটাই যে সেই শুকনো গোলাপটা বুঝতে দেরি হলো না। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে চোখ কচলে নিলাম। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না তো!

মন্ত্রমুগ্ধের মত ফুলটা হাতে নিলাম। কী মিষ্টি সুবাস। এমন সুবাসই তোড়ার গা থেকে পেয়েছিলাম।

তোড়া বলেছিল ফুলটা পকেটে নিয়ে বাসা থেকে বেরোলে তার দেখা পাব। তাই করেছি। ফুলটা পকেটে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়েছি।

এই ফুলটার এতই ঘ্রাণ যে, পারফিউম না মাখা সত্ত্বেও অফিসের বেশ কয়েকজন কলিগ জিজ্ঞেস করেছে, গায়ে কী পারফিউম মেখেছি। গা থেকে খুব সুন্দর গন্ধ পাচ্ছে।

আমার মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সত্যিই কি আজ তোড়ার দেখা পাব! তোড়া যা বলেছে তা সত্যি ছিল! নাকি এই ফুলে এমন কোনও কেমিকেল দেয়া ছিল যার কারণে ভিজিয়ে রাখার পর তরতাজা হয়ে উঠেছে? সবই আমাকে বোকা বানাবার জন্য।

সারা দিন উত্তেজনা আর অস্থিরতা চাপা দিয়ে কোনওক্রমে অফিস করেছি। অফিস ছুটি হয়েছে। অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়েছি। নাহ, তোড়ার দেখা মেলেনি। দেখা পাওয়ার কথাও নয়। তোড়া যা বলেছে তা কোনও দিনও সত্যি হবার নয়। সে আমাকে সত্যি-সত্যিই বোকা বানাল।

বিমর্ষ মুখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বাসায় ফেরার জন্য রিকশা খুঁজছি। এমন সময় পিছন থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 'কী, আমার কথা বিশ্বাস হলো না!'

BanglaBook.org

তোড়ার কণ্ঠস্বর! চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি তোড়া দাঁড়িয়ে। তার পরনে আজ লাল শাড়ি। আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। তোতলাতে-তোতলাতে কোনওক্রমে বললাম, 'সত্যিই আপনি এসেছেন!'

সে ভুবন ভুলানো হাসি দিয়ে বলল, 'কেন, জলজ্যান্ত আমাকে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না?'

আমার ইচ্ছে করছে তাকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমতা-আমতা করে বললাম, 'না, মানে, ভেবেছিলাম—আপনি আমাকে সেদিন স্রেফ বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে শুকনো গোলাপটা হাতে দিয়ে ওসব কথা বলেছিলেন।'

'এখন বিশ্বাস হলো তো? আর কখনও আমাকে অবিশ্বাস করবেন না। তা হলে কিন্তু কোনও দিনও আর আমাকে পাবেন না।'

কাছেরই একটা পার্কে গিয়ে বসে সন্ধ্যা হবার আগ পর্যন্ত আমরা গল্প করে কাটালাম। সন্ধ্যা হবার পর আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সে চলে গেল। আমিও বাড়ির পথ ধরলাম। যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আবার কবে দেখা হবে। সে বলে, 'আপনি যেদিন চাইবেন, সেদিনই দেখা হবে।'

বাসায় ফিরে দেখি পকেটের ভিতর গোলাপটা আবার সেই আগের মত শুকিয়ে দরকচা মেরে কালচে হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে যাওয়ার আগে বলে-যাওয়া "আপনি যেদিন চাইবেন, সেদিনই দেখা হবে!" কথাটার মানে ধরে ফেললাম। এর মানে রাতে ঘুমাবার আগে এই শুকনো গোলাপটাকে ভিজিয়ে রাখলে এটা আবার তরতাজা হয়ে উঠবে। আর সকালে তরতাজা গোলাপটাকে পকেটে নিয়ে বেরোলে তার দেখা পাব।

BanglaBook.org

এরপর থেকে প্রতি রাতেই শুকনো গোলাপটাকে ভিজিয়ে রাখি।

প্রতি সকালেই তরতাজা গোলাপ পকেটে নিয়ে বেরোই। আর প্রতিদিনই তোড়ার দেখা পাই। কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যায়।

অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে। আমার আর তোড়ার সম্পর্ক এখন বন্ধুর মত ঘনিষ্ঠ আর সহজ-সাবলীল। আমরা একে অপরকে আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে নেমে এসেছি। অনেক কথা হয় দু'জনার মাঝে। তবে এখনও আমি আমার মনের কথাটা তাকে জানাতে পারিনি! বলতে পারিনি যে আমি তাকে ভালবাসি! নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি! সে-ও কিছু বলেনি। অবশ্য আগ বাড়িয়ে মেয়েরা কখনও বলেও না। ছেলেদেরই প্রথমে বলতে হয়। আমি চিরকালই মুখচোরা, লাজুক স্বভাবের। তাই সরাসরি 'ভালবাসি' কথাটা বলতে ঠিক সাহসে কুলাচ্ছে না।

পার্কের এক নির্জন জায়গায় তোড়া আর আমি বসে আছি। আমরা খোসা ভেঙে-ভেঙে বাদাম খাচ্ছি আর গল্প করছি। আগেই ঠিক করে রেখেছি, আজ আমি আমার ভালবাসার কথা তাকে জানাবই। কথাবার্তার এক পর্যায়ে বুকে সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেললাম, 'তোড়া, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

বলতে চেয়েছিলাম, তোড়া, আমি তোমাকে ভালবাসি! খুব ভালবাসি! খুউব! কিন্তু সেটা কিছুতেই বলতে পারলাম না। মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল বিয়ের কথা।

তোড়া থমকে চুপ করে রইল। আমার চোখের দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল। আমি চোখ নামিয়ে ফেলে মিনমিন করে বললাম, 'তোমাদের বাড়ির ঠিকানাটা দাও। আমার আব্বাকে, তোমার বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠাব।'

এবারও তোড়া চুপ করে রইল। তার চোখ দুটো টলমল

BanglaBook.org

করছে। কিছুক্ষণ বাদে ধরা গলায় বলল, 'এই কথাটা বলতে তোমার এত দেরি হলো কেন?!' আবার কিছুটা সময় নিয়ে হাতের চেটো দিয়ে আলতোভাবে চোখ মুছে বলল, 'তবে আমাকে পেতে হলে তোমাকে আমার একটা শর্ত মানতে হবে। এবং বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী সেই শর্ত?! আর অপেক্ষা করতে হবে কেন?!'

তোড়া বলতে লাগল, 'শর্তটা হচ্ছে তুমি আর কোনও দিনও আমার পরিচয়, আমার বাড়ি কোথায়, আমার বাবা-মা-পরিবার এসব সম্পর্কে জানতে চাইবে না। অপেক্ষা করতে হবে এই জন্যে, বিয়ে করতে হলে শুকনো গোলাপটাকে পানিতে ভিজিয়ে তরতাজা করে রোজ-রোজ আর দেখা করতে পারবে না। শুকনো গোলাপটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাছের বীজ যেভাবে মাটিতে পোঁতা হয় সেভাবে। কিছুদিন পর দেখবে সেখান থেকে একটা চারা গাছ গজিয়ে উঠবে। সেই গোলাপ গাছটায় একদিন ফুল ফুটবে। যেদিন ফুলটা ফুটবে সেদিন আমি চিরদিনের জন্য তোমার কাছে চলে আসব। আমরা বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করব। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে কিছুতেই আমাকে পাবে না।'

আমি তোড়ার শর্ত মেনে নিই। আমাদের পরিচয়ের শুরু থেকেই লক্ষ করেছি–তোড়া ওর পরিচয়, ওর বাড়ি কোথায়, বাবা-মা-পরিবার সম্পর্কে কখনও কিছু বলে না। জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে যায়। আমার ওর সম্পর্কে কিছু জানার দরকারও নেই। শুধু ওকে পেতে চাই। ওকে পেলেই জীবন ধন্য হবে।

তোড়ার নির্দেশ মত শুকনো গোলাপটা বারান্দার একটা টবের মাটিতে পুঁতে দিই। সত্যি-সত্যিই কিছুদিন পর সেই টবে একটা চারা গোলাপ গাছ জন্ম নেয়। ধীরে-ধীরে গোলাপ গাছটা বড় হয়ে

BanglaBook.org

ওঠে। তবে এরই মধ্যে প্রায় বছরখানিক কেটে গেছে। এই এক বছরে আর তোড়ার সঙ্গে দেখা হয়নি। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার! নিজেকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত রাখছি, ফুল ফুটলেই তো তাকে চিরদিনের জন্য পেয়ে যাব! আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা!

যতক্ষণ বাসায় থাকি গোলাপ গাছটার পাশে বসেই সময় কাটে আমার। গভীর রাতেও গাছটার পাশে এসে বসে থাকি। গাছটার দিকে চেয়ে-চেয়ে অপেক্ষা করি কখন ফুলের কুঁড়ি ধরবে। আর পারছি না আমি! আর একটা মুহূর্তও তাকে ছাড়া থাকতে ইচ্ছে করছে না!! কিন্তু কী করব আমি? অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার নেই আমার!

একদিন আমাদের কাজের বুয়া রহিমা, ঘর মোছা পানি গোলাপ গাছটার টবে ঢেলে দেয়। তাই দেখে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ি আমি। রাগে দিশা হারিয়ে রহিমাকে খুব গালি-গালাজ করি। রহিমাও চটে গিয়ে বিড়বিড় করতে থাকে, 'কী আছে ওই গোলাব গাছটার মইধ্যে আল্লা-মাবুদই জানে! হারাক্ষণ গাছটার দিহেই চাইয়া থাহে...ভালার লাইগা গাছের গোড়ায় পানি দিলাম, হ্যাতে ওনার গায়ে যেন ফোস্কা পড়ছে...'

আমি কী করে রহিমাকে বোঝাব, ওই গোলাপ গাছটার মাঝেই আমার প্রাণ, আমার অস্তিত্ব আমার ভালবাসা–আমার সবকিছু!

অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হলো আমার!!! রোজকার মত সকালে ঘুম ভেঙে বারান্দায় গিয়ে দেখি, গোলাপ গাছটায় একটা কুঁড়ি ধরেছে!!! আনন্দে চিৎকার দিতে ইচ্ছে হলো। চিৎকার দিলাম না। তবে চোখ দুটো ভিজে উঠল!

দিনে-দিনে কুঁড়িটা পরিণত কলি হয়েছে। আর মাত্র দু'-একদিন! উত্তেজনা আর অস্থিরতায় আমার অবস্থা দিশেহারা।

BanglaBook.org

খেতে পারছি না, ঘুমাতে পারছি না, কোনও কিছুতেই মন বসাতে পারছি না! ইচ্ছে করে অফিসে না গিয়ে সারাক্ষণ গোলাপ গাছটার পাশেই বসে থাকি। ফুলটা না ফোটা পর্যন্ত গাছটার পাশ থেকে এক চুলও নড়ব না। কিন্তু সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না। বেসরকারি ব্যাংকের চাকরি, বিনা কারণে অফিস কামাই দিলে চাকরি থাকবে না।

বিকেলে অফিস থেকে বাসায় ফিরে বারান্দায় পা রাখতেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বারান্দায় গোলাপ গাছের টবটা নেই। ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। পাগলের মত হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, 'মা, আমার গোলাপ গাছটা কোথায়?! কোথায়, মা?! কোথায়?! তাড়াতাড়ি বলো কোথায় রেখেছ?!'

মা ভারাক্রান্ত গলায় বলতে লাগল, 'আর বলিস না! রোজকার মত আজও রহিমা দশটার দিকে কাজে আসে। রহিমাকে রেখে বাথরুমে গোসল করতে ঢুকি। বাথরুম থেকে বেরুবার পর দেখি, রহিমা নেই। সেই সঙ্গে বাসার মোবাইল ফোনটা, ডিভিডি প্লেয়ারটা, চার্জার লাইট, রাইস কুকার, প্রেশার কুকার...এসব নেই। পরে খেয়াল করি আলমারিটাও খোলা। আলমারি থেকে নগদ টাকা আর আমার গয়নার বাক্সটাও উধাও। আহারে! কত শখ করে গয়নাগুলো রেখেছিলাম ছেলের বউকে দেব বলে...'

ঘরের আরও কী-কী চুরি গেছে ওসব শোনার আমার ধৈর্য হলো না। মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, 'গোলাপ গাছটা কোথায় সেটা আগে বলো?!'

মা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সেটাও নিয়ে গেছে।'

মাথার উপর যেন বজ্রপাত হলো। চোখে অন্ধকার নেমে এল। সমস্ত বোধ-জ্ঞান যেন হারিয়ে ফেলছি। শুধু চোখ দুটো ছলছল করে উঠছে।

মা আবার বলতে লাগল, 'রহিমা যে বস্তিতে থাকে সেখানে

BanglaBook.org

খোঁজ নিয়েছিলাম। রহিমাকে পাওয়া যায়নি। রহিমা বস্তি ছেড়ে পালিয়েছে। এই শহর ছেড়েই পালিয়েছে। আহারে! কত শখ ছিল ওই গয়নাগুলো দিয়েই ছেলের বউকে বরণ...'

মায়ের বলা শেষ হবার আগেই হাউমাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়লাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পিশাচবাড়ি

বিকেল থেকেই ছাই রঙা মেঘে ঢেকে যাচ্ছিল আকাশ। সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক। একটু পর-পর বিজলি চমকাচ্ছে। সেই সঙ্গে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। দমকা হাওয়া ছেড়েছে।

অনীক মোহনপুরে তার মামাবাড়ির অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে। তার হাতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের মগ। সে চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছে, আর মুগ্ধ চোখে আশপাশটা দেখছে।

বারান্দা থেকে বাড়ির দিঘি আকৃতির পুকুরটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পুকুরের টলমলে পানিতে বিজলির নীল আলোর ঝিলিক খেলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে বড়-বড় মাছ ঘাই মারছে। ক্ষণিকের জন্য পানিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পুকুর পাড়ের ফাঁকা-ফাঁকাভাবে বেড়ে ওঠা নারকেল-সুপারি গাছগুলো যেন দমকা বাতাসে ডানা মেলে দিয়েছে।

রাজপ্রাসাদের মত পুরানো প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির পেছন দিক এটা। বাড়ির চারপাশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পুব পাশে বাড়ির সামনের দিকটায় রয়েছে পাঁচিল সমান এক লোহার গেট। গেট দিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে হাতের বাম পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। আর ডান পাশে পাকা করে বানানো কুকুরের ঘর। বেশ কয়েকটা ব্লাড হাউণ্ড কুকুর রয়েছে এই বাড়িতে।

BanglaBook.org

অনীকের মগের চা শেষ। খালি মগ হাতে ও রকিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ভাল রকমের একটা ঝড়-বৃষ্টি হবে। প্রকৃতিতে সেই আগমনী ঝড়-বৃষ্টির সাজ-সাজ রব।

অনীকের কাছে মামা বাড়ি আসাটাই সার্থক মনে হচ্ছে। কী অদ্ভুত সুন্দর মায়াবী এক রাত! ঢাকায় বসে এমনভাবে প্রকৃতির সাথে নিবিড় হওয়া সম্ভব নয়।

সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে অনীক যখন এ বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন গোধূলির ম্লান আলো আর মেঘের ধূসরতার মাঝে প্রকাণ্ড এই বাড়িটা দেখে কেমন গা ছমছম লাগছিল। এখন ভীতি ভাবটা আর নেই।

অনীকের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে এক মাস আগে। গত এক মাস ঢাকায় ধানমণ্ডির নিজেদের বাড়িতে মনমরা হয়ে পড়ে রয়েছে সে। অথচ পরিকল্পনা ছিল পরীক্ষা শেষে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানোর। অনীকের দুই বন্ধু রাতুল আর সাগরকে নিয়ে কুয়াকাটায় যাবার প্রস্তুতি যখন একেবারে চূড়ান্ত, হোটেল সৈকতে রুম বুকিংও হয়ে গিয়েছে, তখন হঠাৎ রাতুলের দাদা মারা যান। সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাদের আর যাওয়া হয় না। শেষ পর্যন্ত অনীক সিদ্ধান্ত নেয় মামার এখানে বেড়াতে আসবে। মামার এখানে বেড়াতে আসার কথা শুনে অনীকের মা কঠিন গলায় নিষেধ করেন, 'না, মামার ওখানে তুমি বেড়াতে যেতে পারবে না। তোমার মামা একা মানুষ, বিয়ে-থা করেননি—শুধু-শুধু তাঁর উপর ঝামেলার সৃষ্টি করা। মামার ওখানে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।'

অনীকের মায়েরা তিন বোন এক ভাই। ভাই-বোনদের মধ্যে তাঁদের এই ভাই-ই সবার বড়। আর অনীকের মা হচ্ছেন সেজো।

অনীকের বড় খালারা সপরিবার দুবাই সেটেল্ড। ছোট খালার

BanglaBook.org

বাড়ি বরিশালে। আর মামা সেই কবে নাকি ইংল্যাণ্ড থেকে পড়াশোনা শেষে ফিরে এসে মোহনপুরের এই অজপাড়াগাঁয়ে পড়ে আছেন। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন তাঁর। পুরানো আমলের ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদের মত এই বাড়িতে তিনি একা থাকেন। তবে তিনি একেবারে একা নন। তাঁর একজন কেয়ারটেকার কাম মালি কাম বাবুর্চি রয়েছে। মামার এই সঙ্গীর নাম সোবাহান মিয়া।

সোবাহান মিয়াকে দেখে মনে হয় সে-ও মামার মত নিভৃতচারী। চেহারায় কেমন রুক্ষ বদমেজাজী ভাব। অসম্ভব গম্ভীর। বয়স কত তা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে হয়তো। খুবই শক্ত-সমর্থ লোক। অনীকের ভারী-ভারী সুটকেস দুটো একসঙ্গে কত সাবলীলভাবেই নিয়ে এল ওর থাকার কামরায়।

পুব পাশের বাড়ির সামনের দিকের লম্বা টানা বারান্দা ধরে আসার সময় অনীক লক্ষ করেছে এ বাড়ির অনেক কামরাই তালাবদ্ধ। এত বড় বাড়িতে মাত্র দু'জন লোক থাকলে অধিকাংশ কামরা তালাবদ্ধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। থাকার কামরায় এসে অনীকের মনটা ভরে যায়। কামরাটা দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। খুবই গোছানো রুচিশীল কামরা। কামরায় পুরানো আমলের বাহারি ডিজাইনের কারুকাজ করা বড় একটা কাঠের আলমারি। পাশেই বিভিন্ন বইয়ে ঠাসা তাক। বিশাল এক খাট। খাট না বলে পালঙ্ক বললেও ভুল হবে না। জানালার কাছে পুরানো আমলের হাতলওয়ালা চেয়ার-টেবিল। মেঝেতে সবুজ রঙের কার্পেট। দূর্বাঘাসের মত দেখতে। জানালায় ঝুলছে সবুজ ভেলভেট কাপড়ের পর্দা। জানালার গ্রিলের সাথে পেঁচানো মানিপ্ল্যান্ট লতা। যেন অনীকের জন্যই কামরাটা যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কামরার সঙ্গে লাগোয়া পশ্চিমমুখী ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা।

BanglaBook.org

বারান্দায় একটা রকিং চেয়ার। সেই রকিং চেয়ারে বসেই অনীক প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

অনীক বলতে গেলে মায়ের নিষেধ অমান্য করে মামার এখানে বেড়াতে এসেছে। তার মা কিছুতেই তাকে আসতে দিতে চাননি। অনেক পীড়াপীড়ি করে মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে অবশেষে এসেছে।

অনীকের কাছে একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগে। তার মামার সঙ্গে মা-খালাদের কারওই কোনও সম্পর্ক নেই। নেই কোনও যোগাযোগ। এমনকী মা-খালারা মামার নাম শুনলেও এড়িয়ে যেতে চান।

অনীক রকিং চেয়ারে চোখ বন্ধ করে দোল খাচ্ছে। তার চোখে তন্দ্রা ভাব চলে এসেছে। হঠাৎ পেছন থেকে আসা ভারী খসখসে কর্কশ কণ্ঠে তার তন্দ্রা ভাবটা ছুটে গেল। ভারী কণ্ঠটি বলল, 'নীচে খাবার ঘরে চলেন। সাহেব বসে আছেন। আপনাকে খেতে ডাকছেন।'

অনীক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সোবাহান মিয়া। সোবাহান মিয়া কখন এসে অন্ধকারে পেছনে দাঁড়াল সে একটুও টের পায়নি। লোকটা কেমন যেন বিড়ালের মত নিঃশব্দে হাঁটা-চলা করে। এর আগে যখন চা আর মোমদানি নিয়ে এল তখনও সে এভাবে নিঃশব্দে এসেছে।

অনীক চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, 'চলুন।'

সোবাহান মিয়া অনীকের কামরার ভিতরে জ্বালানো মোমদানিটা নিয়ে সামনে-সামনে এগোতে লাগল। মোমদানিটায় তিনটা মোমবাতি জ্বলছে। কিন্তু সেই আলো অন্ধকারকে তেমন দূর করতে পারছে না। বরং যেন আশপাশের অন্ধকারকে আরও ঘন করছে। মাঝে-মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় মোমবাতির আলো দুলে-দুলে উঠছে।

BanglaBook.org

মামার সঙ্গে এখন পর্যন্ত দেখা হয়নি অনীকের। বিশ-একুশ বছর আগে একবার নাকি অনীকদের বাড়িতে গিয়েছিলেন মামা। তখন অনীকের বয়স এক কি দেড় বছর। ওই বয়সের স্মৃতি কারও মনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বেশ উত্তেজনা অনুভব করছে অনীক। বড় হবার পর প্রথম মামাকে দেখবে। একটু ভয়-ভয়ও লাগছে। মামা হয়তো কিছু না জানিয়ে এভাবে হুট করে চলে আসায় রাগ করতেও পারেন।

খাবার ঘরের টেবিলের উপর একটা মোমদানি। মোমদানিটায় একসঙ্গে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে। মোট তেরোটা। ঘরটা বেশ আলোকিতই। খাবার টেবিলের এক কোণের চেয়ারে অসম্ভব সুদর্শন চেহারার এক লোক বসে আছেন। গায়ে ইস্ত্রি করা কালো রঙের পাঞ্জাবি। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ।

লোকটা তাকিয়ে রয়েছেন জ্বলন্ত মোমবাতিগুলোর দিকে। মোমবাতির আলো পড়ে চোখ কেমন জ্বল-জ্বল করছে।

ইনিই কি অনীকের মামা? সেটা কী করে হয়?! লোকটার চেহারায় তারুণ্যের জৌলুস। বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ। মাথার চুলগুলো ঘন কালো। গায়ের রং টকটকে ফর্সা।

অনীকের মায়ের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। এরই মধ্যে মাথার প্রায় সব চুল পেকে গেছে। মায়ের চেয়ে মামা নাকি দশ-বারো বছরের বড়। সেই হিসেবে মামার বয়স ষাট-বাষট্টি হবার কথা। কিন্তু এই লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের একটুও বেশি নয়। চুল কালো—এর কারণ হিসেবে ধরে নেয়া যায় তিনি চুল কলপ করেছেন। কিন্তু চেহারার যুবকসুলভ জেল্লা?!

লোকটা গলা খাঁকারি দিয়ে কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'অনীক, তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে?'

BanglaBook.org

অনীক বুঝতে পারল এই লোকই তার মামা। সে স্তম্ভিত ভাব সামলে বলল, 'বেশ ভাল হয়েছে।' মনে-মনে বলল, মামা জানল কী করে যে সে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে! মামাকে তো কোনও কিছু জানিয়ে আসেনি।

'তোমার মা কেমন আছে?'

'মা তেমন ভাল নেই। কিছুদিন ধরে ডায়াবেটিসে খুব কাবু হয়ে গিয়েছে। ব্লাড-প্রেশারও ওঠা-নামা করে।' অনীকের মনে ভাবনা জাগল, মামা তাঁর চেহারা এবং শরীর এখনও এতটা অটুট রাখলেন কী করে?!

মামা টেবিলের উপর উপুড় করা প্লেট চিত করতে-করতে বললেন, 'সারাদিন জার্নি করে এসেছ, নিশ্চয়ই অনেক খিদে পেয়েছে–খেতে বসা যাক।'

অনীক মামার পাশে চেয়ার টেনে বসল। মামা গলার স্বর একটু উঁচু করে, 'সোবাহান' বলে ডাক দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সোবাহান মিয়া ভোজবাজির মত দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। টেবিলে আগে থেকেই অনেক খাবার-দাবার ঢাকনা দিয়ে ঢাকা ছিল। ঢাকনা সরিয়ে সোবাহান মিয়া খাবার দিতে লেগে গেল। অনীকের প্লেটে প্রথমে সরু চালের ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত দিল। এরপর এক-এক করে বেগুন ভাজা, শুঁটকি মাছের ভর্তা আর লালচে করে ভাজা আস্ত একটা কী মাছ যেন তুলে দিল। মাছটা বেশ বড়। সমস্ত প্লেট দখল করে নিয়েছে।

অনীক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী মাছ?'

সোবাহান মিয়া খসখসে গলায় উত্তর দিল, 'সরপুঁটি মাছ। বাড়ির পুকুর থেকেই ধরা।'

অনীক লক্ষ করল মামা প্লেটে ভাত, বেগুন ভাজা, শুঁটকি ভর্তা বা সরপুঁটি মাছ কিছুই নিলেন না। শুধু ভুনা মাংসের বাটি থেকে বেশ কয়েক টুকরো মাংস পাতে নিলেন।

BanglaBook.org

'মামা, আপনি ভাত নেবেন না?' কথাটা মুখ ফসকেই বেরিয়ে পড়ল অনীকের।

মামা তাঁর স্বভাবসুলভ শান্ত-কোমল গলায় বললেন, 'না, আমি রাতে ভাত খাই না–শুধু মাংস খাই। এটাই আমার প্রতি রাতের খাবারের মেনু।'

অনীকের বেশ অবাক লাগল, প্রতি রাতেই শুধু মাংস খান–এটা কেমন অভ্যাস!

সরপুঁটি মাছটা খেতে বেশ লাগছে। তবে কোনও ঝোলই নেই, একেবারে শুকনো করে ভাজা। অনীকের অভ্যেস ঝোল দিয়ে ভাত মাখিয়ে খাওয়ার। সামনে আর একটা বাটিতে ঝোল-ঝোল কী একটা পদ দেখতে পেল। সেদিকে তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো সোবাহান মিয়াকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী রান্না?'

'কবুতরের বাচ্চার মাংস কাঁঠালের বিচি দিয়ে ঝোল-ঝোল করে রাঁধা হয়েছে। চিলেকোঠার ঘুলঘুলিতে বুনো কবুতর বাসা বেঁধেছে। সেই বাসা থেকেই বাচ্চা চুরি করে এনেছি।'

অনীক নিজেই বাটি টেনে নিয়ে কিছুটা পাতে নিল। খেয়ে দেখল অসাধারণ স্বাদ! যেন স্বর্গীয় খাবার!

মামা তাঁর প্লেটে নেয়া মাংসের টুকরোগুলোই একটা-একটা করে অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছেন। দেখে মনে হচ্ছে মামা খুবই তৃপ্তি পাচ্ছেন।

অনীক কবুতরের বাচ্চার ঝোল দিয়ে খাওয়া শেষে নতুন করে প্লেটে ভাত নিয়ে ভুনা মাংসের বাটিটা সামনে টেনে আনল। তাই দেখে সোবাহান মিয়া বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার এই মাংসটা খাওয়ার দরকার নেই। আপনি আরও খানিকটা কবুতরের বাচ্চার ঝোল নিয়ে খান। না হয় আর একটা মাছ ভাজা দেই, সেটা খান।'

BanglaBook.org

অনীক অবাক হয়ে বলল, 'মাংস খেলে কী সমস্যা?!'

সোবাহান মিয়া বলল, 'মাংসটা তেমন ভাল নয়, বাসি। এটা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা মাংস। এখানে কারেন্ট নেই, ফ্রিজ নেই—এ ছাড়া উপায়ই বা কী! আপনার নাকে গন্ধ লাগতে পারে।'

অনীক বলল, 'দেখিই না অন্তত এক টুকরো পাতে নিয়ে—খেতে কেমন লাগে। মামা যেহেতু খাচ্ছেন, আমিও নিশ্চয়ই পারব।'

মামা আর সোবাহান মিয়া চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। যেন তাদের মধ্যে চোখে-চোখে গোপন অর্থপূর্ণ কোনও আলাপ হলো। এরপর মামা বললেন, 'অনীক, তোমার পেট খারাপ করতে পারে।'

অনীক তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে মাংস পাতে নিতে-নিতে বলল, 'দেখিই না একটু খেয়ে, কেমন লাগে। ভাল না লাগলে আর নেব না।'

মামা এবং সোবাহান মিয়া দু'জনই একেবারে চুপ মেরে গেলেন। আর কিছুই বললেন না।

মাংস মুখে নিয়ে কয়েকটা চিবুনি দিতেই অনীকের চোখ আবেশে নিমীলিত হয়ে এল। এত সুস্বাদু মাংস বোধহয় এর আগে জীবনে আর কোনও দিনও খায়নি সে।

অনীক তৃপ্তি ভরা গলায় বলল, 'এটা কীসের মাংস? এত সুস্বাদু!!'

সোবাহান মিয়া থমথমে গলায় বলল, 'হরিণের মাংস। তিন মাস আগে পাথরঘাটা থেকে আনা হয়েছিল। রোদে শুকিয়ে এত দিন ধরে রেখে দিয়েছি।'

এর আগে কোনও দিনও হরিণের মাংস খাওয়া হয়নি অনীকের। অনেকের মুখেই হরিণের মাংসের স্বাদের গল্প শুনেছে। গল্প শুনে-শুনে হরিণের মাংস খাওয়ার বাসনা তার অনেক দিনের।

BanglaBook.org

তাই মাংসটা হরিণের মাংস জেনে মাংসের স্বাদ যেন আরও অনেকগুণ বেড়ে গেল। সে আরও বেশ কয়েক টুকরো পাতে তুলে নিল।

মামার খাওয়া শেষ। তিনি প্লেটে হাত ধুতে-ধুতে বললেন, 'অনীক, আমি এখন উঠছি। কাল আবার তোমার সাথে দেখা হবে। তোমার যা কিছু প্রয়োজন পড়ে সোবাহানকে বলবে।'

মামা আলো হাতে না নিয়েই গটগট করে খাবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

দুই

মাঝ রাতে অনীকের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুমোবার আগে দক্ষিণের জানালাটা খোলা রেখেই শুয়ে পড়েছিল ও। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল তখন। এখন সেই খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে আর এক-এক বার বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চমকানোর নীল আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত করে দিচ্ছে।

ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও অন্য রকম অদ্ভুত একটা শব্দ কানে আসছে অনীকের। মনে হচ্ছে অনেকগুলো মেয়েমানুষ একসঙ্গে হিস-হিস করে গুঙিয়ে-গুঙিয়ে কাঁদছে। ঝড়ের শব্দ কি এটা?!

শব্দটা আরও স্পষ্ট হলো। অনীকের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। শব্দটা খাটের নীচ থেকে আসছে।

অনীক বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই উপুড় হয়ে মশারির ভিতর থেকে মাথা বের করে খাটের নীচে উঁকি দিল। বিজলি চমকানোর আলোয় সে যা দেখতে পেল তাতে তার শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের

BanglaBook.org

ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল।

খাটের নীচে অনেকগুলো কাটামুণ্ড। সবগুলো মেয়েমানুষের। কাটামুণ্ডগুলো মেঝের উপর এলোমেলো লম্বা চুল ছড়িয়ে রক্তে মাখামাখি হয়ে কিলবিলিয়ে নড়াচড়া করছে। ওগুলোর ফ্যাকাসে চোখগুলো পলকহীন চেয়ে রয়েছে।

সকাল নয়টা নাগাদ অনীকের ঘুম ভাঙল। রাতের কথা মনে পড়তেই সঙ্গে-সঙ্গে উপুড় হয়ে খাটের নীচে উঁকি দিল। নাহ্, কিছুই নেই খাটের নীচে। ঝকঝকে, তকতকে পরিষ্কার মেঝে। নিশ্চয়ই ওটা দুঃস্বপ্ন ছিল! রাতে অনেক খাওয়া হয়েছিল তাই পেটে সমস্যা হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছে!

মন থেকে ভীতি দূর করে উঠে পড়ল অনীক। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বাড়ির সামনে পুব পাশের টানা লম্বা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ঝড়-বৃষ্টির পরে পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। রোদের আলোটা মিষ্টি লাগছে। বারান্দার রেলিঙে হাত রেখে নীচের দিকে তাকাল। সোবাহান মিয়া কুকুরগুলোকে খাঁচায় বন্দি করছে। রাতে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অনীক গুনে দেখল মোট তেরোটা কুকুর। সবগুলোর গায়ের রঙই কালো। কুকুরগুলোকে খাঁচায় বন্দি করার পর সোবাহান মিয়া কুকুরের খাবার নিয়ে এল। খাবার দেখে কুকুরগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। বাইরে থেকে সোবাহান মিয়া খাঁচার ভিতরে চিমসানো শুকনো খাবার ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে লাগল। ছোঁড়া খাবারের টুকরো কুকুরগুলো তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে হুটোপুটি করে খেয়ে ফেলছে।

অনীক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সোবাহান কাকু, কুকুরকে কী খেতে দিচ্ছেন?'

সোবাহান মিয়া বিরক্তি ভরা চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

খসখসে গলার স্বরটা একটু তুলে বলল, 'শুকনো মাংস।'

অনীক আবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের মাংস?'

সোবাহান মিয়া আগের মত বিরক্ত চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে অনীহা ভরা গলায় বলল, 'গরুর মাংস। কুকুরের জন্য একসাথে অনেকগুলো মাংস লবণ মাখিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়।'

কুকুরদের খাওয়ানো শেষ। সোবাহান মিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। অনীকের চোখ পড়ল দক্ষিণ পাশের ফুলের বাগানের দিকে। আশ্চর্য! সারা বাগান জুড়ে শুধু রক্তজবা ফুলেরই গাছ। এলোমেলোভাবে বেড়ে ওঠা। অবহেলা আর অযত্নে জংলা হয়ে রয়েছে। ফুলে-ফুলে লাল হয়ে রয়েছে গাছগুলো। মাটিতেও বেশ কিছু ফুল ঝরে পড়ে রয়েছে। মনে হয় গত রাতের ঝড়ের তাণ্ডবে ফুলগুলো ঝরে পড়েছে।

মোট তেরোটা গাছ!!!

বেলা এগারোটা। অনীক পশ্চিমের ছোট্ট বারান্দায় বসে অলস ভঙ্গিতে একটা পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে।

হঠাৎ অনীকের চোখ পড়ল নীচে পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটলায়। ঘাটলায় সোবাহান মিয়া বড়শি ফেলে ঝিম মেরে বসে আছে। কিছুক্ষণ যেতেই বড়শিতে একটা মাছ তুলল। ঝকঝকে রূপালী রঙের মাছ। দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ওটা কী মাছ। তবে সাইজ দেখে মনে হচ্ছে, রাতে যে সরপুঁটি মাছ খেয়েছে এটাও সেই একই মাছ।

সোবাহান মিয়াকে মাছ ধরতে দেখে অনীক বেশ উত্তেজনা অনুভব করছে। বড়শি দিয়ে মাছ ধরা কী এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার! এক মুহূর্তও আর দেরি না করে ঘাটলার উদ্দেশে যেতে লাগল সে।

ঘাটলায় পৌঁছে অনীক উত্তেজিত গলায় সোবাহান মিয়াকে

BanglaBook.org

বলল, 'কাকু, আপনি একা-একা বড়শি ফেলে মাছ ধরছেন–আমাকে ডেকে নিলেন না কেন!!'

সোবাহান মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি নিজের হাতে মাছ ধরতে চান?'

'চাই মানে!! অবশ্যই চাই!!!'

সোবাহান মিয়া আর একটা বড়শি এনে অনীকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে ধরুন।'

বাঁশের কঞ্চির মাথায় নাইলন সুতা দিয়ে বাঁধা সাধারণ বড়শি। আর টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ময়দার গুলি। ময়দার গুলি বড়শিতে গেঁথে পানিতে ফেলা হয়।

সোবাহান মিয়া আরও একটা সরপুঁটি মাছ ধরল। অনীক একটিও ধরতে পারল না। তার বড়শির ফাতনাও কয়েকবার ডুবিয়ে নিয়েছিল কিন্তু সময় মত ছিপে টান দিতে পারেনি বলে মাছ বড়শিতে গেঁথে তুলতে পারেনি।

সোবাহান মিয়া বেশ বড় সাইজের একটা তেলাপিয়া মাছও ধরল। কমপক্ষে আধকেজি ওজনের।

অনীক উত্তেজিত ডগমগ গলায় বলে উঠল, 'পুকুরে আর কী-কী মাছ রয়েছে? নিশ্চয়ই বড় মাছও আছে! সেগুলো ধরা যায় না?'

সোবাহান মিয়া তার স্বভাবসুলভ খসখসে কর্কশ গলায় বলল, 'অনেক বছরের পুরানো রুই-কাতলা-মৃগেলসহ আরও বিভিন্ন জাতের মাছ রয়েছে। আপনি চাইলে বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করা যাবে।'

অনীকের চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ঝলমলে গলায় বলল, 'অবশ্যই চাই! অবশ্যই! আপনি ব্যবস্থা করুন।'

বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুকুরে চার ফেলা হয়েছে। অনীকের সামনে বসেই চার তৈরি করা হয়। চালের গুঁড়ো, খৈলের

BanglaBook.org

গুঁড়ো, মেথি গুঁড়ো, কয়েক ধরনের ফোড়ন, মিষ্টির সিরা–আরও কীসব যেন মশলা-টশলা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বড়-বড় গোল চাকা করে পুকুরের ঘাটলার সামনে নির্দিষ্ট এক জায়গায় ফেলা হয়। এই চারের গন্ধেই নাকি বড় মাছ পুকুরের এই নির্দিষ্ট জায়গায় আসবে। বড়শির টোপের জন্যও ডেয়ো পিঁপড়ের বাসা, বোলতার বাসা ভেঙে আনা হয়েছে। দুটো হুইল বড়শিও নামানো হয়েছে।

সবকিছু জোগাড়যন্ত্রের পর অনীক ও সোবাহান মিয়া বড়শিতে টোপ গেঁথে, চার ফেলা সেই নির্দিষ্ট স্থানে বড়শি ফেলে বসে পড়ল। শুরু হলো অপেক্ষার প্রহর।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায় কিন্তু মাছের দেখা নেই। এমনকী একবারের জন্যও দুটো বড়শির একটিরও ফাতনা ডোবে না। অনীক অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে ধৈর্যহারা গলায় বলে, 'একটা মাছও তো টোপ গিলছে না!'

সোবাহান মিয়া নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'টোপ হিসেবে আর একটা জিনিস ব্যবহার করে দেখতে পারি।'

'সেটা কী?!'

'কেঁচো। অনেক দিনের পুরানো বড় মাছ খুব চালাক হয়ে যায়, সহজে বড়শি খেতে চায় না। কেঁচো মাছের খুব পছন্দের। কেঁচো গেঁথে বড়শি ফেললে খেতে পারে।'

সোবাহান মিয়া মাটি খুঁড়ে কেঁচো বের করে আনে। বড়শিতে গেঁথে বড়শি ফেলা হয়। তাতেও কোনও কাজ হয় না। এক পর্যায়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। সোবাহান মিয়া আর অনীক বড়শি গুটিয়ে উঠে পড়ে।

BanglaBook.org

রাতে খাওয়ার টেবিলে অনীকের মামা বললেন, 'অনীক নাকি

পুকুরের বড় মাছ দেখতে চাও?'

অনীক মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মামা, আমি আর সোবাহান কাকু আজ সারা দিনটা পণ্ড করেছি বড় মাছ ধরার পেছনে। একটা মাছও ধরতে পারিনি।'

মামা অনীকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখন বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে বসব। তুমি আমার পাশে বসে দেখতে পারো।'

অনীক অবাক গলায় বলল, 'মামা, আপনি এই রাতের বেলা মাছ ধরবেন?!'

'হ্যাঁ, রাতেই বড় মাছ ধরতে সুবিধে। সহজে ধরা পড়ে।'

বেশ আয়োজন করে মামা মাছ ধরতে বসেছেন।

বড়শি ফেলে বড়শির ফাতনার উপর টর্চের আলো ফেলে রাখা হয়েছে। মামা সেদিকে তাকিয়ে ছিপ হাতে স্থির শান্ত ভঙ্গিতে ঘাটলার সিঁড়িতে বসে আছেন। মামার পাশেই অনীক বসা। ওর চোখও মামার বড়শির ফাতনার দিকে। একটাই বড়শি ফেলা হয়েছে। সোবাহান মিয়া বড় এক ফ্লাস্ক ভর্তি চা করে এনে পাশে রেখেছে। সে-ও মামার অন্য পাশে বসা।

ঘণ্টা দুই চলে গেল। সারা দিনের মত একই অবস্থা, বড় মাছের দেখা নেই। এরই মধ্যে মামা বেশ কয়েকবার ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেয়ে নিয়েছেন। মামাকে খেতে দেখে অনীকও একবার চা ঢেলে নিয়েছিল। অবশ্য সে খেতে পারেনি। সাংঘাতিক কড়া লিকারের চা, কালচে রং। চুমুক দিতেই বোঝা যায় প্রচুর চিনি দেয়া হয়েছে, এরপরও তেতো সিরাপের মত তিতকুটে স্বাদ। অনীক মুখে নিয়েই 'ওয়াক-থু' বলে ফেলে দেয়।

মামা এবং সোবাহান মিয়া দু'জনেই খুব স্বল্পভাষী চুপচাপ স্বভাবের। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনও কথাই বলেন না। অনীক বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে গল্প করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের তরফ

BanglaBook.org

থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে থেমে যেতে হয়েছে। মাছ ধরতে বসে তারা দু'জন যেন অন্য সময়ের চেয়েও আরও বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে। বোধহয় মাছ ধরার সময় কথা বলা নিষেধ। হতে পারে কথা বললে, কথার শব্দে মাছ বড়শির কাছে আসে না।

অনীকের খুব ঘুম পাচ্ছে। একটার পর একটা হাই তুলছে। যেন সে ঘাটলার সিঁড়িতে বসা অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়বে। কোনওক্রমে চোখ দুটো মেলে রেখেছে। তার ঝাপসা চোখের দৃষ্টি এখনও বড়শির ফাতনার দিকে। এই বুঝি বড় একটা মাছ ফাতনা ডুবিয়ে নেবে। আজ সারা দিন এবং এখন এই রাতেও বড়শির ফাতনার দিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে তার চোখ দুটি একেবারে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ অনীক ঢুলতে-ঢুলতে ঘুমাতে চলে গেল।

সকাল সাড়ে ন'টায় অনীকের ঘুম ভাঙল। নাস্তার টেবিলে সোবাহান মিয়া জানাল, রাতে বড় একটা কাতল মাছ ধরা পড়েছে।

কথাটা শুনে অনীক আনন্দে চোখ বড় করে বলল, 'কোথায় সেই মাছ?!'

সোবাহান মিয়া নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'রান্নাঘরে রাখা আছে। মাছটা এখন কাটতে বসব। এতক্ষণ আপনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষাই করেছি। আপনার মামার হুকুম আপনি মাছটা না দেখার আগে যেন কুটা না হয়।'

রান্নাঘরে ঢুকে অনীক অবাক হয়ে গেল। রান্নাঘরের মেঝে জুড়ে বিশাল এক কাতল মাছ পড়ে রয়েছে। ছোট-খাট একটা মানুষের সমান লম্বায় মাছটা! তেমন চওড়া! মাছটার ঠোঁট দুটো এখনও নড়ছে। কানকো ফুলে-ফুলে উঠছে। ভিতরে দেখা যাচ্ছে

BanglaBook.org

লাল টুকটুকে ফুলকা।

অনীক অভিভূত গলায় বলল, 'মাছটার ওজন কত হতে পারে?!'

সোবাহান মিয়া মাছ কাটার প্রস্তুতি নিতে-নিতে বলল, 'তিরিশ-বত্রিশ কেজির নীচে হবে না। এই পুকুরে এর চেয়েও অনেক বড়-বড় মাছ রয়েছে।'

সোবাহান মিয়া খুব দ্রুতই মাছটা কুটে ফেলল। দেখে মনে হলো, এরকম বড় মাছ তার প্রায়ই কুটতে হয়। অনীক মোড়ায় বসে প্রবল আগ্রহ নিয়ে মাছ কাটা দেখল। তবে এক সময় তার কিছুটা মন খারাপ হলো। তার জন্যই আজ এই মাছটাকে প্রাণ দিতে হয়েছে—এই ভেবে।

মাছ কাটা শেষে সোবাহান মিয়া বলল, 'দুই পিস পেটির মাছ শুধুমাত্র হলুদ-লবণ মেখে কড়া করে ভেজে আপনাকে খেতে দিই, খেয়ে দেখুন কেমন লাগে।'

দুপুরে মাছের বিভিন্ন ধরনের পদ করা হলো। মাছের কালিয়া, দোপেঁয়াজা, কোফতা, কোরমা, ভুনা, টিকিয়া, মাছের সালাদ, মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট...খাবার টেবিলে মাছের এতগুলো পদ একসঙ্গে দেখে অনীক চোখ কপালে তুলে বলল, 'এত মাছ কে খাবে? বাড়িতে তো আমরা মাত্র তিনজন!'

সোবাহান মিয়া বলল, 'আপনি যা খেতে পারেন খান। বাকিটা পুকুরে ফেলে দেব।'

অনীক প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলল, 'কেন, মামা খাবেন না?! আপনি খাবেন না?!'

'না, আমরা মাছ খাই না।'

অনীক আরও অবাক গলায় বলল, 'আপনাদের দু'জনের

BanglaBook.org

কেউই মাছ খান না?!'

'না, গন্ধ লাগে।'

'মামা কোথায়? মামাকে যে দেখতে পাচ্ছি না! গতকালও সারাদিনে মামাকে দেখতে পাইনি!'

'আপনার মামার ঘুমের সমস্যা রয়েছে। রাতে ঘুম হয় না। তাই সারা দিন ঘুমিয়ে কাটান। সন্ধ্যার পরে তাঁর দেখা পাবেন।'

অনীকের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল, একটা লোক সারা রাত জেগে থাকেন আর সারা দিন ঘুমান—এটা কেমন অভ্যাস!

তিন

মাঝ রাতে হঠাৎ কেমন এক অস্বস্তিতে অনীকের ঘুম ভেঙে গেল। দক্ষিণের জানালাটা খোলাই রয়েছে। এর পরও ঘরের মধ্যে কেমন গুমোট ভাব। চারপাশটা জমাট অন্ধকার গিলে রেখেছে। সেই অন্ধকারের বুক চিরে খাটের নীচ থেকে প্রথম দিনের মত সম্মিলিত নারী কণ্ঠের হিস-হিসে গোঙানির শব্দ কানে আসছে।

অনীক প্রথমটায় বেশ ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণেই নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করে উঠে বসল। সে শহুরে ছেলে, তার এত ভয় পাওয়া চলে না। ভূত-প্রেত সে মোটেই বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই সে ভুল শুনছে। গ্রাম্য পরিবেশে রাতের বেলা বিভিন্ন শব্দ শোনা যায়। ঝিঁ ঝি পোকার ডাক, শিয়ালের হাঁক, বাদুড়ের ডানা ঝাপ্টানো, বিড়াল-কুকুরের কান্না, ব্যাঙের কোলাহল...আরও কত কী! তেমনই কোনও শব্দকেই হয়তো তার কাছে মানুষের গোঙানি বলে মনে হচ্ছে। নয়তো বা সেদিনের মত দুঃস্বপ্ন দেখছে।

বালিশের নীচে রাখা টর্চ লাইটটা হাতে নিল অনীক।

BanglaBook.org

সেদিনের মত মশারির ভিতর থেকে মাথা বের করে, উপুড় হয়ে খাটের নীচে উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলল। সেদিনের মত সেই একই দৃশ্য! কতগুলো নারীমুণ্ড! বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে ঝট করে মাথা তুলে ফেলল।

আলো ফেলার পরমুহূর্তে গোঙানির শব্দ থেমে গেছে। নেমে এসেছে সুনসান নীরবতা। অনীক নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করে নিয়েছে। মনে আরও সাহস এনেছে। এই ভীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। কিছু দেখে ভয় পেয়ে ভয় মনের ভিতর পুষে রাখা কোনও কাজের কথা নয়। ভয়ের মুখোমুখি হতে হয়। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে ভয়টা আর কোনও দিনও পিছু ছাড়ে না।

অনীক মাথা নিচু করে আবার খাটের নীচে উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলে দেখে কিছুই নেই। খাট থেকে নেমে টর্চের আলো ফেলে টেবিলের কাছে গিয়ে, জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে ঢকঢক করে নিমিষে শেষ করে।

প্রচণ্ড ভাপসা গরম পড়েছে আজ। দরজা খুলে পুব পাশের টানা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় অনীক। চারপাশ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আজ বোধহয় অমাবস্যা।

অনীক লম্বা টানা বারান্দা ধরে পায়চারী করতে লাগল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে-হাঁটতে এক সময় বারান্দার একেবারে উত্তর মাথায় পৌঁছে যায়। উত্তর মাথায় পৌঁছে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তর মাথার বদ্ধ কামরার ভিতরে কারা যেন রয়েছে। মৃদুভাবে তাদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। অনীক দরজায় টর্চের আলো ফেলে দেখল—দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। টর্চ নিভিয়ে কান খাড়া করে বোঝার চেষ্টা করল সত্যিই কি ভিতরে কেউ আছে?! খানিক বাদে লক্ষ করল, দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি চোখে পড়ছে। দরজার আরও কাছ ঘেঁষে আলো-আসা সেই ফাঁকে চোখ রাখল। কিছুটা চোখ সয়ে

BanglaBook.org

আসতেই তার দৃষ্টিতে কামরার ভিতরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

খোলা একটা বিশাল কামরা। কোনও আসবাব নেই। চারদিকে অনেকগুলো বড়-বড় মোমবাতি জ্বলছে। গুণে দেখল মোট তেরোটা। কামরার চার দেয়ালে খোদাই করা উল্টো করে রাখা ক্রুশের মত চিহ্ন। উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটা পাথরের মূর্তি। মূর্তিটা বেদির উপর বসানো। দেখতে খুবই অদ্ভুত। মূর্তিটার পা আর মাথা ছাগলের মত। কালো-কালো লোমে ভরা। থুতনিতে দাড়িওয়ালা ছাগলের মত দাড়ি আর মাথার উপরে দু'পাশে বড়-বড় দুটো শিং। কিন্তু শরীরের বাকি অংশ মানুষের মত। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণ যেন। উলঙ্গ মূর্তিটির উপরের অংশ মেয়েমানুষদের মত আর নীচেরটুকু পুরুষের। হাত দুটো গাবদা-গাবদা। বিশাল ভুঁড়িওয়ালা পেট। পায়ের কাছে দুটো সাপ দু'দিক থেকে ফণা তুলে থাকার ভঙ্গিতে। পিঠে প্রকাণ্ড দুটো বাদুড়ের ডানার মত ডানা দু'পাশে ছড়ানো। মাথার দুই শিং-এর মাঝখানে অদ্ভুত একটা ত্রিশূলাকার মুকুট।

মূর্তির সামনে মামা আর সোবাহান মিয়া। তারা ছাড়াও মূর্তির সামনে বেদির উপর এক উলঙ্গ তরুণীকে শোয়ানো রয়েছে। মেয়েটা অচেতন। মেয়েটার গলায় জবা ফুলের মালা পরানো। কানের দুই পাশে চুলের মধ্যেও দুটো জবা ফুল গোঁজা।

মামা আর সোবাহান মিয়ার গায়ে আলখেল্লার মত পা পর্যন্ত লম্বা কালো পোশাক। মামার মাথায় অদ্ভুত ধরনের একটা টুপি। টুপির সামনেটায় লেখা YHVH পিছনে লেখা ADONAI ডান দিকে লেখা EL আর বাম দিকে লেখা ELOHIM।

মামা বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্রের মত আওড়াচ্ছেন। সোবাহান মিয়া মামার হাতে ছোট্ট একটা মাটির পাত্র তুলে দিল। সেই পাত্রে কিছু একটা তরল দ্রব্য রয়েছে। সেই তরল দ্রব্যে মামা মন্ত্র পড়ে-পড়ে ফুঁ দিচ্ছেন। এক সময় মন্ত্রপূত তরল মেয়েটার

BanglaBook.org

গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। মেয়েটা যেন একটু নড়ে উঠল। অনীকের নাকে লাগল ঝাঁঝাল কটু গন্ধ। বোধহয় মন্ত্রপূত ওই তরলের গন্ধ।

সোবাহান মিয়া মামার হাত থেকে মাটির পাত্রটি নিয়ে হাতে দিল মস্ত বড় এক চকচকে ছোরা। মোমের আলোতেও ছোরাটি ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

অনীকের মনের ভিতর তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল। এরা কী করতে যাচ্ছে?! প্রাচীন ভারতে ঠগি নামে একদল ডাকাত সম্প্রদায় ছিল। ঠগিরা মা কালীর মূর্তির সামনে কুমারী মেয়েদের বলি দিত। এরাও কি তেমন কিছু করতে যাচ্ছে?!

সোবাহান মিয়া মেয়েটার মুখের চারপাশে ধূপের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভরা একটা পাত্র ঘুরিয়ে আনল। অচেতন মেয়েটা নির্বিকার পড়ে আছে।

মামা চকচকে ছোরা হাতে মেয়েটার আরও কাছে চলে গেলেন। এবার ছোরাটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে পুব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ইউফাস মেটাহিম ফ্রগেটিভি এট এপেলভি...' পর-পর তিনবার বলার পরে একটু থেমে গলার স্বর আরও উঁচু করে বলতে লাগলেন, 'প্রভু লুসিফার, প্রভু লুসিফার...আসুন, প্রভু, আসুন...আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি...আসুন, প্রভু, আসুন, প্রভু লুসিফার...'

আচমকা ছোরা চালিয়ে দিলেন মেয়েটার গলায়। নিমিষেই মেয়েটার ধড় থেকে মাথাটা ছিন্ন হয়ে গেল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল মূর্তির পায়ের নীচের বেদিটা। কিছুক্ষণ ধড়ফড় করে নিস্তেজ হয়ে গেল মেয়েটার দেহ। পাশেই কাটামুণ্ডটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে রইল।

অনীক নিজের গায়ে চিমটি কাটল। এতক্ষণ যা দেখল তা কি সত্যি, নাকি স্বপ্ন, নাহ্, সত্যি! চিমটি কাটায় ব্যথা লাগছে।

BanglaBook.org

ভীত, আতঙ্কিত, বিস্মিত অনীক দেখতে পেল–মূর্তির পায়ের কাছের পাথরের সাপ দুটো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কালো কুচকুচে সাপ দুটো লক-লক করে বেয়ে চলে গেল বলি হওয়া মেয়েটার কাছে। সাপ দুটো মেয়েটার কাটা গলার দু'পাশে মুখ লাগাল। চুক-চুক করে রক্ত পান করছে।

বিস্ময়ে আর আতঙ্কে অনীকের চোয়াল ঝুলে পড়ল। ওদিকে মামা আর সোবাহান মিয়ার চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল। তাদের চেহারায় আত্মতৃপ্তির ছাপ দেখতে পাওয়া গেল।

এক সময় সাপ দুটো সমস্ত রক্ত শেষ করে ফেলল। আবার মূর্তির পায়ের কাছে গিয়ে আগের মত পাথরের রূপ নিয়ে স্থির হয়ে গেল।

সোবাহান মিয়া মেয়েটার নিথর ধড়টা টেনে ঘরের মাঝ বরাবর নিয়ে এল। মামা কাটামুণ্ডটার চুল মুঠি করে ধরে সেটাও এনে ধড়টার পাশে রাখলেন। মামা নিচু গলায় সোবাহান মিয়াকে কিছু নির্দেশ দিয়ে কামরার দক্ষিণ পাশের গুপ্ত একটা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

সোবাহান মিয়া একা রয়ে গেল। সে চাকু, ছোরা, চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল নিয়ে বসে পড়ল মেয়েটার দেহটা কাটাকুটি করার জন্য। বড় কাতল মাছটা কাটার মত দ্রুততার সঙ্গে মেয়েটার শরীরের মাংস কেটে টুকরো-টুকরো করতে লাগল। পেটের মধ্য থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে আলাদা রাখল।

আর সহ্য করা যায় না। অনীকের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। মাথা প্রচণ্ড চক্কর মারছে। পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে বমি পাচ্ছে। সে যেন নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। ঘোরাচ্ছন্নের মত কোনওক্রমে টলতে-টলতে নিজের কামরায় ফিরে, বিছানায় পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

BanglaBook.org

খুব সকালে অনীকের চৈতন্য ফিরে এল। রাতের কথা মনে পড়তেই মুহূর্তে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। বুকের ভিতর এক ধরনের চাপ অনুভব করতে লাগল। যেন বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছে না। গত রাতে সে যা দেখেছে তা কি সত্যিই ছিল?! নাকি দুঃস্বপ্ন?! নাকি বিভ্রম?!

অনেকক্ষণ ধরে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করল অনীক। যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

সোবাহান মিয়া এসে অনীককে নাস্তা করার জন্য ডাকল।

প্রতিদিনের মত নাস্তার টেবিলে রয়েছে হরিণের ভুনা মাংস আর পরোটা। আরও একটা বাটিতে হলদেটে থকথকে কিছু একটা রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো সোবাহান মিয়াকে অনীক থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?!'

সোবাহান মিয়া আগের মত ভারী কর্কশ গলায় বলল, 'মগজ ভাজা, হরিণের মগজ ভাজা। গত রাতে পাথরঘাটা থেকে আবার হরিণের মাংস এসেছে।'

অনীক বুঝতে পারল, এই ভুনা মাংস বা মগজ ভাজা কোনও কিছুই হরিণের নয়। গত রাতে বলি হওয়া মেয়েটার।

'আমার খিদে নেই,' বলে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ল অনীক।

সোবাহান মিয়ার দিকে তাকাতেও অনীকের ভয় লাগছে। একটু আগে কুকুরদের খাবার দিতে দেখেছে। লবণ দিয়ে মাখানো কাঁচা মাংস। ওই মাংসও যে গত রাতে বলি হওয়া মেয়েটার তা যে কেউই বুঝবে। এই বাড়ির প্রতিটা প্রাণীই নরখাদক।

নিজের কামরায় এসে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাতে লাগল অনীক। আর এক মুহূর্তও নয় এই পিশাচপুরীতে। ঢাকা ফিরে, বাবা-মাকে জানিয়ে—তাঁদেরকে নিয়ে

BanglaBook.org

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। এই নারকীয় কাণ্ড বন্ধ করতে হবে। এখানে মোবাইল ফোনের নেটওয়র্ক নেই, থাকলে ফোনেই কোনও ব্যবস্থা নেয়া যেত।

অনীক ব্যাগ কাঁধে বাড়ির প্রধান গেটের সামনে গিয়ে দেখে গেট ভিতর থেকে তালাবদ্ধ। গেটে বিশাল একটা তালা ঝুলছে।

অনীক সোবাহান মিয়াকে ডেকে তালা খুলে দিতে বলল।

সোবাহান মিয়া ক্রুদ্ধ চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গেটের চাবি আপনার মামার কাছে। আপনার মামা জেগে ওঠার আগে আপনি যেতে পারবেন না।'

অনীক দৃঢ় গলায় বলল, 'না, আমি এখনই যাব।'

সোবাহান মিয়া ঠোঁটের কোণে এক টুকরো ক্রূর হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, 'বললাম না, আপনার মামা জেগে না ওঠা পর্যন্ত আপনি কোথাও যেতে পারবেন না।'

অনীক বুঝতে পারল জোর-জবরদস্তি করে কিছুই করা যাবে না। এরা সাধারণ মানুষ নয়, পিশাচ শ্রেণীর! এদের সঙ্গে জোর খাটালে উল্টো বিপদে পড়তে হবে। অগত্যা অনীক আবার নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা হবার অপেক্ষা করতে লাগল। কারণ সন্ধ্যার আগে মামা জেগে উঠবেন না।

সন্ধ্যার পরে মামা নিজেই এলেন অনীকের ঘরে।

মামা মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'অনীক, আজ সারা দিনে তুমি নাকি কিছুই খাওনি?'

অনীক ভারাক্রান্ত থমথমে গলায় জবাব দিল, 'আমি চলে যেতে চাই।'

মামা বললেন, 'যেতে চাও যাবে। তোমাকে কেউ আটকে রাখবে না। এত অস্থির হবার কী আছে! আজ রাতের ট্রেনেই সোবাহান গিয়ে তোমাকে উঠিয়ে দিয়ে আসবে।'

BanglaBook.org

অনীক মামার কথা শুনে অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকাল। এত সহজে মামা তাকে যেতে দিচ্ছেন! মামাও এক দৃষ্টিতে অনীকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখে চোখ পড়ল দু'জনার। মামার চোখ দুটি ভারী সুন্দর! ঘন কালো ছায়াময়। অনীক চোখ সরিয়ে নিতে পারল না। কী এক অমোঘ আকর্ষণে তাকিয়েই রইল। অনীকের মাথার ভিতরে ঝিম-ঝিম করতে লাগল। যেন তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।

দশ মিনিট বাদে অনীক সংবিৎ ফিরে পেল। পরক্ষণেই বলল, 'মামা, খুব খিদে পেয়েছে। চলুন, রাতের খাওয়া সেরে ফেলি।'

মামা বললেন, 'চলো, আমি আগেই সোবাহানকে খাবার গরম করতে বলে এসেছি। গত রাতে পাথরঘাটা থেকে হরিণের মাংস এসেছে। টাটকা মাংস! খেয়ে আগের চেয়েও অনেক মজা পাবে।'

অনীক খুশি-হওয়া গলায় বলল, 'মামা, আজ কিন্তু আমি বেশি করে মাংস খাব।'

মামা বললেন, 'খেয়ো, তেরো টুকরো খেয়ো। আমি রোজ রাতে তেরো টুকরোই খাই।'

অনীক বেমালুম ভুলে গেল গত রাতের নরবলি দেবার দৃশ্যের কথা। যেন কেউ তার মাথা থেকে শুধু সেই স্মৃতিটাই মুছে দিয়েছে। তবে আজ রাতের ট্রেনেই সে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

অনীক তাদের ধানমণ্ডির বাড়ির প্রধান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ভোর সোয়া পাঁচটা। চারদিক কোলাহলশূন্য, শান্ত, নীরব। প্রকৃতি জুড়ে ভোরের সতেজ স্নিগ্ধতা।

অনীকের ট্রেন কমলাপুর এসে পৌঁছয় ভোর সাড়ে চারটায়। ট্যাক্সিক্যাব ধরে ধানমণ্ডি পৌঁছতে সোয়া পাঁচটা বেজে যায়।

অনীকের কাছে একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগছে, মোহনপুরে তার মামাবাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে মাত্র দশ দিন–অথচ ঢাকা শহরটাকে তার কাছে কেমন অপরিচিত-অপরিচিত লাগছে! যেন সে অনেক দিন পর ঢাকায় এসেছে। মনে হচ্ছে এই ক'দিনে ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, স্থাপনা... সবকিছুই যেন অনেক বদলে গেছে।

এখনও সূর্য ওঠেনি। ভোরের ম্লান আলোর কারণেই কি অনীকের কাছে এমন লাগছে? সবকিছু অপরিচিত-অপরিচিত! সেটাই হবে হয়তো।

অনীক বেশ কয়েকবার কলিংবেল টিপল। ভিতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির কেউ বোধহয় এখনও জেগে ওঠেনি।

অনীক আরও কয়েকবার কলিংবেল টিপল। কোনও সাড়াই মিলছে না। সে গেটের উপর হাত দিয়ে দুম-দুম শব্দ করতে লাগল। সেই সঙ্গে গলা উঁচিয়ে, 'এই, বাবুল কাকা, বাবুল কাকা...' বলে ডাকতে লাগল।

তাদের ড্রাইভারের নাম বাবুল। বয়স তিরিশ-বত্রিশ। অনীক

BanglaBook.org

তাকে বাবুল কাকা বলে ডাকে। ড্রাইভার বাবুল গ্যারেজ লাগোয়া একটা ঘরে থাকে। গ্যারেজ ঘরটা গেটের কাছাকাছি হওয়ায় অনীক ড্রাইভার বাবুলকে ডাকছে। বাড়ির আর কেউ শুনতে না পেলেও তার শোনার কথা।

অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পর ভিতর থেকে কারও আসার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। যে আসছে সে গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে-করতে এগোচ্ছে, 'কে? কে? কে এল এত ভোর বেলায়?'

অনীক কোনও উত্তর দিল না। লোকটার গলাটা অপরিচিত লাগছে। মনে হচ্ছে ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক কোনও লোক।

গেট খুলে গেল। অনীকের ধারণাই ঠিক—ষাটোর্ধ্ব এক লোক। পরনে লুঙ্গি আর বড় গলার হাফ হাতা পাতলা সাদা গেঞ্জি। মওলানা বা গ্রাম-গঞ্জের বয়স্ক লোকেরা এই ধরনের গেঞ্জি পরে। লোকটার মুখ ভর্তি সাদা চাপ দাড়ি। মাথার চুলেরও বেশিরভাগেরই একই অবস্থা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?'

অনীক বিরক্ত গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কে?'

'আমি এই বাড়ির কেয়ারটেকার।'

অনীক অবাক গলায় বলল, 'দশ দিন আগেও তো আপনাকে দেখে যাইনি! বাড়ির অন্য সবাই কোথায়?'

'আপনি কাদের কথা বলছেন?'

'কাদের কথা আবার! আমার বাবা-মা...ড্রাইভার বাবুল কাকা, তারা সবাই কোথায়?'

অনীকের কথা শুনে লোকটা যেন প্রচণ্ড চমকে গেল। চোখ বড় করে চমকানো গলায় বলল, 'আগে বলুন তো আপনি কে?!'

অনীকের বিরক্তি চরমে উঠেছে। স্বাভাবিক। নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে যদি অপরিচিত কারও এত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়!

BanglaBook.org

অনীক বিরক্তি ভরা গলায় বলতে লাগল, 'আমি এই বাড়ির ছেলে–আবার কে!! আমার নাম অনীক। দশ দিন আগে মোহনপুরে আমার মামার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আপনি কোথা থেকে আমাদের বাড়িতে এসে জুটেছেন সেটাই বুঝতে পারছি না! সরুন তো, সরুন–বাবা-মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব আপনাকে কে কেয়ারটেকারের কাজে রাখল?...'

লোকটার চোখে-মুখে বিস্ময়, আনন্দ, উত্তেজনা সব একই সঙ্গে ফুটে উঠল। চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। ধরা গলায় বলল, 'অনীক বাবা, আপনি?!! এতক্ষণে আপনাকে চিনতে পেরেছি!!! এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন?! কত জায়গায়ই না খোঁজা হয়েছে আপনাকে!!' অনীককে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরও বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার বাবুল কাকা, ড্রাইভার বাবুল কাকা।'

বিস্ময়ে অনীকের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সত্যিই বাবুল কাকাই তো!! সেই একই মুখ! তবে দশ দিন আগে যে বাবুল কাকাকে দেখে গেছে সেই বাবুল কাকা নয়! দশ দিন আগে বাবুল কাকা ছিল তিরিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ান-তাগড়া। ক্লিন শেইভ। এখন সেই বাবুল কাকারই মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি! বয়সের ভারে পর্যুদস্ত চেহারা! মুখে বলিরেখা! পান খাওয়া লাল দাঁত! ...এটা কী করে সম্ভব?!!

অনীক বিস্ময়ে বুজে আসা গলায় বলল, 'সত্যিই আপনি বাবুল কাকা?! না বাবুল কাকার মতই চেহারার অন্য কেউ?'

'হ্যাঁ, অনীক বাবা, আমিই আপনার বাবুল কাকা। আগে বলুন আপনি এত বছর কোথায় ছিলেন?! সাহেব-বেগম সাহেবা কত খোঁজাই না খুঁজলেন আপনাকে!! কোথাও পেলেন না!! কোথায় ছিলেন আপনি?!! আপনার চিন্তায়-চিন্তায়ই তো তাঁরা দু'জন...'

BanglaBook.org

অনীক বাবুল কাকাকে বলে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!! আপনাকে, আপনার কথা-বার্তা–কোনও কিছুরই আগা-মাথা বুঝছি না! সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! দশ দিনে আপনি এমন বুড়ো হয়ে গেলেন কীভাবে?! আমি এত বছর কোথায় ছিলাম, বার-বার এই প্রশ্ন কেন করছেন?! কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!! মাত্র তো দশ দিন বাড়ির বাইরে ছিলাম আমি!'

বাবুল কাকা অবাক বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল, 'কী বলছেন আপনি!! মাত্র দশ দিন আপনি বাড়ির বাইরে ছিলেন?!! তিরিশ বছর কেটে গেছে!! আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আপনি নিখোঁজ হয়েছিলেন।'

অনীকের মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা হলো। কী বলছে এই লোকটা?! এই লোকটা কি সত্যিই বাবুল কাকা? নাকি বাবুল কাকার মত চেহারার বয়স্ক অন্য কোনও লোক? তার সঙ্গে মজা করছে। তিরিশ বছর কেটে গেছে এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়!

অনীক চটে যাওয়া গলায় বলল, 'আপনি আমার সামনে থেকে সরুন, আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেন।'

'আসুন, অনীক বাবা, আসুন। এত বছর ধরে বাড়িটাকে আগলে রেখেছি তো আপনার আসার অপেক্ষায়ই।'

ভিতরে ঢুকে অনীকের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। বাড়ির ভিতরটা মোটেও দশ দিন আগে দেখে যাওয়া সেরকম নয়!! দশ দিন আগে বাড়িটাকে দেখে গেছে নতুন রং করা ঝা-চকচকে। অথচ এখন বাড়িটা জীর্ণ, মলিন, ফিকে রঙের। যেন বহু বছর ধরে বাড়িটা অবহেলায় পড়ে আছে! বাড়ির কোনও যত্ন নেয়া হয়নি! হয়নি রং করানো। বাইরের দেয়ালের কোথাও-কোথাও নোনাধরা আর পলস্তারা খসে পড়া। বাড়ির সামনে পাশাপাশি

BanglaBook.org

দুটো চারা নারকেল গাছ দেখে গিয়েছিল। সেই গাছ দুটো এখন বিশাল রূপ নিয়েছে। যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে! সত্যিই কি তিরিশ বছর কেটে গেছে?! নাকি ভুল করে অন্য কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়েছে?! নাকি দুঃস্বপ্ন দেখছে?! ঘুম ভাঙলেই দেখবে সব ঠিকই আছে।

অনীক বসে-যাওয়া গলায় বলল, 'আমার বাবা-মা কোথায়? তাদেরকে ডাকুন। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না তিরিশ বছর কেটে গেছে! আপনার-আমার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।'

বাবুল কাকা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, 'সাহেব আর বেগম সাহেবা মারা গেছেন তাও তো প্রায় পনেরো-ষোলো বছর হতে চলল। প্রথমে বেগম সাহেবা মারা গেলেন! তার তিন মাসের মাথায়ই সাহেবও মারা গেলেন! আপনাকে হারানোর শোকেই কষ্টে-কষ্টে পাথর হয়ে তাঁরা দু'জন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।'

অনীক পাগলের মত চিৎকার করে উঠল। তার মাথার ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। চোখে জোনাকি পোকা দেখতে লাগল। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

অনীকের জ্ঞান ফিরল নিজের কামরার বিছানায়। এটাই তার থাকার কামরা ছিল। কামরার দেয়ালে তার নিজের বাঁধানো ফটো ঝুলছে। রয়েছে তার পড়ার টেবিল-চেয়ার, কম্পিউটার, বুক শেলফ, আলনা...

কামরার সমস্ত আসবাব আর দেয়ালে ঝোলানো ফটোর দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে যে কেউই বুঝবে বহু বছরের পুরানো ওগুলো। কেমন রঙজ্বলা, ধুলো জমা, ময়লা, ফ্যাকাসে।

অনীকের মাথার কাছে বাবুল কাকা বসা। তার কাছে একটা বিষয় খুবই অদ্ভুত লাগছে, অনীক তিরিশ বছর পর

BanglaBook.org

ফিরেছে–অথচ ওর চেহারা সেই তিরিশ বছর আগেকার মত একই রকম!! যেন এই তিরিশ বছরে অনীকের বয়স একটুও বাড়েনি! বিষয়টা তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ওর যে মানসিক অবস্থা তাতে জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলাচ্ছে না।

অনীককে উঠে বসতে দেখে বাবুল কাকা বলল, 'অনীক বাবা, এখন কেমন লাগছে?'

অনীকের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ভাল।'

'বাবা, আপনি জ্ঞান হারানোর পর বাড়ির সবাই মিলে ধরাধরি করে আপনার নিজের ঘরেই নিয়ে এসেছি। আপনি তো এই ঘরেই থাকতেন। এতদিন ধরে ঘরটা তালাবদ্ধ ছিল। মাঝে-মাঝে খুলে ঝাড়-পোঁছ করা হত। আপনি নিখোঁজ হবার পর সাহেব-বেগম সাহেবা ঘরটাকে আপনি যে অবস্থায় রেখে গেছেন তেমন অবস্থায়ই রাখতে বলেন। আপনার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য।'

অনীক কিছু বলল না। বাবুল কাকা আবার বলতে লাগল, 'সাহেব-বেগম সাহেবার মৃত্যুর পর আমি আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে আপনাদের এই বাড়িতে উঠে আসি। কারণ সাহেব-বেগম সাহেবা মৃত্যুর আগে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, তাঁদের অবর্তমানে আমি যেন এই বাড়িটা দেখে-শুনে রাখি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই কোনও একদিন আপনি ফিরে আসবেন।'

অনীক বিড়বিড় করে বলল, 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তিরিশ বছর কেটে গেছে! নিশ্চয়ই আপনি ভুল বোঝাচ্ছেন। না হয় সবই আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখছি।'

বাবুল কাকা বলল, 'চা-নাস্তা খেয়ে আপনি একটু রেস্ট নেন, ধীরে-ধীরে আপনি নিজেই সত্যিটা বুঝতে পারবেন।'

অনীক বলল, 'আপনি আমার জন্য আজকের একটা পেপার

BanglaBook.org

নিয়ে আসতে পারেন?'

অনীক খবরের কাগজে সন, তারিখ দেখে যাচাই করে নিতে চায় বাবুল কাকার কথা সত্যি কিনা।

বাবুল কাকা বলল, 'আচ্ছা, আমি গিয়ে আপনার জন্য একটা পেপার নিয়ে আসছি। আর আপনাকে নাস্তা দিতে বলছি।'

বাবুল কাকা যাবার পর অনীক চোখ বুজে, দশ দিন আগে মোহনপুরে মামাবাড়ি বেড়াতে যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তাই নিয়ে ভাবতে লাগল। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাচ্ছে না সে। তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে এই হিসেব কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না।

পনেরো-বিশ মিনিটের মাথায় বাবুল কাকা খবরের কাগজ হাতে ফিরে এল। তার সঙ্গে অতি রূপবতী বিশ-একুশ বছর বয়সী একটা মেয়ে। মেয়েটার হাতে ট্রেতে নাস্তা। পরোটা, আলু ভাজি, ডিম পোচ, কলা আর এক গ্লাস ধোঁয়া ওঠা গরম দুধ।

মেয়েটার চোখে চোখ পড়তেই অনীক চমকে উঠল। মনে হলো এই মেয়েটা তার বহুদিনের পরিচিত। এর আগেও বহুবার সে মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

মেয়েটাও একদৃষ্টে কেমন ঘোর লাগা চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবুল কাকা বলে উঠল, 'এই আমার ছোট মেয়ে পারুল। আপনার জন্য নাস্তা নিয়ে এসেছে।'

পারুল যেন তার বাবার কথায় সংবিৎ ফিরে পেল। কোনওক্রমে নাস্তার ট্রে অনীকের বেড সাইড টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ছুটে পালাল।

অনীক বাবুল কাকার হাত থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে সন,

BanglaBook.org

তারিখ দেখল। বাবুল কাকার কথাই ঠিক–মামার বাড়িতে বেড়াতে যাবার দশ দিন পরের তারিখ নয়, তিরিশ বছর পরের তারিখ!

অনীকের মাথাটা আবার চক্কর দিয়ে উঠল। এ কী ঘটেছে তার সঙ্গে?!!

বাবুল কাকা বলল, 'বাবা, নাস্তা সেরে লম্বা একটা ঘুম দেন–দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অনীকের খুব খিদে পেয়েছে। দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনায় মানুষের খিদে বেড়ে যায়। তাই নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে নাস্তা করতে বসল। পরোটা ছিঁড়ে আলু ভাজি পুরে মুখে তুলে চিবুতেই তার বমি পেল। কেমন পচা মাটি-মাটি স্বাদ। খানিকটা ডিম পোচ মুখে দিল–একই স্বাদ! পরোটা, আলু ভাজি, ডিম পোচ আর খেল না। দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল। সেই একই অবস্থা। স্বাদহীন কেমন দুর্গন্ধযুক্ত। যেন নর্দমার নোংরা, পচা পানি।

অনীক নাস্তার ট্রে সরিয়ে নিতে বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে সে পুরো বিষয়টা নিয়ে আবার ভাববে।

BanglaBook.org

পাঁচ

অনীক নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে। বুঝতে পেরেছে কোনও এক অশুভ শক্তির প্রভাবে তার সঙ্গে এই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটেছে। মামাবাড়িতে বেড়িয়ে আসা দশ দিনে পৃথিবীর তিরিশ বছর সময় কেটে গেছে। কিন্তু কেন এমনটা ঘটল সেই রহস্যের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না।

অনীক বাবুল কাকার সঙ্গে বনানী কবরস্থানে গিয়ে মা-বাবার কবর দেখে এসেছে। কবরের পাশে বসে পাগলের মত কান্নাকাটি করেছে। বাবুল কাকা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

বাবুল কাকা অনীকের জন্য যথেষ্ট করছে। খাওয়ায় অনীকের অরুচি দেখে প্রতি বেলায় বিভিন্ন ভাল-ভাল খাবারের আয়োজন করছে। গলদা চিংড়ি, বড়-বড় পাকা কৈ-শিং-মাগুর, বাচ্চা মুরগি, ইলিশ মাছ, গরুর মাংস, খাসির মাংস...কী না ব্যবস্থা করছে! কিন্তু অনীক কিছুই খেতে পারছে না। সবকিছু তার কাছে বিস্বাদ লাগছে। এ ছাড়া শহুরে জীবনও তার কাছে ভাল লাগছে না। বার-বার মনে হচ্ছে মোহনপুরে মামার কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত তার।

রাত সাড়ে বারোটা।

অনীকের হাতে লাল মলাটের একটা ডায়েরি। এটা অনীকের মায়ের লেখা ডায়েরি। মা-বাবার রুম থেকে এই ডায়েরিটা খুঁজে পেয়েছে সে।

ডায়েরিটা লেখা হয়েছে তিরিশ বছর আগে অনীক নিখোঁজ হবার পর। ডায়েরির পাতা জুড়ে অনীককে হারানোর পর তার মায়ের বুক ভাঙা কষ্ট, হাহাকার, বেদনা, হতাশা আর কান্না। ডায়েরিটা পড়তে-পড়তে অনীকের চোখ বেয়ে নামছে অঝোর ধারায় লোনা জলের বন্যা।

ডায়েরির একটা অধ্যায়ে অনীকের মামার কথা উঠে এসেছে। অধ্যায়টা অনীক গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল।

সেই অধ্যায়ে লেখা–

'...আমার অনীক সোনাকে বার-বার নিষেধ করেছিলাম ওর মামার কাছে না যেতে। শুনল না ছেলেটা! ছেলেটা, আমার বড়

BanglaBook.org

ভাইয়ের কাছে বেড়াতে যাবার পর থেকেই নিখোঁজ। খোঁজ নিতে আমরা বড় ভাইজানের বাড়ি মোহনপুরেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর বাড়ির চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি। যেন তাঁর বাড়িটা শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমার ছেলেটাও!

'আমার বড় ভাই নিয়ামত হোসেন পঁয়ত্রিশ বছর আগে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি করতে ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফেরার পর থেকেই তিনি যেন কেমন বদলে যান। স্বভাব, চরিত্র, কথাবার্তা...পুরো মানুষটাই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন সর্বদা হাসি-খুশি আমুদে স্বভাবের। ফেরার পর তিনি হলেন গম্ভীর মেজাজের। কথা বলেন গুণে-গুণে। সারা দিন ঘুমান আর রাতে জেগে থাকেন। আমাদের তিন বোনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। মোহনপুরের অজপাড়াগাঁয়ের এক পুরানো বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন। ধীরে-ধীরে আমাদের তিন বোনের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। যেন তিনি আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাইছেন না। আমরা তিন বোন বুঝতে পারি না ভাইজান কেন অমন নির্বাসিত জীবন বেছে নিলেন।

'একবার শেরাটন হোটেলের এক পার্টিতে ভাইজানের এক ক্লাসমেটের সাথে দেখা হয়। তিনিও ভাইজানের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে পি.এইচ.ডি করতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ভাইজান সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু তথ্য জানতে পারি। ভাইজান পি.এইচ.ডি করতে গিয়ে নাকি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডরমিটরিতে সিট পাননি। তিনি শহর থেকে দূরের শ্রপশায়ার নামে এক গ্রামের ১৩ নং বাসা রজার ভিলায় পেয়িং গেস্ট হয়ে ওঠেন। সেই বাসার মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধ। লোকটার নাম চার্লস টেনিংটন। লোকটা একাই থাকতেন। লোকটা একজন কালো জাদুকর।

BanglaBook.org

ভাইজান বোধহয় সেই বাসায় ওঠার আগে তা জানতেন না। পরে হয়তো ধীরে-ধীরে সব জানতে পারেন। সেই বৃদ্ধ ভাইজানকেও তাঁর দলে ভেড়ান। ভাইজানকে কালো জাদুর দীক্ষায় দীক্ষিত করে তোলেন।

'কালো জাদু চর্চার এক পর্যায়ে নাকি নির্দিষ্ট সময় পর-পর শয়তানের মূর্তির সামনে কুমারী মেয়েদের বলি দিতে হয়। কালো জাদুকররা ওই মূর্তিকে লুসিফারের মূর্তি বলে। বলির রক্ত পেয়ে-পেয়ে নাকি লুসিফার তার উপাসকদের উপর খুশি হয়ে পর্যায়ক্রমে অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্ষমতা দান করে। প্রথমত তারা অমরত্ব লাভ করে। বয়স আটকে যায়। বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সময়কে থামিয়ে দিতে পারে। মানে, মনে হবে মাত্র একদিন পার হয়েছে অথচ দেখা যাবে বাস্তবে এক যুগ পার হয়ে গেছে। যে কোনও মানুষকে সম্মোহন করতে পারে একবার মাত্র চোখের দিকে তাকিয়েই। এমনকী বহুদূর থেকেও স্বপ্নের মাধ্যমে। সম্মোহনের ক্ষমতা ব্যবহার করেই নাকি তারা বলির উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েদের তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। মেয়েটা এক ধরনের ঘোরের মধ্যে নিজেই লুসিফারের মূর্তির সামনে বলি হতে চলে যায়। আর বলি হওয়া মেয়েদের মাংস তারা তাদের প্রভু লুসিফারের দেয়া ভেট হিসেবে খায়।

'এসব জানার পর বুঝতে পারি যে ভাইজান আর সাধারণ মানুষ নেই। তিনি এখন একজন অসম্ভব ক্ষমতাধর কালো জাদুকর। তাই তো ছেলেটাকে বার-বার নিষেধ করেছিলাম তাঁর কাছে বেড়াতে না যাওয়ার জন্য...'

অধ্যায়টা পড়ার পর অনীকও বুঝতে পারে তার সঙ্গে কী ঘটেছে, কেন ঘটেছে, কীসের প্রভাবে আজ তার এই পরিণতি। বুঝতে পারে তার ঠিকানা এখন কোথায়, কোথায় গেলে সে

BanglaBook.org

নিজেকে খুঁজে পাবে।

গভীর রাতে সবার অজান্তে অনীক ব্যাগ গুছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মোহনপুরে তার মামার কাছে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে। ওটাই এখন তার ঠিকানা। ওটাই তার পরিচয়। ওখানেই সে ভাল থাকবে।

বাড়ির প্রধান গেট খুলে বাইরে পা ফেলতে যাবে ঠিক তখন পেছন থেকে খুবই মিষ্টি একটা মেয়েলী কণ্ঠ বলে উঠল, 'আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।'

অবাক চোখে অনীক পিছনে ফিরে দেখে বাবুল কাকার ছোট মেয়ে পারুল ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে। সে অনীকের সঙ্গে যাওয়ার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে বের হয়েছে।

অনীক বলল, 'তুমি কেন আমার সঙ্গে যাবে?!'

পারুল ঘোর লাগা গলায় বলতে লাগল, 'ছোট বেলা থেকেই প্রতি রাতে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে আপনি আমাকে ডাকেন। সেই ডাকের মধ্যে এমন কিছু আছে যে আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয় আমার। ইচ্ছে করে পাগলের মত ছুটে চলে যাই আপনার কাছে। এতদিন আপনার খোঁজ পাইনি বলে যেভাবেই হোক নিজেকে আটকে রেখেছি। আর আমি আপনাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারব না...'

BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তিম লালিমা।

অনীক আর পারুল মোহনপুরে অনীকের মামাবাড়ির পুকুরের বাঁধানো ঘাটলার সিঁড়িতে পাশাপাশি বসে আছে। পারুল খুব সেজেছে। গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে।

শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে কপালে গোলাপি টিপ, কানে গোলাপি পাথর বসানো দুল, হাত ভর্তি গোলাপি রঙের কাঁচের চুড়ি, ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক...তার ফর্সা সুন্দর মুখটাতেও গোলাপি আভা। অপরূপ লাগছে তাকে! যেন স্বর্গের অপ্সরা!

পলকহীন মুগ্ধ চোখে অনীক পারুলকে দেখছে। কুকুরের ঘরের সামনে দিয়ে আসার সময় কুকুরগুলোও অদ্ভুত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল পারুলকে।

আজ অমাবস্যা। আজ রাতে অপ্সরার মত রূপবতী পারুলকে লুসিফারের মূর্তির সামনে বলি দেয়া হবে। বলি দেবার পর তার শরীরের মাংস এই বাড়ির প্রতিটা প্রাণী খাবে। অনীকের মামা, কেয়ারটেকার সোবাহান মিয়া, বাড়ির তেরোটি কুকুর–এরা সবাই পিশাচ শ্রেণীর। এদের কারও মৃত্যু নেই। অনীকও এই পিশাচবাড়ির নতুন বাসিন্দা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মৃত্যু

মাঝ রাত।

রুনুর গায়ে খুব জ্বর। জ্বরের ঘোরে ও প্রলাপ বকছে। রুনুর মা ওর কপালে জলপট্টি দিচ্ছেন। ঘরে হারিকেনের মৃদু আলো। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।

রুনু ক্লাস ফাইভে পড়ে। আজ স্কুল থেকে ফেরার পথে সে ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে বাসায় ফেরে।

পথে তালুকদার বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল। বাড়িটা খালি–পরিত্যক্ত। তালুকদাররা সপরিবারে বেশ কয়েক বছর আগে গ্রাম ছেড়ে ঢাকা চলে গেছে। সেই থেকে বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ওই বাড়িতে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল...এ ধরনের অনেক ফলের গাছ আছে। ঝড়ে অনেকগুলো আম পড়েছিল। রুনু সেই আম কুড়াতে যায়।

আম কুড়াতে-কুড়াতে রুনু এক পর্যায়ে বাড়ির পুরানো কবরস্থানের ভিতরে ঢুকে পড়ে। কবরস্থানের ভিতরেও বেশ কয়েকটা বড়-বড় আম গাছ আছে। হঠাৎ রুনুর কেমন জানি গা ছমছম করতে থাকে। মনে হয় গাছের আড়ালে-আড়ালে লুকিয়ে কেউ তাকে দেখছে আর ফিসফিসে চাপা গলায় ওর নাম ধরে ডাকছে। অথচ তখন আশপাশে কেউই ছিল না। রুনু একাই ছিল। ঝম-ঝম শব্দে ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল। সেইসঙ্গে মাঝে-মাঝে ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি।

BanglaBook.org

ভয় পেয়ে রুনু আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ছুটতে-ছুটতে বাড়ি চলে আসে।

সন্ধ্যার পর গায়ে জ্বর ওঠে। বাড়াবাড়ি ধরনের জ্বর। ঘরে থাকা জ্বরের ওষুধ রুনুকে খাওয়ানো হয়েছে। কিন্তু তাতে জ্বর একটুও কমেনি। এমন অবস্থা যে, ডাক্তার ডেকে আনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঘরে কোনও পুরুষ মানুষ না থাকায় ডাক্তার ডেকে আনা সম্ভব হয়নি। রুনুর বাবা দুবাই প্রবাসী। বাড়িতে শুধু রুনু আর ওর মা রাহেলা থাকেন।

রুনুর মা রাহেলা ভেবে রেখেছেন, ভোরবেলা গিয়ে অনিল ডাক্তারকে ডেকে আনবেন। ভাল ডাক্তার বলতে এই গ্রামে একমাত্র তিনিই। আরও দু'-একজন ডাক্তার আছেন। তাঁরা সব হাতুড়ে ডাক্তার। পাশ করা ডাক্তার নন।

মেয়ের মাথায় জলপট্টি দিতে-দিতে রাহেলা বসা অবস্থায়ই খাটের রেলিঙের সঙ্গে হেলান দিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মেয়ের প্রলাপ বকার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙেছে।

রুনু ভয়-পাওয়া গলায় কাঁদতে-কাঁদতে প্রলাপ বকছে, 'না, আমি যাব না। আমি যাব না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমার ভয় লাগছে! চলে যাও তুমি, চলে যাও...'

রাহেলা ব্যাকুল হয়ে রুনুর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলতে লাগলেন, 'কী হয়েছে, মা, তোর? কী হয়েছে! ভয় পাচ্ছিস কেন? এই তো আমি তোর পাশে আছি...'

যেন মায়ের কথায় আশ্বস্ত হয়েই রুনুর প্রলাপ বকা থেমে গেল।

রাহেলা ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। রুনুর গায়ে জ্বর আরও বেড়েছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। রাহেলা ভেবে পাচ্ছেন না, কী করবেন। ভোরের অপেক্ষা করা ছাড়া তাঁর কিছুই করার নেই।

BanglaBook.org

রুনুর কপালে জলপট্টি দিতে-দিতে রাহেলা আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর মনে হচ্ছে রুনুর খাটের পায়ের দিকে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে! ঠিক মানুষ নয়, মানুষের মতই আকৃতির কালো লম্বা একটা ছায়ামূর্তি। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে সঙ্গে-সঙ্গে চোখ খুললেন। না, কেউ তো নেই খাটের পায়ের দিকটায়! নিশ্চয়ই মনের ভুল! তিনি হাই তুলতে-তুলতে রুনুর কপালে-গালে হাত ছোঁয়ালেন জ্বর দেখার জন্য।

আশ্চর্য! রুনুর গায়ে একটুও জ্বর নেই! অথচ একটু আগেও কী সাংঘাতিক জ্বর ছিল! এখন গা একেবারে ঠাণ্ডা। কপালে-গালে-নাকের ডগায় বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। এর মানে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গিয়েছে।

সকাল সাড়ে আটটা।

রুনুর ঘুম ভেঙেছে। রাহেলা রুনুর কপালে হাত রেখে দেখলেন, না, একটুও জ্বর নেই। গা যেন অতিরিক্ত রকমের ঠাণ্ডা।

গায়ে জ্বর না থাকলেও রুনুর চেহারায় জ্বরের রেশ রয়ে গেছে। মুখখানা ফ্যাকাসে। চোখ দুটো ঘোলাটে, প্রাণহীন। ঠোঁট দুটো শুকনো। চুল আলুথালু। কথা বলছে দুর্বল জড়ানো গলায়।

রাহেলা রুনুর জন্য নাস্তা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। পরোটা, ডিম পোচ, কলা, সুজির পায়স আর এক গ্লাস গরম দুধ।

নাস্তা করানোর জন্য রাহেলা রুনুকে শোয়া অবস্থা থেকে উঠিয়ে খাটের রেলিঙের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসালেন।

রুনু বার-বারই জড়ানো গলায় বলছে, 'না, আমি খাব না। আমি কিচ্ছু খাব না। আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।'

রাহেলা পরোটার টুকরো ছিঁড়ে ভিতরে ডিম পোচের খানিকটা মুড়িয়ে নিতে-নিতে বলতে লাগলেন, 'জ্বর হলে কারওই কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করে না। মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। এর পরও জোর

BanglaBook.org

করে হলেও খেতে হয়। না হলে শরীর ঠিক হবে কী করে?... বলতে-বলতেই ডিম পোচ মোড়ানো পরোটার টুকরো রুনুর মুখে তুলে দিতে চাইলেন।

রুনু কিছুতেই খাবার মুখে নিচ্ছে না। 'না-না' করে মুখ সরিয়ে নিচ্ছে।

রাহেলা আদরমাখা গলায় 'না, মা, এমন করে না! আমার লক্ষ্মী মা। আমার সোনা মা...' বলতে-বলতে রুনুর মুখে ডিম পোচ মোড়ানো পরোটার টুকরো পুরে দিলেন।

রুনু মুখ বিকৃত করে কয়েক চিবুনি দিয়েই ওয়াক করে ফেলে দিল।

রাহেলা বুঝতে পারলেন রুনুকে পরোটা-ডিম পোচ খাওয়ানো যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে সুজির পায়স খাওয়াতে চাইলেন। সুজির পায়সও খাওয়ানো গেল না। সব শেষে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন। দুধও খাওয়ানো গেল না।

দুপুরে রাহেলা রুনুর জন্য আতপ চালের ভাত আর শিং মাছের ঝোল করলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ওকে এক নলা ভাতও খাওয়ানো গেল না।

রাহেলা রাতে পোলাও, ডিম ভুনা আর বাচ্চা মুরগির ঝোল করলেন। রুনু পোলাও খুব পছন্দ করে। ভেবেছিলেন, পোলাও পেলে আগ্রহ করে খাবে। কিন্তু শত পীড়াপীড়ি করেও কিছুই খাওয়াতে পারলেন না।

দু'দিন চলে গেছে।

রুনু যথারীতি কিছুই খাচ্ছে না। রাহেলা ভেবে পাচ্ছেন না কী হলো মেয়েটার! গায়ে জ্বর নেই মোটেও। অথচ না খেয়ে-খেয়ে

BanglaBook.org

শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। চোখের নীচে কালি জমেছে। ঠোঁট দুটোও শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। সমস্ত গায়েই কেমন একটা কালচে ভাব এসেছে। গায়ের চামড়াও শুষ্ক খসখসে রূপ নিয়েছে।

রাহেলা ঠিক করেছেন আজ রুনুকে গোসল করাবেন। গত দু'দিনে রুনুর গোসল হয়নি। ভেবেছেন, গোসল করালে ঠাণ্ডা লেগে যদি আবার গায়ে জ্বর ওঠে। দু'দিন হয়ে গেছে জ্বর যখন আর ওঠেনি—এখন আর ওঠার সম্ভাবনা নেই। বরং গোসল করালে শরীরটা ঝরঝরে লাগবে।

রাহেলা রুনুকে গোসল করাতে নিয়ে এসেছেন। তিনি নিজের হাতে গোসল করাবেন। গ্রামের বাড়ি, পানির ব্যবস্থা উঠানের চাপকল। মেয়েদের গোসলের জন্য কলপাড়ের চারধারে চাটাইয়ের বেড়া দেয়া।

রুনু গোসল করতে চাচ্ছিল না। রাহেলা জোর করে নিয়ে এসেছেন।

রাহেলা রুনুর মাথায় শ্যাম্পু মাখিয়ে দিচ্ছেন। শ্যাম্পুর ফেনা তুলতে রুনুর চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন। আঙুল চালাতে-চালাতে তিনি চমকে উঠলেন। আঙুলের ডগায় রুনুর চুল উঠে আসছে। আশ্চর্য! এভাবে চুল উঠছে কেন? অনেক সময় ক্যান্সারের মত বড় ধরনের অসুখে নাকি মাথার চুল উঠে যায়। রুনুর তো সামান্য জ্বর হয়েছিল, তাতে কেন অতগুলো করে চুল উঠে আসবে?

রাহেলা মাথার চুলে আর আঙুল না চালিয়ে সাবান দিয়ে রুনুর গা ডলতে শুরু করলেন। এ কী অবাক কাণ্ড! গায়ের চামড়াও তো উঠে আসছে!

রাহেলা সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেলেন। কে জানে কোন্ অজানা রোগে পড়েছে তাঁর বাচ্চা মেয়েটা! মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছেন

BanglaBook.org

আজই অনিল ডাক্তারকে এনে দেখাবেন। বিকেলে অনিল ডাক্তার তাঁর চেম্বারে বসেন। ভাল হত যদি রুনুকে চেম্বারে নিয়ে গিয়ে দেখানো যেত। তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ওষুধ-পথ্যও নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু রুনুর যে শারীরিক অবস্থা তাতে অতদূর পায়ে হাঁটিয়ে নেয়া যাবে না।

ঘোর সন্ধ্যা। রাহেলা অনিল ডাক্তারের চেম্বার থেকে ফিরেছেন। চেম্বারে অনেক রোগী থাকায় অনিল ডাক্তার রাহেলার সঙ্গে আসতে পারেননি। বলে দিয়েছেন, সব রোগী দেখা শেষে রাত আটটা-সাড়ে আটটার দিকে এসে রুনুকে দেখে যাবেন।

বাড়ির উঠানে পা রেখেই রাহেলা শুনতে পাচ্ছেন ঘরের ভিতরে রুনু কেমন বিকৃত গলায় ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। সমস্ত বাড়ি ডুবে আছে অন্ধকারে। অথচ তিনি বিকেলে বাসা থেকে বেরোবার আগে, ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে ভেবে রুনুর ঘরে হারিকেন জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর বুকটা ধকধক করছে। এমনিতেই তিনি অসুস্থ মেয়েকে একা বাড়িতে ফেলে যাওয়ায় চিন্তায় অস্থির ছিলেন।

দুরুদুরু বুকে তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। অন্ধকারের মধ্যে, 'রুনু, মা, মা, তোর কী হয়েছে?...' বলতে-বলতে এগিয়ে গেলেন।

রুনু কোনওই সাড়া দিচ্ছে না। কেঁদেই যাচ্ছে। বুকে কাঁপন ধরানো অদ্ভুত কান্না!

তিনি রুনুর ঘরে ঢুকে অন্ধকারে হাতড়ে টেবিলের উপর দেয়াশলাই খুঁজে পেতেই দেয়াশলাই জ্বাললেন। দেয়াশলাই জ্বালতেই তাঁর মনে হলো রুনুর খাটের মাথার দিক থেকে কালো একটা ছায়ামূর্তির মত কী যেন চট করে সরে গেল। রুনুর কান্নার শব্দও থেমে গেল। তাঁর বুকটা ধক করে উঠল। তিনি নিজেকে

BanglaBook.org

সামলে নিয়ে রুনুর দিকে তাকালেন। রুনু গভীর ঘুমে বিভোর।

তা হলে কি এতক্ষণ রুনু ঘুমের মধ্যেই কাঁদছিল?

রাত পৌনে ন'টা।

রাহেলা অনিল ডাক্তারের আসার অপেক্ষা করছেন। এতক্ষণে তাঁর এসে পড়ার কথা ছিল! তিনি কোনও দিনও কাউকে কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করেছেন বলে শোনা যায়নি। ডাক্তার হিসেবে যেমন তিনি ভাল, মানুষ হিসেবেও তেমনি অত্যন্ত ভাল। গ্রামের অসহায় রোগীদের তিনি বিনে পয়সায় চিকিৎসা দেন। কাউকে ফেরান না। বয়স সত্তর পেরিয়েছে অনেক আগেই। এই বয়সেও খবর পেলে সাইকেলে চেপে রোগী দেখতে ছুটে আসেন। গ্রামের সবার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক। রাহেলার মত অল্প বয়সী সব মেয়েদের তিনি 'মা' বলে ডাকেন আর ছেলেদের 'বাবা'।

রাহেলার কেমন ভয়-ভয় লাগছে। সন্ধ্যায় রুনুর মাথার কাছ থেকে কালো ছায়ামূর্তির সরে যাওয়া দেখার পর থেকেই ভয়টা লাগছে। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ওটা মনের ভুল ছিল। এর পরও সেই থেকে তাঁর কেমন জানি গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে এই ঘরে তিনি আর রুনু ছাড়াও কেউ একজন আছে। যে আছে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না! সে শরীরধারী নয়! অশরীরী!

বাইরে অনিল ডাক্তারের সাইকেলের ঘণ্টির টুন-টুন শব্দ পাওয়া গেল।

রাহেলা ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন।

অনিল ডাক্তার সাইকেল রাখতে-রাখতে কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আর বলিস না, মা! আজ এত বেশি রোগী হয়েছিল! আসতে দেরি হয়ে গেল!'

রাহেলা বললেন, 'তাতে কোনও সমস্যা নেই। আপনি যে এত ঝামেলার মধ্যেও মনে রেখে এসেছেন, এতেই আমি অনেক

BanglaBook.org

খুশি হয়েছি।'

'কী বলিস, মা! রোগীর খবর পেলে আমি আসব না!' ঘরের ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে যোগ করলেন, 'আচ্ছা, মা, তোদের বাড়িতে কি কুকুর আছে? উঠানে বিশাল আকৃতির কালো একটা কুকুর দেখলাম। অত বড় কুকুর সাধারণত দেখা যায় না।'

রাহেলা বললেন, 'না তো, আমাদের বাড়িতে কোনও কুকুর নেই। অন্য কারও বাড়ির কুকুর হয়তো আমাদের উঠানে এসে বসেছে।'

রুনু জেগেই আছে। তবে একেবারে মড়ার মত নেতিয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে।

অনিল ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে রুনুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তিনি মুখ অন্ধকার করে চিন্তিত গলায় রাহেলাকে বললেন, 'মা, তোর মেয়ের কী হয়েছে–আমি ঠিক ধরতে পারছি না। কাল ওকে সদরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একটু দেখিয়ে আন। ওখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাল-ভাল যন্ত্রপাতি আছে। ওখানকার ডাক্তাররা নিশ্চয়ই রোগটা ধরতে পারবেন।'

রাহেলা শঙ্কিত গলায় বলে উঠলেন, 'মারাত্মক কিছু হয়নি তো?'

'আরে নাহ! চর্ম রোগ জাতীয় কিছু বোধহয় হয়েছে। সেই জন্যে মাথার চুল, গায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে।'

বলা শেষে অনিল ডাক্তার রাহেলাকে অভয় দেবার জন্য হাসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি হাসতে পারলেন না। হাসি আসার মত মনের অবস্থা তাঁর নেই। তিনি তাঁর এত বছরের ডাক্তারী জীবনে এমন আশ্চর্য আর কোনওদিনও হননি। রুনুর মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, গায়ের চামড়া উঠে আসছে–এগুলো তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তিনি আশ্চর্য হয়েছেন পালস, হার্ট-বিট,

BanglaBook.org

গায়ের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে। কারণ, পালস পাওয়া যায়নি! হার্ট-বিট নেই! শরীরে কোনও উত্তাপও নেই! যেমনটা সাধারণত মৃত মানুষের ক্ষেত্রে হয়। অথচ মেয়েটা জলজ্যান্ত চোখ মেলে চেয়ে আছে। তবে গা থেকেও কেমন মৃত মানুষের মত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে!

প্রতিদিনের মত খুব ভোরবেলা রাহেলার ঘুম ভাঙল। অতি সাবধানে তিনি বিছানা ছেড়ে নামলেন, যাতে তাঁর অসুস্থ মেয়ের ঘুম না ভাঙে। রুনুর ঘুম ভাঙলে পরে ওকে নিয়ে সদরের হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেবেন। অনিল ডাক্তার রাতে যাবার আগে বার-বার বলে গেছেন, আজ যেন অবশ্যই রুনুকে সদরের হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে যান।

রুনুর ঘুম ভাঙার আগেই রাহেলা ঘরের টুকটাক কাজগুলো সেরে ফেলতে চান। যেমন, থালা-বাসন ধোয়া, ঘর ঝাড়ু দেয়া, উঠান ঝাড়ু দেয়া...

রাহেলা উঠান ঝাড়ু দিতে বেরিয়ে দেখেন, বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে অনেক লোকজন দল বেঁধে যাওয়া-আসা করছে। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে-করতে যাচ্ছে তারা।

রাহেলা খুবই আশ্চর্য হলেন। সাধারণত এত ভোরবেলা রাস্তায় তেমন একটা লোকজন চলাফেরা করতে দেখা যায় না। আজ এমন কী ঘটল?!

রাহেলা রাস্তা দিয়ে তাঁদের পাশের বাড়ির মাজেদা খালাকে যেতে দেখে ডাকলেন, 'ও, মাজেদা খালা, মাজেদা খালা, এদিকে একটু আসেন। এত ভোরবেলা রাস্তায় এত লোকজন কেন?! কোনও কিছু হয়েছে নাকি?'

মাজেদা বেগম রাহেলার ডাক শুনতে পেয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে চেঁচিয়ে বললেন, 'তুই কিছু শোনোস নাই?'

BanglaBook.org

রাহেলা চেঁচিয়ে বললেন, 'না, কী ঘটনা?'

'তালুকদার বাড়ির সামনে অনিল ডাক্তার মইর‍্যা পইড়্যা রইছে।'

রাহেলা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। থমকে তোতলাতে-তোতলাতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তালুকদার বাড়ির সামনে কী হয়েছে?'

'অনিল ডাক্তার আছে না, অনিল ডাক্তার–মইর‍্যা রাস্তায় পইড়্যা রইছে।'

'কী বলেন, খালা!!! কী করে মারা গেলেন?!'

'আর কইস না! কাইল রাইতে মনে হয় রোগী দেইখ্যা বাড়ি ফেরার পথে কোনও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সামনে পড়ছিল। হারা গা নকের আঁচরে চেরা-বেরা। গায়ের এহানে-ওহানে খাবলা-খাবলা মাংস নাই। লাশের দিক চাওন যায় না! ডর লাগে!'

অনিল ডাক্তারের মৃত্যুর খবর শুনে রাহেলার মাথা কেমন চক্কর মারছে। তা হলে কি গত রাতে তাঁদের বাড়ি থেকে ফেরার পথেই অনিল ডাক্তার হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের খপ্পরে পড়েছিলেন?

মাজেদা বেগম বলে উঠলেন, 'রাহেলা, যাই তয় অহন। তোগো বাড়ি দিয়া মরা-পচা গন্ধ আইতেছে কীসের?'

রাহেলা বসে-যাওয়া গলায় বললেন, 'কই, আমি তো কোনও গন্ধ পাচ্ছি না!'

মাজেদা বেগম মুখ ঝামটা মেরে বললেন, 'নাকে কি তুলা দিয়া আছস? ইন্দুর মরা গন্ধের লাহান গন্ধে খাড়ান যাইতেছে না!'

মাজেদা বেগম চলে যাবার পর রাহেলা ঝিম ধরা অবস্থায় ঘরের ভিতরে ঢুকলেন, রুনুকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য।

অনেক ঠেলাঠেলির পরও রুনু ঘুম থেকে জাগছে না। ওর দেহ কেমন শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। রাহেলার বুঝতে বাকি

BanglaBook.org

রইল না যে, তাঁর মেয়েটা মারা গেছে!

রাহেলার চিৎকার করে কান্নার শব্দে দেখতে-দেখতে অনেক লোকজনে বাড়ি ভরে গেল। সবাই রুনুর লাশের গন্ধে নাক চাপা দিচ্ছে আর অবাক হয়ে ভাবছে, তিন-চারদিন আগে মারা যাওয়া মেয়ের মা কিনা সবে আজ বুঝতে পারলেন তাঁর মেয়ে যে মারা গেছে!!!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রেয়সী

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তিথি কলেজের লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছে। বৃষ্টি থামলে বাড়ি যাবে। কলেজের আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছে। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে।

তিথি উদ্ভিদবিজ্ঞানের (অনার্স) প্রথম বর্ষের ছাত্রী। অত্যন্ত নম্র-ভদ্র-লাজুক স্বভাবের মেয়ে। আজকালকার আধুনিকদের সঙ্গে সে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না। তাই সবার কাছ থেকে দূরে-দূরে থাকে। ক্লাসে অন্যান্যরা বারান্দার মাঝ বরাবর জটলা পাকিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। সে সবার থেকে আলাদা। বারান্দার এক মাথায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তিথিদের ক্লাসে তার মত আরও একজন আছে। সে-ও তিথির মত বারান্দার অন্য প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। উদাস হয়ে কী যেন ভাবছে। দেখে মনে হচ্ছে আশপাশের কোনও কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। সে নিজের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার নাম রিফাত।

রিফাত ছেলেটা বড়ই অদ্ভুত। কারও সঙ্গে মেশে না। সব সময় কী নিয়ে যেন ভাবে। মাঝে-মাঝে নিজে নিজেই একা-একা কথা বলে। মনে হয় যেন অদৃশ্য কারও সঙ্গে কথা বলছে। ক্লাসমেটদের কারও সঙ্গে তার কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই। কেউ তার সঙ্গে মিশতে চাইলে এড়িয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েদের।

BanglaBook.org

ছেলেদের সঙ্গে যা-ও দু'-একটা কথাবার্তা হয়, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে একদমই মেশে না। কোনও মেয়ে তার আশপাশে গেলেও যেন পালিয়ে বাঁচে।

অথচ রিফাতের চেহারা অত্যন্ত সুন্দর। একেবারে রাজপুত্রের মত দেখতে। গায়ের রঙ দুধে-আলতা। এমন সুদর্শন চেহারার পুরুষ সাধারণত কমই দেখা যায়। প্রথম দেখায়ই যে কোনও মেয়ের নজর কেড়ে নেয়। মেয়েরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। কিন্তু কোনও মেয়েকেই সে মোটেও পাত্তা দেয় না। তার প্রতি সব মেয়েদের এক ধরনের দুর্বলতার কারণে বোধহয় অন্যান্য ছেলেরা তাকে হিংসে করে। তার নামে বিভিন্ন কুৎসা রটায়। ওর মাথায় দোষ আছে, স্ক্রু ঢিলা, আঁতেল একটা...এসব।

রিফাতের কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সব মেয়েরা তার প্রতি দুর্বল বা সব ছেলেরা তাকে হিংসে করে–এসব কিছুতেই তার গা নেই। সে নিজের মনে নিজেকে নিয়ে থাকে।

তিথির গায়ের রঙ শ্যামলা। চেহারাও তেমন একটা ভাল নয়। গড়পড়তা বাঙালি চেহারা। চেহারা নিয়ে বড়াই করার মত কিছুই নেই। অন্যান্য শ্যামলা মেয়েদের মত গায়ের রঙ আরেকটু উজ্জ্বল করার জন্য রোজ-রোজ মুখে রঙ ফর্সাকারী ক্রিম ঘষতে হয়। কিন্তু ওর মনটা আকাশের মত বিশাল। ওর বিশাল মনটা জুড়ে আজকাল একজনের মুখ খুব ভেসে ওঠে। সে হচ্ছে রিফাত। তিথি মনের কথা মনেই লুকিয়ে রাখে। প্রকাশ করার সাহস বা যোগ্যতা কোনওটাই তার নেই। কলেজের সবচেয়ে সুন্দরীরা পর্যন্ত রিফাতের পিছনে লাইন মেরে পাত্তা পায় না। সেখানে তার মত অতি সাধারণ চেহারার কোনও মেয়ে যে কখনও সুযোগ পাবে না, তা বোঝাই যায়।

BanglaBook.org

তিথি লক্ষ করল, ক্লাসমেটরা আড়ে-আড়ে রিফাতের দিকে

তাকাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। কী ব্যাপার? তিথি ভালভাবে রিফাতের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। ক্লাসমেটদের হাসাহাসির কারণ সে খুঁজে পেল। রিফাতের পিঠে একটা কাগজ সাঁটা। সেই কাগজে লেখা, 'আমার স্ক্রু ঢিলা'। রিফাত ব্যাপারটা টের পায়নি। তিথি ক্লাসমেটদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারল, কাজটা করেছে রনি। রনি ক্লাসের সবচেয়ে বখাটে ছেলে। এমনটা সে প্রায়ই করে। একদিন তিথির সঙ্গেও এমনটা করেছে। তিথির পিঠে 'আমাকে চুমো খাও' লিখে সেঁটে দিয়েছে। কী লজ্জার ব্যাপার! কলেজ থেকে ফেরার পথে রাস্তার লোকজন ওর দিকে কেমন-কেমন করে যেন তাকিয়েছে, মুখ টিপে হাসাহাসি করেছে। বাসায় ফিরে পিঠে সাঁটা সেই কাগজ দেখতে পেয়ে ওর বুক ফেটে কান্না পেয়েছে।

তিথি রিফাতের দিকে এগিয়ে গেল। রিফাত যেন এই জগতে নেই। সে ভাবনার জগতে কোথায় যেন হারিয়ে আছে।

তিথি রিফাতের পিঠ থেকে 'আমার স্ক্রু ঢিলা' লেখা সাঁটানো কাগজটা টেনে খুলে ফেলল। রিফাত চমকে উঠল। পিছনে ঘুরে তিথিকে দেখে থতমত গলায় বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, তুমি আমার পিঠে হাত রাখলে কেন?'

তিথি কাগজটা রিফাতের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা তোমার পিঠে লাগানো ছিল, খুলে দিলাম।'

রিফাত কাগজটা হাতে নিয়ে লেখাটা পড়ে, মুখ বেজার করে বলল, 'কে এই কাগজ আমার পিঠে লাগাল?'

'রনি।'

ওদিকে ক্লাসমেটদের জটলায় হাসাহাসির ঝড় উঠেছে। রিফাত তাদের দিকে এগিয়ে গেল। রনির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থমথমে গলায় বলল, 'এটা তুমি কেন করলে?'

রনি তেড়া গলায় বলল, 'ইচ্ছে হয়েছে, করেছি। কাগজে কী

BanglaBook.org

কোনও ভুল কথা লেখা হয়েছে?'

রিফাত কঠিন গলায় ধমকে উঠল, 'এমনটা তুমি প্রায়ই করছ, কী পেয়েছ? বাথরুমের দেয়ালে আমার ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকে রেখেছ!'

কলেজের বাথরুমের দেয়ালে ইটের টুকরো দিয়ে রনি রিফাতের একটা ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকে রেখেছে। ছবিটা এমন–রিফাত সাধারণত চশমা চোখে মাথা নুইয়ে যেভাবে চলা-ফেরা করে ঠিক তেমন। শুধু রিফাতের পরনে পোশাক নেই। রিফাত দু'হাতে লজ্জাস্থান চেপে ধরে যাচ্ছে। পেছনে কয়েকটা মেয়ে দাঁড়ানো। মেয়েগুলো ওড়নায় মুখ চেপে হাসাহাসি করছে। ছবির নীচে লেখা, 'নেংটু মশাইকে কি চিনতে পারছেন? আমাদের স্ক্রু ঢিলা রিফাত!'

রনি বেপরোয়া গলায় বলল, 'ইচ্ছে হয়েছে, এঁকেছি, আরও আঁকব–তুই কী করবি আমার?'

রিফাত শান্ত গলায় বলল, 'আমি প্রিন্সিপাল স্যরকে জানাব।'

রনি চটে উঠে প্রচণ্ড জোরে রিফাতের বুকের উপর একটা ধাক্কা মেরে বলল, 'যা, গিয়ে জানা তোর প্রিন্সিপাল বাপকে।'

ধাক্কা মারায় রিফাত ছিটকে পড়ে গেল। তিথি ছুটে গিয়ে রিফাতকে ধরে ওঠাল। উঠে দাঁড়িয়ে রিফাত কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে রনির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বারান্দা থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে-ভিজতে কলেজ কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

রাত পৌনে তিনটা।

রনি তার শোবার ঘরে। মাত্র বিছানায় শুয়েছে। এতক্ষণ সে ইণ্টারনেটে চ্যাটিং করায় ব্যস্ত ছিল। তার চ্যাটিং করা মানে বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতদের ফেসবুক আইডিতে অশ্লীল নোংরা ছবি পোস্ট করা।

BanglaBook.org

ঘর অন্ধকার। রনি শুয়ে-শুয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবছে, তিথিকে কীভাবে একটা শিক্ষা দেয়া যায়। আজ তিথি রিফাতের জন্য যেভাবে দরদ দেখিয়েছে, তাতে রাগে তার গা জ্বলে গেছে। মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। বাথরুমের দেয়ালে রিফাতের যে নেংটা অবস্থার ছবি রয়েছে, সেই ছবির পাশে তিথিরও একটা ছবি আঁকবে। ছবিটা এমন হবে, তিথি তার গায়ের ওড়না খুলে দু'হাতে মেলে ধরে যেন ছুটে যাচ্ছে রিফাতের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য। ছবিতে তিথির ওড়না ছাড়া বুক জোড়া আঁকবে অস্বাভাবিক বড়-বড় করে। বাংলা ছবির নায়িকাদের মত। তা-ও আবার গায়ে যেন পাতলা ফিনফিনে জামা। জামার উপর দিয়ে শরীরের রেখাগুলো যেন স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

আজেবাজে ছক কষতে-কষতে রনির চোখে ঘুম চলে এসেছে। সে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে রুমের ইলেকট্রিক বোর্ড থেকে অদ্ভুতভাবে নিজে-নিজেই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে একটা ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া তারের মাথাটা সাপের মত লক-লক করে রনির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ইলেকট্রিসিটি সহ তারের মাথাটা এগিয়ে আসছে রনিকে স্পর্শ করার জন্য।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রনির মৃত্যুতে তার ক্লাসমেটদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। সবাই খুব কষ্ট পায়। সমবয়সী কেউ মারা গেলে মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

রনির মৃত্যুর পর প্রায় মাস তিনেক কেটে গেছে।

তিথিদের ক্লাসে অন্য কলেজ থেকে ট্রান্সফার হয়ে নতুন একটা মেয়ে এসেছে। নতুন মেয়েটার নাম লিলি। লিলির সাজ-পোশাক খুবই উগ্র। কথাবার্তা, আচরণে ওভার স্মার্ট। বেপরোয়া স্বভাব। বলা যায় উচ্ছৃঙ্খল একটা মেয়ে। প্রথম দেখাতেই সে রিফাতের প্রেমে পড়ে যায়। অন্য সবার মত তাকেও রিফাত মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না। লিলি নাছোড়বান্দা। সারাক্ষণই রিফাতের পেছনে আঠার মত লেগে থাকে।

কলেজের লাইব্রেরী রুম। কলেজ ছুটি হয়েছে অনেকক্ষণ। রিফাত এক কোণের টেবিলে বসে গভীর মনোযোগে কী একটা বই পড়ছে। অন্যান্য টেবিলে আরও বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। তিথিও একটা টেবিলে বসা। তিথির বাসায় ফেরার তাড়া ছিল। এরপরও ও লাইব্রেরীতে পড়ে আছে শুধুমাত্র রিফাতের জন্য। রিফাত যতক্ষণ থাকবে, সে-ও থাকবে। দূর থেকে মন ভরে রিফাতকে দেখবে। আজকাল এক মুহূর্তের জন্যও রিফাতকে চোখের আড়াল হতে দিতে ইচ্ছে করে না তার। ইচ্ছে করে সারাক্ষণ রিফাতের কাছাকাছি থাকতে। কলেজ শেষে রিফাত যখন চলে যায়, সে-ও মুখ ভার করে বাড়ির পথ ধরে—তখন তার বুক ফেটে কান্না পায়। বুকের ভিতরটা শূন্যতায় ছেয়ে যায়। মনে-মনে অপেক্ষার পালা শুরু হয়, আগামীকাল কখন আবার কলেজে এসে রিফাতকে দেখতে পাবে। সে কাউকে এসব বুঝতে দেয়

BanglaBook.org

না। নিজের ভিতরই চাপা দিয়ে রাখে।

লাইব্রেরী রুমে লিলিও আছে। সে-ও আড়ে-আড়ে রিফাতের দিকে তাকাচ্ছে। আর নিজের মনে মুচকি হাসছে। তিথি ব্যাপারটা লক্ষ করছে। লিলিকে দেখে মনে হচ্ছে তার মনের ভিতর কোনও দুষ্ট বুদ্ধি খেলা করছে।

লিলি চেয়ার ছেড়ে উঠে রিফাতের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। রিফাতের একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। ব্যাপারটা রিফাত টের পায়নি। সে বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে।

হঠাৎ লিলি অকল্পনীয় একটা কাজ করল। ঝুঁকে, চপ করে রিফাতের গালে একটা চুমু খেল। রিফাত চমকে লাফিয়ে উঠল। আরেকটু হলেই চেয়ার উল্টে পড়ে যেত। কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লিলির দিকে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই হাত দিয়ে গালের চুমু দেয়া স্থানটা মুছতে-মুছতে হুংকার দিয়ে উঠল, 'এটা তুমি কী করলে?! কী করলে এটা?!'

রাগে এবং লজ্জায় রিফাতের সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে। লিলি হাসতে-হাসতে, 'তোমার লজ্জা ভাঙালাম। এখন তুমিও আমাকে একটা চুমু খাও,' এই বলে রিফাতের সামনে মুখ বাড়িয়ে ধরল।

রিফাত ছিটকে পিছনে সরে গেল। রাগে তোতলাতে-তোতলাতে বলল, 'তোমার মত অসভ্য-বেহায়া মেয়ে জীবনেও দেখিনি।'

রিফাত আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ঝড়ের বেগে লাইব্রেরী রুম থেকে বেরিয়ে গেল। লিলি সমস্ত শরীর দুলিয়ে খল-খল করে হাসতে-হাসতে নিজে-নিজেই বলল, 'একদিন তোমাকে ঠিকই বাগে আনব।'

লিলির কাণ্ড দেখে তিথির মাথায় রক্ত উঠে গেছে। খুব ইচ্ছে করছে লিলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, দু'হাতে লিলির গলা চেপে

BanglaBook.org

ধরতে। কিন্তু তার মত লাজুক একটা মেয়ের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

লিলি কলেজ থেকে ফিরে বাথরুমে শাওয়ার নিচ্ছে। হিমশীতল পানির ধারার পরশে আরামে তার চোখ বুজে এসেছে। সে চোখ বন্ধ অবস্থায় গুন-গুন করে গান গাইছে আর আজ কলেজে রিফাতের সঙ্গে যে কাণ্ডটা করেছে তাই নিয়ে ভাবছে। চুমু খাওয়ার মুহূর্তটার কথা বার-বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবতে তার অসম্ভব ভাল লাগছে। রিফাতের ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মুখের কথা মনে পড়ে খুব হাসি পাচ্ছে। নিঃশব্দে মুখ টিপে-টিপে হেসেও উঠছে।

নিঃশব্দে বাথরুমের ভিতর আরও একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে। লিলির বন্ধ চোখের সামনের দেয়াল ফুঁড়ে দুটো ভৌতিক হাত বেরিয়ে আসছে। হাত দুটো ছোপ-ছোপ কালো দাগে ভরা। মোটা-মোটা গাঁটযুক্ত অস্বাভাবিক লম্বা-লম্বা আঙুল। আঙুলের মাথায় পাখির ঠোঁটের মত সামান্য বাঁকানো তীক্ষ্ণ লম্বা নখ।

হাত দুটো ক্রমেই লম্বা হয়ে এগিয়ে আসছে লিলির গলা লক্ষ্য করে। এখনই পাশবিক নিষ্ঠুরতায় লিলির গলা চেপে ধরবে। হাত দুটোর তীক্ষ্ণ নখগুলো এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবে লিলির গলা। রক্তে ভেসে যাবে তার সমস্ত শরীর। দম বন্ধ হয়ে আসা লিলি কাটা মুরগির মত ছটফট করতে-করতে ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাবে। তাতেও ক্ষান্ত হবে না হাত দুটো। চেপে ধরা গলা ছেড়ে, দুটো হাতের দুটো তীক্ষ্ণ নখযুক্ত আঙুল লিলির ঠোঁটের দুই কোনা দিয়ে মুখের ভিতর ঢুকিয়ে, আসুরিক শক্তিতে টেনে দুই কানের লতি পর্যন্ত চিরে ফেলবে।

লিলির অদ্ভুত রহস্যজনক মৃত্যুর কোনও কারণ পাওয়া যায়নি।

BanglaBook.org

বন্ধ বাথরুমে কীভাবে লিলির অমন নৃশংস মৃত্যু হলো এর কোনও জবাব মেলেনি।

রনির মৃত্যুর পর ক্লাসমেটরা সবাই যেভাবে ভেঙে পড়ছিল, লিলির মৃত্যুতেও তাই হলো। কিন্তু কারও জন্য কোনও কিছু বেশি দিন থেমে থাকে না। ধীরে-ধীরে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

তিন

জমির স্যারের ক্লাস চলছে।

জমির স্যর অত্যন্ত রগচটা স্বভাবের। তাঁর ক্লাসে কাউকে অমনোযোগী দেখলে তিনি অসম্ভব খেপে যান। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই তাঁর ক্লাসে খুব শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে।

রিফাত ক্লাসের একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসা। বেঞ্চে সে একাই। তার পাশে কেউ বসা নেই। সে ভীত চোখে বার-বার তার পাশের বেঞ্চের খালি জায়গাটার দিকে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা জমির স্যরের চোখ এড়ায়নি। তিনি কিছু বলছেন না। তিনি জানেন যে রিফাতের কিছু মানসিক সমস্যা রয়েছে।

হঠাৎ রিফাত তার পাশে বেঞ্চের খালি জায়গার দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে অদৃশ্য কাউকে বলছে, 'তোমাকে বলছি না, এখান থেকে যাও তুমি। সারাক্ষণ আমার কাছে কী চাও? যাও এখান থেকে, যাও।'

আর সইতে পারলেন না জমির স্যর। তিনি রিফাতকে উদ্দেশ্য করে হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'এই, ছেলে, দাঁড়াও।'

রিফাত কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়াল। জমির স্যর গর্জে উঠলেন,

BanglaBook.org

'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?'

রিফাত ইতস্তত গলায় বলল, 'না, স্যর, কেউ না।'

'কেউ না মানে? ক্লাসের সবাই শুনল, তুমি চেঁচিয়ে সমস্ত ক্লাস মাথায় তুললে।'

'স্যর, ভুল হয়ে গেছে! আর এমনটা হবে না।'

'ভুল হয়ে গেছে! তুমি তো প্রায়ই এমন উদ্ভট আচরণ করো। ক্লাসের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর তোমার জন্য ডিস্টার্ব হয়। এটা কোনও পাগলা গারদ নয়। এখানে ক্লাস চলছে। আমি প্রিন্সিপাল স্যরকে বলব টি.সি. দিয়ে তোমাকে যেন কলেজ থেকে বের করে দেয়।'

রিফাত হাহাকার করে উঠল, 'না, স্যর, এমনটা করবেন না! আমার ভুল হয়ে গেছে! স্যর, আপনার পায়ে পড়ি! প্লিজ, স্যর...'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আপাতত তুমি আমার ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও। তোমাকে যেন আর কখনও আমার ক্লাসে না দেখি। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।'

রিফাত মাথাটা নিচু করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনা তিথির চোখের সামনে ঘটল। রিফাতের জন্য তিথির ভয়ানক মন খারাপ লাগছে। তার কান্না পাচ্ছে। জমির স্যরের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। তিনি রিফাতকে এতটা অপমান না করলেও পারতেন। কাল থেকে তিথিও আর জমির স্যরের ক্লাস করবে না।

রাত সোয়া বারোটা।

বন্ধুর বাসা থেকে দাওয়াত খেয়ে ফিরছেন জমির স্যর। শহরতলি এলাকা। রাস্তা-ঘাট জনমানবশূন্য। আশপাশটা কেমন খাঁ-খাঁ করছে। রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা-ফাঁকা যা-ও দু'-একটা বাড়ি-ঘর আছে সেগুলোর আলো নিভে গেছে। ল্যাম্পপোস্টের মরা আলোই পথচলার একমাত্র সম্বল। তাও আবার বেশ কয়েকটা

BanglaBook.org

ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে না। রাস্তায় একটাও খালি রিকশা বা কোনও যানবাহনের দেখা মিলছে না। পায়ে হেঁটেই ফিরতে হচ্ছে জমির স্যরকে।

বড় রাস্তার মোড় ঘুরতেই জমির স্যর লক্ষ করলেন, একটা কুকুর তাঁর পিছু নিয়েছে। বিশাল আকৃতির কালো রঙের একটা কুকুর। কুকুরটার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। গলা দিয়ে বেরোচ্ছে ঘড়-ঘড় শব্দ। পাগলা কুকুর বোধহয়।

কুকুরটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে জমির স্যরের পিছু-পিছু আসছে। ব্যাপারটা জমির স্যরের ভাল লাগছে না। ভয়ে তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করছে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। দৌড়ে পালাবেন? না, সেটা করা ঠিক হবে না। ক্ষ্যাপা কুকুরের সামনে কখনও ছুটতে নেই। বার-বার পিছনে তাকানোও ঠিক হচ্ছে না। তার চেয়ে ধীরে-সুস্থে হেঁটে যাওয়াই ভাল।

জমির স্যর পিছনে আর না তাকিয়ে হাঁটছেন। ভয়ঙ্কর একটা পাগলা কুকুর পিছু-পিছু এগিয়ে আসছে এই আতঙ্কে তাঁর পা কেমন জমে আসছে তিনি অতি কষ্টে শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে পা চালাচ্ছেন। পিছন থেকে আসা কুকুরের গলার ঘড়-ঘড় আওয়াজ ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে কুকুরটা তাঁর পিছনে তিন-চার হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। পিছনে তাকাবেন কী তাকাবেন না ভাবতে-ভাবতে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে ফেললেন। অমনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুকুরটা লাফ দিয়ে প্রায় উড়ে এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গলায় কামড় বসিয়ে রাস্তায় চিত করে ফেলল। মুহূর্তে শ্বাসনালীটা এক কামড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

চার

পাগলা কুকুরের আক্রমণে জমির স্যারের মৃত্যুর পর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। জমির স্যারের জায়গায় নতুন একজন স্যার যোগ দিয়েছেন। সবকিছু আবার আগের মত স্বাভাবিক নিয়মে চলছে।

আজ তিথির জন্য অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটেছে। তিথি কলেজের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নামছিল। ওদিকে রিফাত সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। রিফাত মুখের সামনে একটা বই মেলে ধরে সামনে না তাকিয়েই উঠছিল। কীভাবে যেন তিথির সঙ্গে রিফাতের ধাক্কা লেগে গেল। একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ। রিফাতের হাত থেকে বইটা ছিটকে পড়ে। তিথিও হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল। তার আগেই রিফাত নিজেকে সামলে নিয়ে তিথিকে দু'হাতে আগলে ধরে। নির্ঘাত সিঁড়ি থেকে পড়ে সাংঘাতিক কিছু ঘটা থেকে তিথিকে রক্ষা করে। প্রাথমিক হতবিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠে তিথি যখন নিজেকে আবিষ্কার করে রিফাতের দু'হাতের আগলে ধরা অবস্থায়, তিথির সমস্ত শরীরে শিহরণের ঢেউ খেলে যায়। কয়েক মুহূর্তের ঘটনা। রিফাত সঙ্গে সঙ্গে তিথিকে ছেড়ে দিয়ে অপ্রস্তুত গলায় বলে ওঠে, 'সরি!'

তিথিও থতমত গলায় বলে, 'ভুলটা আমারই! কীভাবে যে তোমার গায়ের উপর এসে পড়লাম!'

রিফাত বলে, 'না, না, তোমার কোনও ভুল নেই। আমিই তো বই মেলে ধরে সামনে না তাকিয়ে উঠছিলাম।'

BanglaBook.org

তিথি ঝট করে নুয়ে রিফাতের হাত থেকে পড়ে যাওয়া বইটা সিঁড়ির উপর থেকে তুলে, বইটা রিফাতের দিকে বাড়িয়ে ধরে লাজুক গলায় বলে, 'তোমার কোথাও ব্যথা লাগেনি তো?'

রিফাত বইটা হাতে নিতে-নিতে বলে, 'না, কোথাও ব্যথা লাগেনি।'

ঘটনা এটুকুই। এরপর তিথি নীচে নেমে আসে। রিফাত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। কিন্তু এতেই তিথির মনের ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত তনু-মন! সেই থেকে মাথার ভিতর ঝিমঝিম করছে। বুকের ভেতর অকারণে ধুক-পুক করছে। রিফাতের স্পর্শের কথা কিছুতেই সে মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। মুহূর্তটা যেন বার-বার ফিরে-ফিরে আসছে। সেই মুহূর্তে রিফাত কত কাছে ছিল তার! রিফাতের গায়ের পুরুষালী ঘ্রাণটা পর্যন্ত নাকে এসে লেগেছে।

তিথি তাদের বাড়ির ছাদের রেলিঙে পা ঝুলিয়ে বসা। বসে-বসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কলেজের সিঁড়িতে রিফাতের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার মুহূর্তটাই ভেবে যাচ্ছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আজান হবে।

হঠাৎ তিথি চমকে উঠল। মনে হলো তার ঘাড়ের পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড়ের উপর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। অথচ পুরো ছাদে সে একা। চট করে মাথাটা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। না, কেউ নেই। নিশ্চয়ই মনের ভুল। এমন সময় মাগরিবের আজান দিল। সে মাথায় ওড়না দিয়ে রেলিং থেকে নেমে পড়ল। এখন আর সে ছাদে থাকবে না। মাগরিবের আজানের পর মেয়েদের ঘরের বাইরে থাকা উচিত নয়। খারাপ কিছুর নজর লাগতে পারে। ছাদ থেকে নেমে, অজু করে মাগরিবের নামাজ আদায় করবে।

BanglaBook.org

মাগরিবের নামাজ শেষে তিথি পড়ার টেবিলে পড়তে বসল। তিথি ছাড়া বাসায় আর কেউ নেই। বিকেলে তিথির বড় ভাই তাদের মাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেছেন। কয়েকদিন ধরে মায়ের শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে। ভাবিও বাসায় নেই। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাবার বাড়ি বেড়াতে গেছেন।

তিথির পড়ায় মন বসছে না। ঘুরে-ফিরে কলেজের সিঁড়িতে রিফাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগার মুহূর্তটা শুধু মনে পড়ছে। সেই মুহূর্তে রিফাত পলকহীন চোখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে-ও এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখে চোখ রেখেছিল দু'জনে। অথচ তিথির কাছে মনে হচ্ছে, চোখে চোখ রেখে যেন কয়েক যুগ কাটিয়েছে।

তিথি চেয়ার ছেড়ে উঠে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল। আয়নায় নিজের চোখে চোখ রাখল। তার চোখ দুটি সুন্দর। টানা-টানা মায়াকাড়া। রিফাত কী আজ তার এই চোখের দিকে তাকিয়ে একটুও বুঝতে পারেনি, সে যে রিফাতকে কতটা ভালবাসে?! বুঝতে পারেনি, রিফাতের জন্য সে যে ভিতরে-ভিতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে?!

হঠাৎ তিথির বুকটা ধক করে উঠল। আয়নায় দেখল, তার পিছনে কালো লম্বা ছায়ামূর্তির মত কী যেন একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। না, কেউ তো নেই! তার আর আয়নায় নিজেকে দেখার সাহস হলো না। যদি আবার সে ওই কালো ছায়াটাকে দেখতে পায়।

তিথি আবার গিয়ে পড়ার টেবিলে বসল। ঠিক তখনই যেন রুমের ভিতর ঝড় উঠল। খোলা জানালার কপাট দড়াম করে ভয়ঙ্কর শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তিথি আচমকা ভয় পেয়ে একেবারে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই জানালার কপাট দুটো আবার খুলে গিয়ে

BanglaBook.org

প্রচণ্ড দাপাদাপি করতে লাগল। সেই সঙ্গে ঘরের ছোট-বড় সব রকমের জিনিসপত্র উড়ে-উড়ে মেঝেতে পড়তে লাগল। সেলফ থেকে বই, আলনা থেকে জামা-কাপড়, ড্রেসিং-টেবিলের উপরের স্নো, পাউডার, লিপস্টিক সহ বিভিন্ন প্রসাধনীর কৌটা, টেবিলের উপরের কাঁচের জগ-গ্লাস, দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার, দেয়ালঘড়ি...সবকিছু। ভারী ফুলদানীটা ঢিলের মত তিথির দিকে ছুটে এল। একটুর জন্য তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল। ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ঘরের সবকিছুই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেতে লাগল। এক পর্যায়ে সিলিংফ্যানটাও খুলে পড়ল। একটুর জন্য তিথির গায়ে পড়ল না। রুমের বাল্বটাও বিকট শব্দে বার্স্ট হয়ে গেল। চোখের পলকে অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো রুম। তিথি আতঙ্কে শুরু থেকে সমানে চিৎকার করতে-করতে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

তিথির জ্ঞান ফিরল অবিরাম কলিং বেলের শব্দে। বুঝতে পারল তার মা আর ভাই এসেছেন। সে অন্ধকারে দিশেহারার মত হাতড়ে-হাতড়ে ছুটে গেল দরজা খোলার জন্য। যাওয়ার সময় ভাঙা কাঁচের টুকরোয় তার দু'পায়ের কয়েক জায়গা ক্ষত-বিক্ষত হলো।

দরজা খুলতেই তিথির বড় ভাই রাগান্বিত গলায় বলে উঠলেন, 'এতক্ষণ কী করছিলি? এতবার বেল বাজালাম? ঘুমিয়ে পড়েছিলি...'

তিথির ভাই বলে শেষ করতে পারলেন না। তিথির মুখের দিকে তাঁর চোখ পড়তেই তিনি থমকে গেলেন। তিথির বিধ্বস্ত চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন, বাসায় কোনও একটা সমস্যা হয়েছে।

তিথির মা ব্যগ্র গলায় বলে উঠলেন, 'কী হয়েছে তোর?!

BanglaBook.org

তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?!'

তিথি কিছু বলতে পারল না। সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কাঁদতে লাগল।

তিথিকে বসার ঘরের সোফায় বসিয়ে পানি-টানি খাওয়ানোর পর কিছুটা সুস্থির হলো। পায়ের ক্ষতস্থানগুলোতে অ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে টুকরো কাপড় বেঁধে দেয়া হলো। এরপর ধীরে-সুস্থে তিথির কাছ থেকে তিথির মা আর ভাই কী ঘটনা ঘটেছে সব বিস্তারিত জানলেন।

তিথির কথা শুনে তাঁদের কারই বোধহয় বিশ্বাস হলো না। তিথির ভাই অবিশ্বাসী গলায় বলে উঠলেন, 'কী বলছিস আবোল-তাবোল! তোর রুমের জিনিসপত্র নিজে-নিজে কেন ভাঙচুর হবে? নিশ্চয়ই তুই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিস। আমি তোর রুমে গিয়ে দেখছি কী ব্যাপার।'

তিথির ভাই তিথির রুমে ঢুকলেন। রুম অন্ধকার। দরজার পাশেই সুইচবোর্ড। তিনি সুইচবোর্ডে হাত রেখে বাতি জ্বালতে চাইলেন। দেখলেন সুইচ আগে থেকেই অন করা। এর মানে রুমের বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে। তিনি পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে, মোবাইল ফোনের ছোট্ট টর্চটা জ্বাললেন। রুমের ভিতর টর্চের আলো ফেললেন। অবাক বিস্ময়ে তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। এ কী দেখছেন! তিথি যা বলেছে তাই তো! রুমের সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কী করে এটা হলো? কে করল এমনটা? তা হলে কি তিথির কথাই ঠিক! কোনও এক অশরীরী এখানে এসে পড়েছিল!

তিথির ভাই একটা নতুন বাল্ব এনে রুমে লাগিয়ে জ্বেলে দিলেন। ভীত পায়ে তিথি আর তিথির মা-ও এসেছে। সবাই বিস্মিত চোখে সমস্ত রুমটা পর্যবেক্ষণ করছে। রুমের একটা কিছু

BanglaBook.org

অক্ষত অবস্থায় নেই। যেন ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা হয়ে গেছে। এক সময় তাদের তিনজনের চোখ পড়ল ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায়। আয়নায় কিছু লেখা রয়েছে। লাল রঙের লিপস্টিক দিয়ে কাঁচা হাতের লেখা–

'তোর ভাগ্যটা অনেক ভাল। তুই আজ আমার হাত থেকে বেঁচে গেলি। তোর গলার ওই তাবিজটার জন্য তোকে মারতে পারলাম না। ওই তাবিজ তোকে কতদিন রক্ষা করবে? সময় থাকতে নিজেকে শুধরে নে। রিফাতকে ভুলে যা। তা না হলে তোরও পরিণতি হবে তোদের ক্লাসের রনি, লিলি আর জমির স্যারের মত। তোকে আমি মারবই। কিছুই তোকে রক্ষা করতে পারবে না। রিফাত শুধু আমার! শুধুই আমার! আমি রিফাতের প্রেয়সী! ওর একমাত্র প্রেয়সী! আমি ছাড়া ওকে কেউ কোনও দিনও পাবে না।'

পাঁচ

তিথি কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এখনও কলেজ শুরু হয়নি। সবে একজন-দু'জন করে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। তিথি ব্যাকুল হয়ে রিফাতের আসার অপেক্ষা করছে।

রিফাতকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেই তিথি রিফাতের নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে ছুটে গেল। রিফাত অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার?!'

তিথি রিফাতের সামনে পৌঁছে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

রিফাত বিরক্ত গলায়, 'মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনও কথা

BanglaBook.org

থাকে না,' বলে গটগট করে চলে যেতে লাগল।

তিথি পিছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোমার প্রেয়সী কাল আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

কথাটা শুনে রিফাত থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তিথির দিকে ফিরে প্রায় তোতলাতে-তোতলাতে বলল, 'কী বললে তুমি?! প্রেয়সী তোমাকে...'

রিফাতের বলা শেষ হবার আগেই তিথি কাতর গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ, কাল আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমার সমস্ত রুমটা তছনছ করে দিয়েছে।'

রিফাত অবাক গলায় প্রশ্ন করল, 'কেন?! তুমি কী করেছ?! প্রেয়সী তো তাদেরকে মারে, যারা আমার ক্ষতি করতে চায়। আর...আর...যে মেয়েরা আমাকে পেতে চায় তাদেরকে।'

তিথি কোনও জবাব দিল না। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে ফেলল।

কলেজের পিছন দিকটায় বিশাল একটা পুকুর আছে। পুকুরের দুই পাড়ে শান বাঁধানো ঘাটলা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পুকুরের চার পাড়ের দূর্বাঘাসে এবং ঘাটলায় গিয়ে বসে আড্ডা দেয়। বিশেষ করে প্রেমিক-প্রেমিকার জুটি। জায়গাটা নিরিবিলি। প্রেম করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। সারি-সারি নারকেল-সুপারি গাছের ছায়া ঘেরা। পুকুরের পরিষ্কার টলমলে পানিতে ঢেউ তুলে ঝিরঝিরে হাওয়া বয়।

তিথি আর রিফাত পুকুরের উত্তরপাড়ের শান বাঁধানো ঘাটলায় এসে বসল। তিথি গতকাল তার সঙ্গে যা ঘটেছে তা বিস্তারিত বর্ণনা করল রিফাতের কাছে। সব শোনার পর রিফাত গালে হাত দিয়ে ঝিম মেরে গেল। এক সময় বসে যাওয়া গলায় বলল, 'প্রেয়সী তোমাকে যেটা বলেছে সেটাই করো। আমার সঙ্গে আর

BanglaBook.org

কখনও মিশো না। আমার দিকে ফিরেও তাকিয়ো না। ও বড়ই ভয়ঙ্কর! ওর কথা না শুনলে, ও ঠিকই তোমাকে মেরে ফেলবে।'

তিথি বলল, 'প্রেয়সী আসলে কে? সে কি জিন-ভূত-ডাইনি নাকি পেত্নী? সে কী চায়? তোমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

রিফাত থমথমে গলায় বলল, 'আমিও জানি না সে আসলে কী। শুধু এতটুকুই জানি, সে বড়ই ভয়ঙ্কর একজন! তুমিও এর বেশি জানতে চেয়ো না। তাতে তোমার ক্ষতি হবে। ও তোমাকে মেরে ফেলবে।'

তিথি মরিয়া গলায় বলে উঠল, 'না, আমাকে জানতেই হবে। কালই তো আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। আমার আবার কীসের মৃত্যুভয়! তোমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক সেটা অন্তত আমাকে জানাও।'

রিফাত চটে যাওয়া গলায় বলে উঠল, 'শোনো তা হলে, এতই যখন শুনতে চাচ্ছ–

'তখন আমার বয়স দশ-এগারো। মা আমাকে আমাদের নিজেদের গাড়িতে প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যেতেন, আবার স্কুল শেষে নিয়ে আসতেন। আমার বাবা খুই ধনী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। সে যাই হোক, একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে গাড়ি জ্যামে আটকা পড়লে দেখি–বাচ্চা একটা ছেলে অনেকগুলো বকুল ফুলের মালা হাতে ছুটে-ছুটে প্রত্যেকটা গাড়ির কাছে যাচ্ছে মালা বিক্রির উদ্দেশ্যে। আমার একটা মালা কেনার খুব শখ জাগে। মায়ের কাছে বায়না ধরি। মা গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে ছেলেটাকে ডাকেন। ছেলেটা আমাদের গাড়ির কাছে ছুটে আসে। মা একটা মালা কিনে আমার হাতে দেন। আমি মালাটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। কী সুন্দর মন মাতানো গন্ধ! সারা পথ গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে মালাটা পড়ার টেবিলের উপর রাখি। যেন পড়তে বসেও সুন্দর গন্ধটা পাই। তিন-চারদিন

BanglaBook.org

পর দেখি মালাটা থেকে আর গন্ধ বেরোচ্ছে না। মালার ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে। আর ফুলগুলোতে ছারপোকার মত এক ধরনের ছোট-ছোট পোকা ধরেছে। আমি মালাটা খোলা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই। তখন রাত প্রায় পৌনে বারোটা। কিছুক্ষণ পরই মা এসে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যান।

'গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে আমি টের পাই কেউ হিমশীতল ঠাণ্ডা একটা হাত আমার গায়ে বোলাচ্ছে। আমি চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠি। ঘরে ডিমবাতি জ্বলছিল। ডিমবাতির অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পাই, আমার বিছানার পাশে একটা নারীমূর্তি বসে আছে। প্রথমে ভাবি বোধহয় মা। ভালভাবে লক্ষ করে দেখি মা নন, ভয়ঙ্কর চেহারার এক নারী। লম্বাটে মুখমণ্ডল। অস্বাভাবিক লম্বা টিয়ের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক। বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বলে পুঁতি-পুঁতি চোখ। গাড়ির টায়ারের মত ফোলা-ফোলা ঠোঁট। হাতির কানের মত বড়-বড় দুটি কান। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো জঙ্গুলে চুল। গা থেকে বেরোচ্ছে মরা-পচা বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ। আমি প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠতে চাই। অমনি মোটা-মোটা গাঁটযুক্ত লম্বা আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট চেপে ধরে নিঃশব্দে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে ওঠে। কী ভয়ঙ্কর হাসি! আমার কলজে হিম হয়ে যায়। হিস-হিস করে কথা বলে ওঠে, "আমাকে ভয় পেয়ো না। একটুও ভয় পেয়ো না। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। আমি তোমার প্রেয়সী। বকুল ফুলের মালা পরিয়ে তুমি আমায় তোমার প্রেয়সী করে নিয়েছ। এই দেখো, আমার গলায় তোমার দেয়া মালা।"

'চেয়ে দেখি সত্যিই তার অস্বাভাবিক লম্বা গলায় আমার সেই বকুল ফুলের মালাটা।

'সে আবার হিস-হিস করে বলে ওঠে, "তুমি যখন জানালা দিয়ে এই মালাটা ছুঁড়ে ফেলো, মালাটা গিয়ে সোজা আমার গলায়

BanglaBook.org

পড়ে। আমি জানালার বাইরে দাঁড়ানো ছিলাম। সে যে করেই হোক, মালা পরিয়ে তুমি আমায় তোমার প্রেয়সী করে ফেলেছ। এখন থেকে আমি সবসময় ছায়ার মত তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকব। আমার কথা তুমি কাউকে বোলো না। তোমার বাবা-মাকেও না। তারা জানলে ওঝা ডেকে আমাকে তাড়াতে চাইবে। বোলো না কিন্তু। তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে চাই না। দরকার হলে তোমার বাবা-মাকে আমি মেরে ফেলব।" এই বলে আমার চোখের উপর হাত রাখে। অমনি আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

'আমি নিষেধ অমান্য করে সকালে ঘুম থেকে জেগেই কাঁদো-কাঁদো গলায় মাকে সব জানাই। মা আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। হাসতে-হাসতে বলেন, ওসব আমি স্বপ্নে দেখেছি। আলতু-ফালতু গাঁজাখুরি ভৌতিক গল্পের বই পড়ার ফল।

'পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটে। ভয়ঙ্কর চেহারার নারী মূর্তিটা গভীর রাতে আবার উদয় হয়। আমার গায়ে হাত বোলায়, মাথার চুলে বিলি কাটে, চুমু খায়। আমি ভয়ে চুপসে থাকি। সকালে ঘুম থেকে জাগার পর আবার মাকে জানাই। মা হাসতে-হাসতে বাবাকেও জানান, "তোমার ছেলের উপর নাকি এক্টা পেত্নী ভর করেছে! পেত্নীটা প্রতি রাতে এসে তোমার ছেলেকে আদর করে, চুমু খায়।"

'বাবা-মা দু'জনেই ব্যাপারটা হাসি-তামাশার বিষয় হিসেবে নেন। কেউই আমার কথা বিশ্বাস করেন না। ওদিকে রাতের পর রাত আমার সঙ্গে একই ঘটনা ঘটতে থাকে।

'এক রাতে মা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাবার সময় ভুলে মনে হয় তাঁর চুল আঁচড়ানোর চিরুনি আমার রুমে ফেলে যান। মাঝ রাতে মা ওটা নিতে আবার আমার রুমে আসেন। রুমে ঢুকেই তিনি আমার শিয়রের পাশে সেই ভয়ঙ্কর নারীমূর্তিকে দেখতে পান। মা অসম্ভব ভয় পেয়ে বিকট চিৎকার দিয়ে ওঠেন।

BanglaBook.org

বিভীষিকাটা মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে গিয়ে মায়ের উপর চড়াও হয়। প্রচণ্ড আক্রোশে মায়ের গলা চেপে ধরে। এক ঝটকায় ঘাড়টা ভেঙে ফেলে। মট করে ঘাড় ভাঙার শব্দ হয়। মায়ের নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে। বাবাও মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন। মায়ের গলা চেপে ধরা অবস্থায় ওই ভয়ঙ্কর বিভীষিকাটাকে দেখতে পান। বাবা বিস্ফারিত চোখে হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন। বাবা চিৎকার দিয়ে ওঠার আগেই ডাইনিটা মাকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মায়ের দেহটা ঢলে পড়ে। আমি বুঝতে পারি, ওটা এখন বাবাকেও মেরে ফেলবে।

'আমার চোখের সামনে বাবা-মা দু'জনকেই মেরে ফেলে। সকালে পুলিশ এসে বাবা-মায়ের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বাবা-মা দু'জনের ক্ষেত্রেই উল্লেখ করে, অতি বলবান কেউ ঘাড় মটকে ঘাড়ের ভারটেব্রা নামের হাড় ভেঙে হত্যা করেছে। তখনকার পেপার-পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখা-লেখিও হয়। "ব্যবসায়ী দম্পতির রহস্যজনক মৃত্যু।" "একই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যু"—এইসব শিরোনামে। লোকাল থানার একজন ওসি তদন্তের ভার পান। তদন্ত করতে গিয়ে ওসি সাহেবের সন্দেহের তীর এসে পড়ে আমার উপর। তিনি আমাকেই আমার বাবা-মায়ের খুনি ভাবতে শুরু করেন। আমি দশ-এগারো বছরের একটা বাচ্চা ছেলে, এর পরও! বিদেশে নাকি এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। দশ-এগারো বছরের বাচ্চা বাবা-মা বা যে কাউকে খুন করে ফেলেছে। এ ধরনের বাচ্চারা নাকি এক ধরনের ভয়ঙ্কর মানসিক রোগী হয়ে থাকে। এদের গায়ে হঠাৎ-হঠাৎ অসম্ভব আসুরিক শক্তি এসে ভর করে। তখন তারা যে কাউকে হত্যা করার মত সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

BanglaBook.org

'ওসি সাহেব জেরায়-জেরায় আমাকে জর্জরিত করেন। আমি বার-বার প্রেয়সী নামের ডাইনিটার কথা বলি। কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও নিয়ে যান। সাইকিয়াট্রিস্ট আমাকে বিভিন্ন উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন করেন। ওদিকে আমাকে এভাবে হয়রানি করায় প্রেয়সী খেপে ওঠে। এক রাতে রোড অ্যাক্সিডেন্টে ওসি সাহেবের মৃত্যু হয়। ওসি সাহেবের মৃত্যুর পর তদন্ত আর তেমন একটা এগোয় না। পুলিশ তদন্তের রিপোর্ট দিয়ে দেয়।

'তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়, ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরে পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক বাইরে থেকে কয়েকজন লোক সেই রাতে ঘরে ঢুকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পুলিশের তরফ থেকে খুনিদের চিহ্নিত করার জোর প্রচেষ্টা চলছে।

'পুলিশের আরও অনেক অমীমাংসিত কেসের মত আমার বাবা-মা হত্যা কেসও এক সময় ফাইলবন্দি হয়ে যায়।

'আমি নাবালক বলে আমার চাচা কোর্টের মাধ্যমে আমার অভিভাবকত্ব নিতে চান। কোর্ট রায় ঘোষণার আগে চাচা তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যান। চাচার মৃত্যুর পর আমার এক খালা আমার দায়িত্ব নিতে চান। সেই রাতেই তিনি কোনও কারণ ছাড়া গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এরপর আর কোনও আত্মীয়-স্বজন আমার দায়িত্ব নিতে আগ্রহ দেখায় না। আমি বুঝতে পারি অ্যাক্সিডেন্টে ওসি সাহেবের মৃত্যু, ছাদ থেকে পড়ে চাচার মৃত্যু, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে খালার মৃত্যু—এসব কিছুর পিছনে প্রেয়সী ডাইনিটার হাত রয়েছে। ডাইনিটা আমার পাশে কাউকে থাকতে দেবে না। শুধু সে নিজে থাকবে।

'শেষ পর্যন্ত আমি ডাইনিটার নিয়ন্ত্রণেই একা-একা বড় হতে থাকি। সে আমার সব ধরনের সুবিধা-অসুবিধা দেখে, আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, আমি যা করতে চাই তাই করতে

BanglaBook.org

দেয়। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেয়েছি, বাধা দেয়নি। শুধুমাত্র কোনও মেয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলে তাকে মেরে ফেলে। অথবা যে কেউ আমার সামান্যতম ক্ষতি করতে চাইলে তাকেও মেরে ফেলে। এভাবে ধীরে-ধীরে আমি পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠি। পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার পর থেকে প্রতি রাতে সে আমাকে শুধুমাত্র আদর করে, চুমু খেয়ে, চুলে বিলি কেটে আর সারা গায়ে হাত বুলিয়েই রেহাই দিতে চায় না। আমার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হতে চায়। আমি যে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করে আসছি তা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না।'

বলতে-বলতে রিফাতের গলা ধরে এল। আর চোখ দুটো ভিজে উঠল।

তিথি বলে উঠল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়...'

তিথির বলা শেষ হবার আগেই রিফাত ভেজা চোখ তুলে মরিয়া গলায় বলে উঠল, 'কী কাজ?'

তিথি তার গলায় ঝোলানো রূপার মাদুলির তাবিজটা দেখিয়ে বলতে লাগল, 'এই তাবিজটা আমাকে কানা ফকির নামে এক ফকির বাবা দিয়েছিলেন। আমি ছোটবেলায় খুব ভয় পেতাম। ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে চিৎকার দিয়ে উঠতাম। আমাদের এক আত্মীয়া মাকে পরামর্শ দেন, আমাকে কানা ফকিরের কাছে নিয়ে যাবার। সেই ফকির বাবাই আমাকে এই তাবিজটা দেন। তাবিজটা দিয়ে বলেছিলেন, "মা, এই তাবিজ যতদিন তোর গলায় থাকবে, তোর কাছে জিন-ভূত, কোনও কিছু আর ঘেঁষতে পারবে না। তুই আর দুঃস্বপ্ন দেখবি না। খারাপ জিনেরাই বাচ্চাদের ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়ে ভয় দেখায়।" সত্যিই এই তাবিজটা পরার পর থেকে আমি আর কখনও দুঃস্বপ্ন দেখিনি। গতকাল প্রেয়সী ডাইনিটাও আমাকে মারতে পারেনি এই তাবিজটার কারণে। চলো, তোমাকে নিয়ে সেই ফকির বাবার

BanglaBook.org

কাছে যাই। নিশ্চয়ই তিনি ডাইনিটার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন।'

ছয়

কানা ফকিরের বাস শহর ছেড়ে অনেক দূরে কুতুবপুর গ্রামে। ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে তিনি থাকেন। অশীতিপর বৃদ্ধ। চুল-দাড়ি সবকিছু কাশফুলের মত ধবধবে সাদা। রোগা হাড় জিরজিরে শরীর। পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে নুয়ে গেছে। কথা বলেন অস্পষ্ট জড়ানো গলায়, ভাঙা-ভাঙা উচ্চারণে। উঠে দাঁড়াতে পারেন না। চোখে দেখেন না, এই জন্যেই বোধহয় লোকে কানা ফকির নামে ডাকে। চৈত্র মাসের গরমেও তিনি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে পদ্মাসন ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে বসে আছেন। রিফাত আর তিথি হাঁটু মুড়ে তাঁর সামনে বসা। তিথিই প্রেয়সী ডাইনিটা সম্পর্কে তাঁর কাছে সবকিছু বর্ণনা করল। রিফাত অসহায় মুখ করে মাথা নুইয়ে বসে রইল।

সব শোনা শেষে কানা ফকির রিফাতের উদ্দেশে বললেন, 'দেখি, বাবাজি, আফনের ডাইন হাতটা আমার দিকে মেইলা ধরেন তো।'

রিফাত ডান হাতটা বাড়িয়ে মেলে ধরল। কানা ফকির চাদরের নীচ থেকে তাঁর রোগা, শীর্ণ, রগ জাগা একটা হাত বের করে রিফাতের মেলে ধরা হাতের উপর রাখলেন। কয়েক মুহূর্ত পর ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত চমকে রিফাতের হাতের উপর থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে আবার চাদরের নীচে গুটিয়ে নিলেন। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কাশতে লাগলেন। কাশির দমকে-দমকে যেন

BanglaBook.org

বুকের ভিতর বাঁশি বাজছে।

কাশির বেগ কমে এলে বলতে লাগলেন, 'আফনের উফর যে ডাইনটা ভর করছে সেটা অনেক শক্তিশালী। এতদিনে সে আফনের উফর এমনভাবে দখল নিছে যে তারে খেদানোর ক্ষমতা কারও নাই। সারা দুনিয়ার কোনও পীর-ফকিরই আর তারে খেদাইতে পারবে না। যদি না সে নিজে থেইক্যাই আফনেরে মুক্তি দেয়। একটা কাম করলে সে আফনের মায়া ছাইড়া চইল্যা যাইতে পারে। তা হইল আফনের বিবাহ করন লাগবে। তয় সাধারণ সুস্থ-স্বাভাবিক কোনও মাইয়ারে না। সুস্থ-স্বাভাবিক কোনও মাইয়ারে বিবাহ করনের আগেই ডাইনটা সেই মাইয়ারে মাইরা ফেলাইবে। তাবিজ-কবজ কোনও কিছুই সেই মাইয়ারে রক্ষা করতে পারবে না। যেভাবে হউক, ছলে-বলে-কৌশলে সে মারবেই। কিন্তু ওই ডাইনটার মতনই বিকৃত চেহারার কাউরে যদি বিবাহ করেন তহন সে আর কিছুই বলবে না। যেমন ধরেন আগুনে পুইড়্যা বা এসিডে ঝইলস্যা অনেক মেয়ের চেহারা নষ্ট হইয়া যায় না, তেমন কোনও মেয়ে।'

পরিশিষ্ট

তিথি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের বেডে পড়ে আছে। সে নিজেই নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তার শরীরের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি আগুনে পুড়ে গেছে। পঞ্চাশ শতাংশের বেশি আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীদের অধিকাংশই শেষপর্যন্ত মারা যায়। সামান্য কিছু রোগী কপাল জোরে টিকে যায়।

তিথির মা, ভাই, ভাবি বহুবার তিথিকে জিজ্ঞেস করেছেন, তিথি কেন এমনটা করল? কেন সে নিজের গায়ে নিজেই আগুন লাগাল? সে কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল? তিথি এই প্রশ্নগুলোর

BanglaBook.org

কোনও জবাব দেয় না। শুধু ছল-ছল চোখে তাকিয়ে থাকে। এক সময় দু'চোখ ছাপিয়ে লোনা জলের বন্যা নামে।

রিফাত তিথিকে দেখতে এসেছে। সে তিথির বেডের পাশে চেয়ারে বসেছে। তিথির সমস্ত শরীরে ব্যাণ্ডেজ পেঁচানো। এমনকী মুখেও। শুধু চোখ দুটো আর ঠোঁট দেখা যাচ্ছে। তিথি বোবা চোখ দুটো মেলে অপলক চেয়ে আছে। রিফাত তিথির চোখে চোখ রাখল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল। এক পর্যায়ে রিফাত বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'এত ভালবাস তুমি আমাকে?! এত ভালবাসা কী করে এতদিন ধরে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে?! কাউকে একটিবারের জন্যও বুঝতে দিলে না! এমনকী আমাকেও না!' বলতে-বলতে রিফাত তিথির ব্যাণ্ডেজে মোড়ানো হাত ধরল। রিফাতের চোখ ভিজে উঠেছে। গলা বুজে এসেছে, '...আমি সঙ্গে করে একজন কাজী নিয়ে এসেছি। তিনি বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। আমি তোমাকে এখানে, এই মুহূর্তে বিয়ে করতে চাই। এই দেখো, পকেটে করে একটা বকুলফুলের মালাও নিয়ে এসেছি। এই মালা পরিয়ে আজ আমি আমার প্রেয়সীকে গ্রহণ করতে চাই। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমার বাবা খুব ধনী ছিলেন। ব্যাংকে আমার নামে কোটি-কোটি টাকা পড়ে আছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য পৃথিবীর যেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাব। তোমাকে সুস্থ করে তুলবই। প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে তোমার আগের চেহারা ফিরিয়ে আনব। কিছুতেই তোমাকে মরতে দেব না।'

তিথি কিছুই বলছে না। শুধু তার দু'চোখ ছাপিয়ে অঝোর ধারায় লোনা জল নামছে। আর ঠোঁট দুটো তির-তির করে কাঁপছে।

BanglaBook.org

দুঃস্বপ্ন

মাঝ রাত। দুঃস্বপ্ন দেখে সেতুর ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নটাকে ঠিক দুঃস্বপ্ন বলা যায় না। সাধারণ স্বপ্নই। কিন্তু সেই সাধারণ স্বপ্নই সেতুর কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে ধরা দেয়। আজই প্রথম নয়, এর আগেও আরও অনেকবার এই স্বপ্নটা সে দেখেছে।

এই স্বপ্নে জহির ভাইকে দেখে সে। জহির ভাই ওর বড় ভাইয়ের বন্ধু। দু-বছর হলো ওর বড় ভাই হাসান দেশের বাইরে ইতালিতে। ওর ভাই ইতালি যাবার কিছুদিন আগে তার সঙ্গে একদিন জহির ভাই ওদের বাসায় আসে। সেতু তাদের জন্য চা-নাস্তা নিয়ে যায়। তখন সেতুর ভাই ওর সঙ্গে জহির ভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেয়। জহির ভাই একবার মাত্র চোখ তুলে সেতুর দিকে তাকায়। খুবই রোগা, ফর্সা একটা লোক। গাল ভাঙা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে, চোখ কোটরে ঢোকা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো লালচে চুল। গায়ে একটা পুরানো সাদা শার্ট। যে শার্টের সাদা রং ফিকে হয়ে গেছে। চেহারায় খুবই লাজুক ভঙ্গি। ব্যস, এই পর্যন্তই। পরিচয় শেষে সেতু তাদের সামনে থেকে চলে আসে।

দুঃস্বপ্নটা দেখা শুরু হয় সেতুর ভাই ইতালি যাবার কিছুদিন পর থেকে। স্বপ্নটা এমন–ও যেন ওর বিছানায়ই শুয়ে রয়েছে। সমস্ত ঘর অন্ধকার। শোবার আগে আলো নিভিয়ে যেভাবে ঘর অন্ধকার করে নেয় ঠিক তেমন। হঠাৎ অন্ধকারের মাঝে দেখা

BanglaBook.org

যায় জহির ভাইয়ের মুখ। জহির ভাই ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছু অন্ধকারে ডুবে আছে, শুধু জহির ভাইয়ের মুখটা জুড়ে অদ্ভুত নীলাভ আলো। জহির ভাই ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসছে। এই পর্যায়ে বুক ধড়ফড় করতে-করতে ওর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ বুঝতেই অসুবিধে হয় এতক্ষণ দৃশ্যটা ও ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছে নাকি বাস্তবিকই। কারণ স্বপ্ন দৃশ্যের মতই সমস্ত ঘর থাকে একই রকম গাঢ় অন্ধকার।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো, যেদিন রাতে সেতু এই স্বপ্নটা দেখে তার পরের দিন জহির ভাই তাদের বাসায় এসে উপস্থিত হয়। প্রথম দিনকার সেই একই সাদা শার্ট গায়ে। বোধহয় তার একটাই মাত্র শার্ট। দিনের এমন এক সময়ে আসে যখন সেতু ছাড়া আর কেউ বাসায় থাকে না। সেতুর বাবা নেই। মা বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুলের হেড-মিসট্রেস। তিনি স্কুল থেকে বিকেল পাঁচটায় বাসায় ফেরেন। আর ওর একমাত্র ভাই তো দেশের বাইরে ইতালিতে।

জহির ভাই এসে অত্যন্ত লাজুক ভঙ্গিতে মুখ কাঁচুমাচু করে ওর ভাইয়ের খোঁজ-খবর নেয়। ইতালি থেকে কবে ফিরবে, কেমন আছে, নিয়মিত যোগাযোগ হয় কিনা...এইসব হ্যানত্যান।

সেতু একদিন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলে ফেলে, 'আপনার সঙ্গে ভাইয়ার কোনও যোগাযোগ নেই? ভাইয়া আপনাকে ফোন করে না?'

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত আরও গুটিয়ে গিয়ে তখন সে লজ্জিত মুখে বলে, 'আমার তো কোনও মোবাইল ফোন নেই।'

প্রতিবারই ঠিক দশ কি পনেরো মিনিট থেকে চলে যায়, কেমন অসহায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে। পুরো সময়টায় একবারও সে

BanglaBook.org

সেতুর দিকে চোখ তুলে তাকায় না। মাথা নুইয়ে নীচের দিকেই তাকিয়ে থাকে। বাসা থেকে চলেও যায় মাথা নুইয়ে, কুঁজো ভঙ্গিতে। কোনও-কোনও দিন সেতু চা-নাস্তা খেয়ে যেতে বলে। সে চা-নাস্তা না খেয়েই উঠে পড়ে।

বেলা বারোটা। সেতু বাসায় একা। সেতুর মা সকাল ন'টার দিকেই বাসা থেকে বের হয়েছেন। মা বের হবার পর থেকেই সেতু অপেক্ষা করছে জহির ভাইয়ের আসার। কারণ গত রাতে সে জহির ভাইকে স্বপ্নে দেখেছে। এখন পর্যন্ত এমন একবারও হয়নি, সে স্বপ্নে দেখেছে অথচ তার পরের দিন জহির ভাই আসেনি।

সেতু বসার ঘরে বসে বার-বার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে আর কলিং বেল বাজার অপেক্ষা করছে। এই বুঝি 'ডিং-ডং' করে কলিং বেলটা বেজে উঠবে।

কলিং বেল বাজল না, তবে সেতুর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সেতুর ভাই ইতালি থেকে ফোন করেছে।

'হ্যালো, ভাইয়া, কেমন আছ?'

'ভাল আছি। তোরা কেমন আছিস? সারাক্ষণ মা আর তোর জন্য খুব চিন্তা হয়।'

'চিন্তার কিছু নেই, আমি আর মা খুব ভাল আছি।'

'তোর পড়াশোনা কেমন চলছে?'

'ভাল।'

'তোর সেমিস্টার পরীক্ষা কবে?'

'জুলাইতে।'

'তোর অনার্সটা কমপ্লিট হলেই তোকে আর মাকে আমার কাছে নিয়ে আসব। ভিসার জন্য কাগজ-পত্র জমাও দিয়ে ফেলেছি।'

BanglaBook.org

'ভাইয়া, অত ব্যস্ত হবার কিচ্ছু নেই।'

'মায়ের দিকে খেয়াল রাখিস। মায়ের ডায়াবেটিস কি কন্ট্রোলে আছে?'

'মা নিয়মিত ডাক্তার দেখিয়ে ইনসুলিন নিচ্ছে, কোনও অসুবিধে নেই।'

'আচ্ছা, এখন রাখি। মাকে আমার কথা বলিস।'

সেতু আমতা-আমতা করে বলল, 'আচ্ছা, ভাইয়া, তোমার যে এক বন্ধু আছে না জহির_ভাই, নয়াপাড়া না কোথায় যেন থাকে...'

সেতুর ভাই থমকে যাওয়া গলায় বলে উঠল, 'হঠাৎ জহিরের কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

'এমনি,' মিথ্যে করে বলল। 'না, মানে সেদিন যেন কলেজ থেকে ফেরার পথে তাকে দেখলাম। রিকশায় চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে।'

'কী যে বলিস! জহিরকে দেখবি কোত্থেকে?! আমি ইতালিতে আসার সপ্তাহ খানিক আগেই তো জহির রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমি তো ওর জানাজায়ও গিয়েছিলাম। তখন ইতালিতে আসা উপলক্ষে এত ব্যস্ত ছিলাম যে জহিরের কথা বাসায় তোদের জানাতে একেবারে ভুলেই গেছিলাম।'

সেতু বসে-যাওয়া স্তব্ধ গলায় কোনওক্রমে বলল, 'ও, তাই!!!'

'সেতু, তা হলে এখন রাখি। আবার পরে কথা বলব। আমার আর একটা ফোন এসেছে।'

ফোন রেখে সেতু পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল। তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মাথা ঝিম-ঝিম করছে। জহির ভাই যদি দু-

BanglaBook.org

বছর আগেই মারা গিয়ে থাকে তা হলে সাদা শার্ট পরে কে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে!? আজও তো তার আসার কথা!

'ডিং-ডং' শব্দে কলিং বেলটা বেজে উঠল। কলিং বেলের শব্দে সেতুর বুকের ভিতর ধক করে উঠল। মাথার ভিতর চক্কর মারতে লাগল। এখনই বুঝি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অপঘাত

মাঝ রাত। তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে।

হানিফ সাহেব বাড়িতে একা। তাঁর ছেলে-মেয়েরা সবাই তাদের মায়ের সাথে নানা বাড়ি বেড়াতে গেছে। আম-কাঁঠালের দিন বলে ছেলে-মেয়েরা নানা বাড়ি বেড়াতে গেছে, মন ভরে নানা বাড়ির বাগানের পাকা আম-কাঁঠাল খাওয়ার জন্যে।

স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবাই যে বেড়াতে যাচ্ছে হানিফ সাহেবকে আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। আজ সকালে অফিসে যাবার জন্য তিনি যখন তৈরি হচ্ছেন তখন দেখতে পান, স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরা সবাই সাজ-গোজ করে, ব্যাগ-ট্যাগ হাতে নিয়ে বাসা থেকে বের হচ্ছে। ভারী-ভারী ব্যাগগুলো দেখেই বোঝা যায় কোথাও অনেক দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছে। হানিফ সাহেব অবাক হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'দল বেঁধে তোমরা সবাই কোথায় যাচ্ছ?!'

তাঁর স্ত্রী রেবেকা মুখ ঝামটা দেয়ার ভঙ্গিতে বলেন, 'নওগাঁয়, আমার বাপের বাড়িতে।'

'আমাকে তো কিছু জানালে না?!'

'এতে আবার জানাজানির কী আছে? প্রতি বছরই তো আম-কাঁঠালের সিজনে ছেলে-মেয়ে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি বেড়াতে যাই, তোমার তো আর সেই মুরোদ নেই যে বাজার থেকে আম-কাঁঠাল কিনে এনে ছেলে-মেয়েকে খাওয়াবে।'

এ কথা সত্যি, হানিফ সাহেব খুবই সামান্য বেতনের একটা চাকরি করেন। একটা ইনশ্যুরেন্স কোম্পানির অ্যাসিসট্যান্ট ক্যাশিয়ার। যে টাকা বেতন পান তার অর্ধেকের বেশি চলে যায় বাসা ভাড়ায়। বাকি টাকা দিয়ে টেনেটুনে সংসার খরচ চালাতে হয়। সংসার খরচের সাথে আজকাল বাড়তি আরও যুক্ত হয়েছে ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার খরচ। তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে। ছেলে সবার ছোট, ক্লাস ফাইভে পড়ে। বড় মেয়ে এবার এস.এস.সি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। মেঝ মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে।

বাসা ভাড়া কমাতে আগের বাসা ছেড়ে শহরতলিতে বারোশো স্কয়ার ফিটের একটা টিনশেড বিল্ডিং ভাড়া নিয়েছেন। তিনটা শোবার ঘর, একটা বাথরুম, রান্নাঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর...সব মিলিয়ে বেশ ভালই। এলাকাটাও কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি। ঘরের সামনে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঠান। উঠানের পশ্চিম প্রান্তে একটা ঝাঁকড়া কুল গাছ। বাড়িতে অন্য কোনও ভাড়াটে না থাকায় আর বাড়ির মালিক দেশের বাইরে থাকায়, বাড়িটাকে হানিফ সাহেবের নিজেদের বাড়ি বলেই মনে হয়।

টানাটানির সংসার বলে সুযোগ পেলেই হানিফ সাহেবের স্ত্রী অক্ষমতা নিয়ে খোঁটা দেন। এই যেমন আজ সকালে বলেছেন, 'তোমার তো আর সেই মুরোদ নেই যে... রেবেকা কটু ভাষা ছাড়া কখনওই তাঁর সাথে একটু ভাল ব্যবহার করেন না। বিশেষ করে একবার অফিসের ক্যাশে বিরাট গরমিল ধরা পড়ার পর থেকে।

ঘটনা এমন–অফিসে হানিফ সাহেবের ড্রয়ার থেকে দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে হানিফ সাহেবের বিরুদ্ধে। অফিসের এম ডি আশরাফুদ্দিন

সাহেব তাঁকে ডেকে বলেন, 'আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন। এতদিন যাবৎ আমরা আপনাকে একজন অনেস্ট কর্মচারী হিসেবেই জানতাম। অতি সাধু-সন্ত মানুষেরও মাঝে-মাঝে লোভ জন্মায়। লোভ এমনই এক জিনিস! সেই হিসেবে আপনাকে একটা সুযোগ দেয়া যায়। আপনি যদি তিন দিনের মধ্যে যে টাকাটা চুরি করেছেন সেটা ফেরত দিয়ে দেন, তা হলে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা তুলে নেয়া হবে। চাকরিতেও বহাল থাকবেন। নইলে পুলিশের কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই।'

হতভম্ব হানিফ সাহেব বলেন, 'স্যর, এতগুলো টাকা আমি কোথায় পাব?!'

আশরাফুদ্দিন সাহেব বলেন, 'টাকা ছিল আপনার ড্রয়ারে তালা দেয়া অবস্থায়। চাবিও ছিল আপনার কাছে। এখন ভালমানুষি ভাব ধরবেন না। ভালয়-ভালয় তিন দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিয়ে দেন।'

আশরাফুদ্দিন সাহেব হানিফ সাহেবকে আর কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তাঁকে রুম থেকে বের করে দেন। হানিফ সাহেব বলতে চেয়েছিলেন, টাকা তাঁর ড্রয়ারে ছিল ঠিকই কিন্তু সেই ড্রয়ারের চাবি শুধু তাঁর কাছেই নয় হেড ক্যাশিয়ার নুরুল ইসলাম সাহেবের কাছেও আছে। অবশ্য বললেও তেমন কোনও লাভ হত না। হেড ক্যাশিয়ার নুরুল ইসলাম সাহেবকে অফিসের সবাই দরবেশ সমতুল্য মানুষ মনে করে। অফিসের সবার কাছে তিনি দরবেশ ক্যাশিয়ার সাহেব নামে পরিচিত। তিনি সব সময় মওলানাদের মত পায়ের গিরা পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি-পাজামা পরেন। মাথায় টুপি, চোখে সুরমা, গা থেকে আসে আতরের মিষ্টি গন্ধ। বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, সুফি নূরানী চেহারা, অমায়িক মার্জিত ব্যবহার। মুখে থাকে সব সময় আল্লাহ-খোদার নাম। অফিসের

BanglaBook.org

অনেকেই ছেলে-মেয়েদের অসুখ করলে তাঁর কাছ থেকে পানি পড়া, তাবিজ-কবচ নিয়ে যায়। এমনকী অফিসের বড় সাহেবও একবার তাঁর ছেলের জন্য পানি পড়া নিয়েছেন।

তিন দিনের মধ্যেই হানিফ সাহেবের অফিসের ড্রয়ার থেকে হারিয়ে যাওয়া টাকার ব্যবস্থা হয়। টাকাটা দেন তাঁর স্ত্রী রেবেকার বড় ভাই। সেই থেকে হানিফ সাহেবের প্রতি রেবেকার আচরণ আরও রুষ্ট হয়ে যায়।

রেবেকার ধারণা, অফিস থেকে চুরি করা সেই দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা হানিফ সাহেব মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে আর জুয়া খেলে উড়িয়েছেন। রেবেকাকে তিনি কীভাবে বোঝাবেন, দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা তো দূরের কথা বাইরে চায়ের দোকানে চা খেয়ে দুটো টাকাও তিনি খরচ করেন না। খরচ বাঁচাতে অফিসে যাওয়া-আসাও করেন পায়ে হেঁটে।

হানিফ সাহেবের ভাগ্যটাই খারাপ। কোনও এক অদ্ভুত কারণে কেউ তাঁকে পছন্দ করে না, গুরুত্ব দেয় না, এমনকী বিশ্বাসও করে না। কী ঘরে কী বাইরে! অফিসের পিয়ন শ্রেণীর কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁকে কোনও রকম সম্মান দেখায় না, পাত্তা দেয় না। বাড়িতে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে কেউ না। তাঁর ফাইভে পড়ুয়া বাচ্চা ছেলেটা পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলে ভুরু কুঁচকে বিরক্ত ভঙ্গিতে। অথচ তিনি নির্বিরোধী, চুপচাপ, শান্ত স্বভাবের মানুষ। জীবদ্দশায় কারও সাথে খারাপ আচরণ করেছেন কিনা মনে পড়ে না।

অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তিতে হানিফ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। ঘর নিকষ অন্ধকার। বাইরে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ।

ঘুম ভাঙতেই হানিফ সাহেবের মনে হলো ঘরের ভিতরে তিনি একা নন, ঘর ভর্তি অনেক লোক। ঝড়-বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে অনেক লোক অবস্থানের গমগম আর ফিসফিসানির শব্দ শোনা

BanglaBook.org

যাচ্ছে। সেই সাথে অস্বস্তিকর অচেনা একটা গন্ধ। কিছুটা মাংস পোড়া গন্ধের সাথে লাশের গায়ে যে আতর দেয়া হয় সেই আতর মেশালে যেমন গন্ধ হবে, তেমন।

হানিফ সাহেবের বুক ধক-ধক করছে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। বাড়িতে তিনি একা, তাই শোবার আগে দরজা-জানালাগুলো ভালভাবে বন্ধ করে শুয়েছেন। তা হলে এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে ঘরের ভিতরে এত লোক এল কোত্থেকে?! লোকগুলো অন্ধকারের মাঝে কী করছে? ডাকাত নয় তো?

হানিফ সাহেব কাঁপা হাতে কোনওক্রমে বালিশের নীচে হাতড়ে তাঁর কম দামী মোবাইল ফোনটা বের করলেন। মোবাইল ফোন সেটটায় ছোট্ট একটা টর্চ আছে। টর্চটা জ্বাললেন। কী আশ্চর্য! সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ঘর জুড়ে নেমে এল স্তব্ধতা। ঘরের ভিতরে অনেক লোক অবস্থানের গমগম-ফিসফিসানির শব্দ মুহূর্তে উবে গেল।

মোবাইলের ছোট্ট টর্চের আলোটা ঘরের চারদিকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলেন, কোথাও কেউ নেই। তাঁর মনে খটকা লাগল। তিনি কি তা হলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন? স্বপ্ন দেখারত অবস্থায়ই বালিশের নীচ থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে টর্চটা জ্বেলেছেন? টর্চ জ্বলে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঘুম ছুটে গিয়েছে? হতেও পারে! মাঝে-মাঝে ঘুমের মধ্যে এমন অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে মানুষ। তা হলে মাংস পোড়া গন্ধের সাথে আতর মিশ্রিত ঝাঁজাল গন্ধটা?! গন্ধটা তো এখনও পাওয়া যাচ্ছে! এরও একটা ব্যাখ্যা আছে। আশপাশের বাড়ির কেউ হয়তো মশার কয়েল জ্বেলে রেখে ঘুমিয়েছে, সেই গন্ধ। ঝড়-বৃষ্টির সময় অনেক দূরের গন্ধও ভেসে আসে। দূর থেকে ভেসে আসা মশার কয়েলের সেই গন্ধই তাঁর কাছে মাংস পোড়া গন্ধের সাথে আতর মিশ্রিত গন্ধ মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

হানিফ সাহেবের ঘুম চটে গিয়েছে। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। মোবাইলের ছোট্ট টর্চের আলোতে সুইচবোর্ড খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বালতে সুইচ টিপলেন। বাতি জ্বলল না। ইলেকট্রিসিটি নেই।

হানিফ সাহেব মোবাইল ফোনের ছোট্ট টর্চের আলোতে সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও একটা মোম পেলেন না। ওদিকে মোবাইল ফোনটার চার্জও ফুরিয়ে এসেছে। ঘুম পুরোপুরি কেটে গেছে। ভেবেছিলেন, মোমবাতি জ্বেলে চা বানিয়ে, শোবার ঘরের জানালা খুলে, জানালার পাশে বসে, চা খেতে-খেতে বাইরের ঝড়-বৃষ্টি দেখবেন। গভীর রাতে জানালার পাশে বসে ঝড়-বৃষ্টি দেখার মজাই আলাদা।

অগত্যা তিনি জানালা খুলে চা বিহীনই জানালার পাশে চেয়ার পেতে বসলেন। মোবাইলের টর্চটাও নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকারে বসেই ঝড়-বৃষ্টি দেখতে বেশি মজা।

ঝড়-বৃষ্টি কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু নতুন উদ্যমে আবার মেঘেদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। থেমে-থেমে বিজলি চমকানোর সাথে পাল্লা দিয়ে মেঘ ডাকছে।

খোলা জানালার সামনে বাড়ির সুপরিসর উঠানটায় সামান্য পানি জমেছে। সেই পানিতে আকাশের বিজলি চমকানোর প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে।

ঝড়-বৃষ্টি দেখতে-দেখতে আর জানালা গলে আসা হিমেল বাতাসের পরশে হানিফ সাহেবের চটে যাওয়া ঘুমটা আবার ফিরে এসেছে। ভীষণ ঘুম-ঘুম লাগছে।

চোখ বন্ধ করে পর-পর দুই-তিনটা হাই দিয়ে চোখ খুলে উঠানের দিকে তাকাতেই হানিফ সাহেবের হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে উঠে এসেছে। হৃৎপিণ্ড বোধহয় কয়েকটা বিটও মিস করেছে। ভয়ে হাত-পা জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

থেমে-থেমে বিজলি চমকানোর আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটু আগের ফাঁকা শূন্য উঠানটা ভরে আছে অনেক লোকে। হালকা বৃষ্টির মাঝে লোকগুলো পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পলকহীন স্থির পাথুরে চোখগুলো খোলা জানালার দিকে নিবদ্ধ। বোবা চোখগুলোতে কোনও মণি নেই। খোসা ছাড়ানো লিচুর মত সাদা চোখ। প্রত্যেকের গায়ে পা থেকে গলা পর্যন্ত ধবধবে সাদা কাফনের কাপড় পেঁচানো। হাত দুটোও কাফনের কাপড়ের ভিতরে ঢোকানো। কারও মাথায় কোনও চুল নেই, চোখের উপরে ভুরু নেই, নেই চোখের পাতা।

দুই

সকালে ঘুম থেকে জেগে হানিফ সাহেব নিজেকে পেলেন খোলা জানালার পাশে হাতলওয়ালা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায়। গত রাতে ঝড়-বৃষ্টি দেখতে-দেখতে চেয়ারে বসা অবস্থায়ই কি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? নাকি সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে মূর্ছা গিয়েছিলেন? ঠিক মনে করতে পারছেন না। ভয়ানক দৃশ্যটার কথা মনে পড়তেই তাঁর বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। তবে দিনের আলোতে রাতের মত অতটা ভয় লাগছে না। মনে-মনে তিনি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। আসলে ওই ভয়ানক দৃশ্যটা দেখেছেন স্বপ্নে। জানালার পাশে বসে ঝড়-বৃষ্টি দেখতে-দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন তা টের পাননি। ঘুমোবার পরে ঘুমের মধ্যে ওই কুৎসিত ভয়ানক দৃশ্যের স্বপ্নটা দেখেছেন। স্বপ্নটা যখন দেখেছেন তখন মনে হয়েছে বাস্তবে দেখছেন।

দেয়াল ঘড়িতে চোখ পড়তেই তিনি ঝট করে চেয়ার ছেড়ে

BanglaBook.org

উঠে পড়লেন। পৌনে আটটা বাজে। অফিসের সময় হয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন নিয়ে ভাবলে চলবে না। তড়িঘড়ি করে মুখ-হাত ধুয়ে, দুই পিস টোস্ট বিস্কিট আর এক কাপ চা বানিয়ে খেয়ে, রেডি হয়ে অফিসে রওনা দিলেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা। হানিফ সাহেব অফিস থেকে বের হয়েছেন। প্রতিদিনকার মত পায়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরতে লাগলেন। হাঁটতে-হাঁটতে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন ভাজা-ভুজি হচ্ছে। পিঁয়াজু, বেগুনি, চপ, শিঙ্গাড়া, সমুচা, জিলাপি...চনমনে লোভনীয় গন্ধ ছড়াচ্ছে। হানিফ সাহেবের সবচেয়ে লোভ লাগছে ধোঁয়া-ওঠা গরম জিলাপিগুলো দেখে। নিপুণ হাতে স্তূপাকৃতি করে সাজিয়ে রেখেছে হালকা লালচে বাদামি রং ধারণ করা ভাজা জিলাপিগুলো। প্রতিদিনই অফিসে যাওয়া-আসার পথে এই রেস্টুরেন্টটার সামনে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়। তিনি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে স্থানটা পার হন। যাতে লোভে পড়ে আবার রেস্টুরেন্টে ঢুকে না পড়েন। লোভ এমনই এক জিনিস, একবার প্রশ্রয় পেলে দিনে-দিনে বাড়তেই থাকবে। আজ বোধহয় লোভটাকে আর সামলানোই যাবে না। গরম জিলাপিগুলো কেমন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আজ লোভটা এত বেশি হওয়ার কারণ তাঁর পেটে খুব খিদে।

আজ দুপুরে ভাত খেয়েছেন অফিসের ক্যান্টিনে। এমনিতে প্রতিদিন তিনি বাসা থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত নিয়ে যান। স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় আর আজ সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠায় নিজের হাতেও রান্না-বান্না করতে না পারায় বাধ্য হয়ে দুপুরে অফিসের ক্যান্টিনে খেতে হয়েছে। ভেবেছিলেন, দুপুরটা না খেয়েই পার করে দেবেন। অফিস শেষে বাসায় ফিরে ভাত-ডাল-

BanglaBook.org

আলুভর্তা কিছু একটা রান্না করে খাবেন। কিন্তু লাঞ্চ টাইমে যখন দেখলেন সবাই খেতে বসেছে, কেউ আবার ক্যান্টিনে খেতে যাচ্ছে তখন আর খিদেটাকে সামলাতে পারলেন না। সামলাবেনই বা কী করে, সেই সকালে দুটো টোস্ট বিস্কিট আর এক কাপ চা খেয়ে অফিসে গিয়েছেন, দুপুর দুটো পর্যন্ত তা কি আর পেটে থাকে!

শেষ পর্যন্ত ক্যান্টিনে খেতে যান। সবচেয়ে সস্তার মেনু এক প্লেট ভাত, এক পিস তেলাপিয়া মাছ আর এক বাটি ডালের অর্ডার দেন। খাওয়া শুরু করে দেখেন মাছটা বাসি, কেমন টক-টক গন্ধ। মাছের পিসটা থেকে সামান্য একটু খেয়েও ফেলেছেন। ফেরত দিয়ে যে তেলাপিয়া মাছের বদলে অন্য কিছু চাইবেন সেই উপায়ও নেই। মাছের পিসটা কাঁটা-ঝুটা ফেলবার বাটিতে ফেলে দিয়ে ডাল পাতে নেন। ডাল দিয়ে ভাত মাখিয়ে মুখে দিয়ে দেখেন প্রচণ্ড লবণাক্ত। ওয়াক করে সঙ্গে-সঙ্গে মুখ থেকে উগরে ফেলেন ভাতের থালার মধ্যেই। হাত ধুয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েন।

অন্যান্যদের মত ক্যান্টিনের বয়গুলোও কী কারণে যেন তাঁকে পছন্দ করে না। তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে, ইচ্ছে করেই বোধহয় ওরা বাসি টক-টক গন্ধযুক্ত মাছ আর ডালের বাটিতে বেশি করে কাঁচা লবণ দিয়ে পরিবেশন করেছে।

হানিফ সাহেব রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লেন। উপচে পড়া ভিড়। একটা টেবিলও ফাঁকা নেই। তিনি সবগুলো টেবিলে নজর বুলিয়ে দেখতে পেলেন, একেবারে সামনের টেবিলে একটা চেয়ার খালি আছে। তিনি সেই চেয়ারে বসলেন। পাশের চেয়ারে মোটা-সোটা এক লোক। লোকটার সামনে তিন-চারটা খালি প্লেট। খালি প্লেটগুলো আর লোকটার ঠোঁটে লেগে থাকা তেল দেখে বোঝা যাচ্ছে, কয়েক ধরনের ভাজা-ভুজি খেয়ে মাত্র শেষ করেছে।

BanglaBook.org

হানিফ সাহেবকে পাশে বসতে দেখে মোটা লোকটা এমনভাবে তাকাল যেন সে চোখের ভাষায় বলতে চাইছে, অ্যাই, শুঁটকা, তুই এখানে কী চাস?

মোটা লোকটা হাত উঁচিয়ে বয়কে ডেকে জিলাপি দিতে বলল। লোকটার বলা শেষে সেই বয়কে হানিফ সাহেবও তাঁর জন্য জিলাপি দিতে বললেন।

একটু পরেই সেই বয়টা চার পিস করে জিলাপি সাজানো দুটো প্লেট যথাক্রমে হানিফ সাহেব এবং মোটা লোকটার সামনে দিয়ে গেল। মোটা লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে কচ-কচ শব্দ করে জিলাপি খেতে লাগল। তার খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে মাত্র এই চার পিস জিলাপিতে তার প্রয়োজন মিটবে না। আবার অর্ডার দেবে।

হানিফ সাহেব প্লেট থেকে এক পিস জিলাপি হাতে নিলেন। এখনও বেশ গরম, কড়কড়ে ভাজা, মিঠে গন্ধ...সব মিলিয়ে মুখে দেবার আগেই জিভে পানি এসে যাচ্ছে।

হানিফ সাহেব যেই মাত্র জিলাপিটায় একটা কামড় বসাবেন অমনি একটা মিনতি ভরা কণ্ঠ শুনে থেমে গেলেন, 'বাবাগো, আমারে কিছু খাইতে দেন, খুউব খিদা লাগছে। আইজ সারা দিনে কিচ্ছু খাই নাই।' চোখ তুলে দেখেন, রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ একটা লোক ম্যানেজারকে (সম্ভবত মালিককে) এই কথা বলছে।

বৃদ্ধের গায়ে শতচ্ছিন্ন, ছেঁড়া, জীর্ণ দাগে ভরা ময়লা একটা পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। লুঙ্গি হাঁটুর উপরে ওঠানো। মুখ ভর্তি রুক্ষ শ্রীহীন উস্কখুস্ক ধুলো মাখা সাদা দাড়ি। মাথার চুলেরও একই অবস্থা। শূন্য প্রাণহীন উদ্‌ভ্রান্ত চোখের চাহনি। দু'চোখের কোণে জমে রয়েছে ময়লা। ঠোঁটের কোনা বেয়ে ঘণ্টা খানেক আগে লালা ঝরার শুকনো দাগ।

রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার চোখ পাকিয়ে বলল, 'ওই, পাগলা,

BanglaBook.org

ভালয়-ভালয় যাবি এহান দিয়া? না মাইর খাওনের শখ আছে?'

বৃদ্ধ পাগল জিলাপির পাত্রের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'বাবাগো, অন্তত অ্যাক পিচ জিলাপি দেন। চুইষ্যা-চুইষ্যা খাইতে-খাইতে চইল্যা যাই।'

ম্যানেজার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'জিলাপি খাইতে চাস?! ময়দা, চিনি, তেলের দাম জানস? যা ভাগ। এখনও বলছি ভালয়-ভালয় এহান দিয়া ভাগ। নাইলে কিন্তু এমন প্যাঁদানি দিমু!'

বৃদ্ধ পাগল নির্বিকার। তার কণ্ঠে আবারও অনুরোধ, 'বাবা, অ্যাক পিচ জিলাপি খাইতে দিলে আফনের কী এমন লস হইবে?'

এবারে ম্যানেজার যেন আরও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, 'শুয়ারের বাচ্চা, পাগলামির জায়গা আর পাস নাই?! আমারে তুই জ্ঞান দিস? ওই, হেলাল, এদিকে আয় তো। শুয়োরের বাচ্চারে লাথি মারতে-মারতে রাস্তায় ফেল।'

ষণ্ডা চেহারার একটা বয় বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার আগেই ত্বরিত গতিতে হানিফ সাহেব ছুটে গিয়ে বললেন, 'আমার জিলাপি দিয়ে দিচ্ছি। প্লিজ, মারবেন না। জিলাপি পেলেই তো সে চলে যাবে।'

হানিফ সাহেব তাঁর প্লেটের চার পিস জিলাপিই পাগলটাকে দিয়ে দিলেন। জিলাপি হাতে নিয়ে বৃদ্ধ পাগল অবাক চোখে কিছুক্ষণ হানিফ সাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল।

হানিফ সাহেব আর তাঁর নিজের জন্য জিলাপির অর্ডার দিলেন না। ম্যানেজারের অসভ্যের মত আচরণ দেখে তাঁর এই রেস্টুরেন্ট এবং এই রেস্টুরেন্টের খাবারের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে। বৃদ্ধ অসহায় একটা পাগল। এক পিস জিলাপি খেতে দিলে কী এমন ক্ষতি হত?! উল্টো পশুর মত আচরণ করল!

হানিফ সাহেব চার পিস জিলাপির বিল মিটিয়ে দিতে লাগলেন। ম্যানেজার লোকটা ভাংতি টাকা তাঁর হাতে দিতে-দিতে

BanglaBook.org

বলল, 'ভাইজান, পাগল আর কুত্তা কহনো লাই দিতে নাই। একবার লাই দিছেন কি মাথায় উঠবে। কথাটা খেয়াল রাইখেন।'

তিন

হানিফ সাহেব নিজের হাতে রান্না করেছেন। ভাত আর ডাল। তবে ডালটাকে স্পেশাল ডাল বলা যায়। ভাতের হাঁড়িতে একটা বড় সাইজের আলু সিদ্ধ দিয়েছিলেন। সিদ্ধ আলুটা খোসা ছাড়িয়ে চটকে ডাল রান্নায় দিয়ে দিয়েছেন। শুধু আলু নয়, একটা ডিমও ভেঙে ফুটন্ত ডালের হাঁড়িতে ছেড়ে দেন। ডিমটা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে খুন্তি দিয়ে এমন ভাবে নেড়েছেন যাতে আলুর মত ডিমের সাদা অংশ এবং কুসুম ডালের সাথে মিশে যায়। শেষ পর্যন্ত আলু, ডিমের মিশ্রণে বেশ ঘনঘন, তাঁর একার পক্ষে খাওয়ার মত লোভনীয় গন্ধযুক্ত অসাধারণ ডাল চচ্চড়ি হয়েছে।

স্পেশাল ডাল রান্না দিয়ে সারাদিনের অভুক্ত হানিফ সাহেব খুব তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে ভাত খেয়ে ওঠেন। খাওয়া শেষ করার পর-পরই তাঁর খুব ঘুম পায়। গা একেবারে ছেড়ে দেয়। দেরি না করে শোবার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালাটা খোলা রেখেই শুয়ে পড়েন। গতকাল রাতে ঝড়-বৃষ্টি হলেও আজ সারাদিনে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। জ্যৈষ্ঠ মাসের ভাপসা গরম। ফ্যানের বাতাসে শরীর জুড়াচ্ছে না। মনে আশা, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের হাওয়া-বাতাস যদি একটু ঘরে ঢোকে।

রাত কয়টা, কে জানে? গত রাতের মত অদ্ভুত অস্বস্তিতে হানিফ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভিতর অনেকের সম্মিলিত ফিসফিসানি আর সেই অদ্ভুত গন্ধ। অন্ধকার ঘর বলে

BanglaBook.org

কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে হানিফ সাহেব পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ে গেছেন। বালিশের নীচ থেকে মোবাইল ফোনটা বের করতে চাইছেন কিন্তু হাত নাড়াতেই পারছেন না। ঘেমে নেয়ে উঠছেন।

অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে চেষ্টার পর কোনওক্রমে বালিশের নীচ থেকে মোবাইলটা বের করে টর্চটা জ্বাললেন। অমনি গত রাতের মতই মুহূর্তে সমস্ত ফিসফিসানি থেমে গেল। ঘরে কেউ নেই, ঘর একেবারে ফাঁকা।

হানিফ সাহেব শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। এটা এখন স্পষ্ট এতক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেননি, বাস্তবিকই ব্যাপারটা ঘটেছে। এবং এটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়–অস্বাভাবিক কিছু।

গত রাতের মত ইলেকট্রিসিটিও নেই। হানিফ সাহেব আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে মোবাইলের ছোট্ট টর্চের আলোতে টয়লেটে গেলেন।

টয়লেট থেকে ফিরে এসে পর-পর তিন গ্লাস পানি ঢেলে খেয়ে আবার বিছানায় উঠে বসলেন। ভাবতে লাগলেন এমনটা কেন হচ্ছে। ভাবতে-ভাবতে আনমনে খোলা জানালা দিয়ে চোখ পড়ল বাইরে উঠানে। তিনি কেঁপে উঠলেন। গত রাতের মত উঠান ভর্তি ভয়ানক চেহারার অনেক লোক। ফকফকা চাঁদের আলোতে লোকগুলোকে যে কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ভাবাই যায় না। তাঁর বুকের ভিতর কেউ যেন দুরমুশ পিটাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন এই লোকগুলো স্বাভাবিক মানুষ নয়–অন্য কিছু!!!

ভীত চোখে লোকগুলোর ওপর চোখ বোলাতে-বোলাতে একটা লোকের ওপর চোখ পড়তেই আরও ভীষণ চমকে উঠলেন। আরে, এই লোকটা তো সেই বৃদ্ধ পাগলটা! আজ বিকেলে রেস্টুরেন্টে যে বৃদ্ধ পাগলকে তিনি জিলাপি দিয়েছিলেন। অন্য সবার মত বৃদ্ধ পাগলটার গায়ে সাদা কাফনের কাপড় নয়।

BanglaBook.org

বিকেলে তাকে যে রূপে দেখেছিলেন তাকে দেখা যাচ্ছে সেই রূপেই। চুল, দাড়ি, ভুরু, চোখের পাতা...সবই আছে। চোখের মণিও কালো। অন্য সবার মত মণিবিহীন সাদা চোখ নয়।

বৃদ্ধ পাগলটা ধীর পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। হেঁটে-হেঁটে নয় যেন শূন্যে ভর করে ভেসে-ভেসে। চোখের মাঝে কেমন কাকুতি-মিনতি। যেন কিছু বলতে চাইছে। বলার জন্যই এগিয়ে আসছে। এমন মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি চলে এল। বাইরে উঠানের দিকে মুখ করে একটা বাল্ব দেয়া আছে। বাল্বটা জ্বলে উঠল। বাল্বের আলোতে সমস্ত উঠান ভরে গেল। সেই সঙ্গে গায়েব হয়ে গেল বৃদ্ধ পাগল সহ ভয়ঙ্করদর্শন লোকগুলো।

বাকি রাতটা আর হানিফ সাহেব ঘুমাতে পারলেন না। এমন একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হবার পর কি আর কারও চোখে ঘুম আসে? তিনি এখন নিশ্চিত এই মানুষগুলো সাধারণ মানুষ নয়, অশরীরী!!! কিন্তু বৃদ্ধ পাগলটা?! তাকে তো বিকেলেও দেখতে পেয়েছেন রেস্টুরেন্টে!

চার

অফিসে হানিফ সাহেবের পাশের টেবিলেই বসেন নুরুল ইসলাম সাহেব। অর্থাৎ দরবেশ ক্যাশিয়ার সাহেব। হেড ক্যাশিয়ার বলে তাঁর টেবিল চারদিক কাঁচ দিয়ে ঘেরা। নতুন ঝকঝকে তকতকে চেয়ার-টেবিল। অফিসে সবার চেয়ে তাঁর কদরই আলাদা।

সাড়ে আটটা থেকে অফিস শুরু। হানিফ সাহেব প্রতিদিন ঠিক সাড়ে আটটার মধ্যেই অফিসে পৌঁছান। মাঝে-মধ্যে হয়তো

BanglaBook.org

কোনও কারণে তাতেই বড় সাহেবের বকুনি খেতে হয়। অথচ নুরুল ইসলাম সাহেব প্রতিদিনই দেড় থেকে দু'ঘণ্টা দেরি করে আসেন। এসে নিজের টেবিলে বসার সঙ্গে-সঙ্গে অফিসের পিয়ন দুটো খবরের কাগজ আর চা দিয়ে যায়। তিনি আরও ঘণ্টাখানিক ধরে পর-পর দু-কাপ চা খেতে-খেতে খবরের কাগজ পড়েন। তাতে কারও কোনও বিকার নেই। বড় সাহেব এজন্য কোনও দিনও তাঁকে কিছু বলেননি। তাঁর ফাঁকি-দেয়া কাজগুলোও হানিফ সাহেবকে করতে হয়। কিন্তু সেই মূল্য হানিফ সাহেব পান না। পান সবার তিরস্কার।

বলতে গেলে গত রাতটা হানিফ সাহেবের না ঘুমিয়েই কেটেছে। কপালের দু'পাশে চিনচিনে ব্যথা করছে। এর পরেও ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছেছেন। রোদের মধ্যে হেঁটে এসেছেন বলে এখন কপালের দু'পাশের চিনচিনে ব্যথার সাথে যুক্ত হয়েছে তীব্র ভোঁতা যন্ত্রণা। তিনি তাঁর টেবিলে বসে পিয়নকে ডেকে এক কাপ আদা দেয়া রং চা দিতে বললেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলে গেছে, চা দেয়া তো দূরে থাক পিয়নের আর দেখা নেই। কয়েকবার গলা চড়িয়ে ডেকেছেনও—কোনও সাড়া-শব্দ নেই। তিনি তো আর দরবেশ ক্যাশিয়ার সাহেব নন যে তাঁর হুকুম পিয়ন তৎক্ষণাৎ পালন করবে।

মাথার যন্ত্রণা চেপে রেখে তিনি কাজে মন বসাতে চাইছেন। কিন্তু পুরোপুরি মন দিতে পারছেন না। মাথার যন্ত্রণার সাথে মাথার ভিতরে উঁকি দিচ্ছে গত দু'রাতের ভয়ানক দৃশ্যটা। কিছুতেই রাতের ঘটনা তিনি মন থেকে সরাতে পারছেন না। ভাবছেন, নুরুল ইসলাম সাহেবকে জানাবেন কিনা। দরবেশ টাইপের মানুষ, সবাই তাঁর কাছ থেকে পানি পড়া, তেল পড়া, তাবিজ-কবচ নেয়। সব শুনে তাঁকেও হয়তো কোনও ফিকির

BanglaBook.org

দেবেন। তবে তাঁকে সব খুলে বলায় সমস্যাও আছে। সবকিছু শোনার পর তিনি এই নিয়ে হাসাহাসিও করতে পারেন। অফিসের সবাইকে জানিয়ে সবার কাছে হানিফ সাহেবকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র বানাতে পারেন।

সোয়া দশটার সময় নুরুল ইসলাম সাহেব এলেন। সাথে-সাথে প্রতিদিনকার মত পিয়ন এসে চা আর খবরের কাগজ দিয়ে গেল।

পিয়নকে দেখে হানিফ সাহেব বললেন, 'আজিজ, আমি তোমার কাছে এক কাপ চা চেয়েছি কখন, এখন পর্যন্ত তো দিলে না?'

পিয়ন আজিজ বলল, 'আফনে রং চা চাইছেন, অফিসে রং চা বানানো হয় না।'

'ঠিক আছে, এক কাপ দুধ চা-ই নিয়ে এসো।'

'দুধ চা-ও তো আর নাই। এক কাপ আছে তা তো দরবেশ ছ্যারের লাইগ্যা।'

নুরুল ইসলাম সাহেব বলে উঠলেন, 'যাও, আজিজ, আমার চা-টা এনে হানিফ সাহেবকে দাও। পিপাসার্তের পিপাসা মিটানো খুব সোয়াবের কাজ। তা পানির পিপাসা হোক আর চায়ের পিপাসা হোক কিংবা মদের পিপাসাই হোক। আল্লাহ পিপাসা মিটাতে বলেছেন, নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নাই।'

পিয়ন আজিজ বিনয়ে মাথা নুইয়ে বলল, 'জি, ছ্যার, এখনই নিয়া আসছি। আফনেরে না হয় আর এক কাপ চা বানাইয়া দিমু।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিয়ন আজিজ হানিফ সাহেবকে এক কাপ চা দিয়ে গেল। হানিফ সাহেব চা খেতে নিয়ে দেখেন, চায়ে সর ভাসছে, সেই সাথে চার-পাঁচটা পিঁপড়া। চুমুক দিতে গিয়ে চুমুক না দিয়ে তিনি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন।

BanglaBook.org

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে দেখে নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন, 'চা খাচ্ছেন না যে?'

হানিফ সাহেব বললেন, 'চায়ে পিঁপড়া ভাসছে।'

'আঙুলের ডগা দিয়ে পিঁপড়া তুলে ফেলে খান। খাওয়ার জিনিস অপচয় করলে আল্লাহ নারাজ হন।'

হানিফ সাহেব আঙুলের ডগা দিয়ে এক-এক করে পিঁপড়াগুলো তুলে ফেলে চায়ে চুমুক দিলেন। চুমুক দিয়ে তাঁর বমি আসার উপক্রম হলো। সিরাপের মত তিতকুটে, ঠাণ্ডা জঘন্য পানীয়। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন এমন চা-ই কি নুরুল ইসলাম সাহেব প্রতিদিন তৃপ্তি সহকারে খান? নিশ্চয়ই না! পিয়ন আজিজ ইচ্ছে করেই তাঁকে এমন তিতকুটে চা বানিয়ে দিয়ে গেছে।

হানিফ সাহেব নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে নুরুল ইসলাম সাহেবের টেবিলে চেয়ার টেনে বসলেন। নুরুল ইসলাম সাহেব গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছেন। হানিফ সাহেব এসে তাঁর টেবিলে বসেছেন এটা টের পেয়ে বোধহয় মনোযোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মুখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরা বলে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

হানিফ সাহেব গলা খাঁকারি দিয়ে আমতা-আমতা করে বললেন, 'নুরুল ইসলাম সাহেব, আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল।'

নুরুল ইসলাম সাহেব খবরের কাগজে মুখ গোঁজা অবস্থায়ই বললেন, 'যা বলতে চান, বলে ফেলুন। কোনও ভণিতা করার দরকার নেই।'

'একটা সমস্যায় পড়েছি।'

'কী সমস্যা?'

হানিফ সাহেব ইতস্তত গলায় বললেন, 'দু'দিন হলো আমার

BanglaBook.org

স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। বাড়িতে আমি একা...'

নুরুল ইসলাম সাহেব, হানিফ সাহেবকে বলে শেষ করতে না দিয়ে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে রেখেই বলে উঠলেন, 'তো কী হয়েছে? খালি বাড়িতে, বাইরে থেকে মেয়েমানুষ এনে, আকাম-কুকাম করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে ধরা খেয়েছেন নাকি? পুরুষমানুষের তো হুলো বিড়ালের মত ভাজা মাছ চুরি করে খাওয়ার অভ্যেস।'

হানিফ সাহেব লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, 'ছি, ছি, এসব কী বলছেন?!! অন্য ব্যাপার।'

নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন, 'নামাজ-রোজা করেন না, ঈমানের জোর নাই, তাই ভাবলাম যার ঈমানের জোর নাই সে যে কোনও অপকর্মই করতে পারে। তা অন্য ব্যাপারটা কী?'

হানিফ সাহেবের এখন আর নুরুল ইসলাম সাহেবকে কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না। যে লোক সব না শুনে শুধু মাত্র স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে বাড়িতে নেই শুনেই আজেবাজে দিক ভেবে নেয়, তাঁকে সবকিছু জানানোর পর না জানি কী মন্তব্যই করেন?!

নুরুল ইসলাম সাহেব মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে খুবই আগ্রহী গলায় বললেন, 'চুপ করে আছেন যে? বলছেন না কেন কী ব্যাপার?'

হানিফ সাহেব মনে-মনে ভাবলেন, একবার বলতে শুরু করে এখন না বললেও সমস্যা। তা হলে কী ধারণা করে কী রটাবেন, কে জানে?!

হানিফ সাহেব ইতস্তত ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'গত দু'রাত, মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে ঘরের মধ্যে অনেক লোকের অবস্থানের টের পাচ্ছি। আলো জ্বালতেই দেখি কেউ নেই। আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, উঠান ভর্তি ভয়ঙ্কর চেহারার কতগুলো

BanglaBook.org

লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক পর্যায়ে লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়।'

নুরুল ইসলাম সাহেব হতাশ হওয়া গলায় বললেন, 'ওহ্, এই ব্যাপার! ও কিছু না। আপনার ওপর বদ জিনদের আছর হয়েছে। যারা নামাজ-রোজা করে না, আল্লাহ-খোদার নাম নেয় না, পেচ্ছাপ-পায়খানা করে ওজু না করে, দোয়া-দরূদ না পড়ে ঘুমায়, এমন বদ লোকদের ওপর মাঝে-মাঝে বদ জিন-পরীরা আছর করে। বদ জিনেরা এসে ভয় দেখায় আর বদ পরীরা এসে এমন রূপে দেখা দেয়, এমন সব কাণ্ড করে যে স্বপ্নদোষ হয়ে যায়...'

হানিফ সাহেব নুরুল ইসলাম সাহেবের বিরক্তিকর আজেবাজে সব কথা শুনে যে মুহূর্তে মন খারাপ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের টেবিলে ফিরে আসবেন, ঠিক তখন তাঁর চোখ পড়ল নুরুল ইসলাম সাহেবের টেবিলের উপর রাখা দুটো খবরের কাগজের একটার খবরের হেড লাইনে। আঞ্চলিক খবরের কাগজ সেটা। হেড লাইনে লেখাঃ ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বৃদ্ধ ভবঘুরে পাগলের মৃত্যু।' লাশের ছবি ইনসেটে। ইনসেটের ছবিটা দেখে হানিফ সাহেব থমকে গেলেন। পরিচিত চেহারা মনে হচ্ছে। নুয়ে ভালভাবে দেখতে চাইলেন।

নুরুল ইসলাম সাহেব হানিফ সাহেবকে নুয়ে খবরের কাগজ দেখতে দেখে দরাজ গলায় বললেন, 'যান, পেপার দুটো নিজের টেবিলে নিয়ে গিয়ে পড়ুন। আমার পড়া শেষ। পেপার পড়ে সময় নষ্ট করলে তো চলবে না আমার, মাথার উপর অনেক দায়িত্ব।'

হানিফ সাহেব খবরের কাগজ দুটো নিজের টেবিলে এনে, 'ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বৃদ্ধ...' শিরোনামের পাগলের ইনসেটের ছবিটা ভালভাবে দেখে শনাক্ত করে ফেললেন মৃতকে। গতকাল রেস্টুরেন্টে যে বৃদ্ধ পাগলকে তিনি জিলাপি দিয়েছিলেন, সেই পাগলটা।

প্রতিবেদনটা সম্পূর্ণ পড়ে জানতে পারলেন, গতকাল সন্ধ্যা

BanglaBook.org

সাতটা থেকে সোয়া সাতটার দিকে নগরীর আমতলার মোড়ের ওখানে বৃদ্ধ পাগলটা রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। লাশ মর্গে রাখা হয়েছে পোস্টমর্টেমের জন্য। ঘাতক ট্রাক ড্রাইভারকে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়নি...এইসব।

গতকাল মাঝ রাতে ভয়ঙ্কর চেহারার সেই লোকগুলোর সাথে এই বৃদ্ধ পাগলটাকেও দেখতে পেয়েছেন হানিফ সাহেব। কী সাংঘাতিক ব্যাপার!! সন্ধ্যা সাতটা-সোয়া সাতটায় যে লোক মারা গেছে মাঝ রাতে তাকে আবার তিনি দেখতে পেয়েছেন তাঁর বাড়ির উঠানে!!!

পাঁচ

আজ হানিফ সাহেব ঘরের বাতি জ্বেলে রেখে শুয়েছেন। গত দুই রাতের স্মৃতি তিনি কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছেন না। নুরুল ইসলাম সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক আজ অজু করে, দোয়া-দরূদ পড়ে বুকে ফুঁ দিয়েও নিয়েছেন। এত কিছুর পরও ভয়ে ঘুম আসছে না। বার-বার মনে শঙ্কা জাগছে, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই ওই অশরীরীগুলো এসে উপস্থিত হবে।

শঙ্কিত মনে ভাবতে-ভাবতে যখন তাঁর চোখে তন্দ্রার একটু লেশ এসেছে, সেই মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। সমস্ত ঘর ডুবে গেল গভীর অন্ধকারে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর তন্দ্রার লেশ উবে গিয়ে বুকের ভিতর ধুপধুপ করতে লাগল। এই বুঝি অশরীরীরা এসে পড়ল!!! আজ শোবার আগে ভুলে মোবাইল ফোনটাও বালিশের নীচে নিয়ে শোননি।

BanglaBook.org

কী আশ্চর্য! সত্যিই ঘর ভরে যাচ্ছে সেই বিদঘুটে আতর মিশ্রিত মাংস পোড়া গন্ধে! হানিফ সাহেব ভয়ে নিশ্চল হয়ে বিছানার সাথে সিঁটিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, এখন ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছে। অনেক লোকের হিসহিস করা গলার স্বরের ফিসফিসানি।

ফিসফিসানির শব্দের মাঝ থেকে অন্ধকারের বুক চিরে একটা মোলায়েম গলা বলে উঠল, 'আপনি শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন আমাদের। আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করতে আসিনি।'

হানিফ সাহেব গলার স্বরটা চিনতে পারলেন। সেই বৃদ্ধ পাগলটার গলার স্বর। 'কোনও ক্ষতি করতে আসিনি'—এ কথায় কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে হানিফ সাহেব কাঁপা-কাঁপা গলায় কোনওক্রমে বললেন, 'আপনারা কারা? আমার কাছে কী চান?'

অন্ধকারের মাঝে আবার সেই গলার স্বর, 'আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না। আমরা হচ্ছি অপঘাতের মৃতরা। আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে। কেউ রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে, কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ খুন হয়ে, কেউ আগুনে পুড়ে, কেউ উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে...'

হানিফ সাহেব বসে-যাওয়া গলায় আবার কোনওক্রমে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা আমার কাছে কেন আসেন?'

'যখন কেউ আমাদের সঙ্গী হতে যায় তখন আমরা তাঁর আশপাশে ঘোরাঘুরি করি। আপনি ছাড়া আর কেউই আমাদের কখনও দেখতে পায়নি। বুঝতে পারছি না কী কারণে আপনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন।'

'বুঝলাম না কেউ আপনাদের সঙ্গী হতে যায় মানেটা কী?'

'মানে, আমাদের মত তারও অপঘাতে মৃত্যু হবে। সে আমাদের নতুন সঙ্গী হবে। নতুন সঙ্গীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন আগে থেকে আমরা তার আশপাশে ঘোরাঘুরি করি। নতুন সঙ্গীকে চিনে নিই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ অপঘাতের মৃতদের দেখতে পাওয়া

BanglaBook.org

তো দূরের কথা, কথাও শুনতে পায়নি। শুধু আপনার ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম ঘটছে।'

আতঙ্কিত হয়ে হানিফ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ক্ষেত্রেই মানে?!! কী বলতে চাচ্ছেন?!!'

'আপনিও আমাদের মত অপঘাতে মারা যাবেন। আজই আপনার শেষ রাত। কাল সন্ধ্যায় ঘটনাটা ঘটবে।'

'কী বলছেন এসব?!!'

'হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় আপনি যখন অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে উঠান পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবেন তখন একটা গোখরো সাপ আপনাকে ছোবল দেবে। সেই সাপের ছোবলেই আপনার মৃত্যু হবে।'

'কাল সন্ধ্যায় এই বাড়ির উঠানে আমি সাপের ছোবল খাব?! সেই ছোবলে আমার মৃত্যু হবে?! কী বলছেন!! সত্যিই কি ব্যাপারটা ঘটবে? আপনারা কি সত্যি? নাকি সবই আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা?'

'হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় সাপের কামড়ে আপনার মৃত্যু হবে। এটাই নিয়তি।'

হানিফ সাহেব অসহায় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'এই নিয়তিকে কি বদলানো যায় না!?'

'হয়তো যায়। উঠানের কুল গাছটার গোড়ায় একটা গর্তের ভিতর ওই সাপটার বাস। কাল সন্ধ্যায় গরমে অতিষ্ঠ হয়ে সাপটা গর্ত থেকে বেরিয়ে উঠানে উঠে থাকবে। আপনি অন্ধকারে না দেখে সাপটার গায়ে পা ফেলবেন, অমনি সাপটা আপনাকে ছোবল দেবে। এই নিয়তিকে বদলাতে হলে কাল সন্ধ্যার আগে সাপটাকে মেরে ফেলতে হবে। সন্ধ্যার আগে সাপটার মৃত্যুতে আপনার ওপরের ফাঁড়া কেটে যাবে।'

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। মুহূর্তে এনার্জি সেভিং বাল্বের

BanglaBook.org

উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত ঘর ভরে গেছে। কোথাও কেউ নেই। আত্মারা বোধহয় আলো সহ্য করতে পারে না। তারা অন্ধকারের বাসিন্দা।

উত্তেজনায় সারা রাত আর এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারলেন না হানিফ সাহেব। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে উঠানের কুল গাছটার গোড়ায় গেলেন। সত্যিই কুল গাছটার গোড়ায় একটা সরু গভীর গর্ত। কিন্তু সেই গর্তে সাপ আছে কিনা উপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হানিফ সাহেব ঘরে ফিরে এসে বড় একটা কেতলি ভরে পানি গরম করলেন। গরম পানি ভরা কেতলি আর একটা পোক্ত বাঁশের লাঠি হাতে আবার কুল গাছটার গোড়ায় গেলেন। এক হাতে লাঠি উঁচিয়ে রেখে অন্য হাতে কেতলির নল দিয়ে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি গর্তে ঢালতে লাগলেন। এক পর্যায়ে গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল মৃত্যুদূত। হানিফ সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে হাত থেকে কেতলি ফেলে দিয়ে, দু'হাতে শক্ত ভাবে লাঠিটা চেপে ধরে, সাপটার গায়ে বিদ্যুৎ গতিতে এলোপাতাড়ি বাড়ি দিতে লাগলেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত একের পর এক বাড়ি দিতেই থাকলেন যতক্ষণ অবধি না সাপটা পুরোপুরি নিথর হলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

সারা দিন ঘরের মধ্যে ঝিম ধরে বসে রইলেন হানিফ সাহেব। অফিসেও যাননি। ভোর বেলা সাপটাকে মারার পর থেকে কী এক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর মনের ভিতরে। নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করাতে পারছেন না, সত্যিই গত রাতে অপঘাতে মৃত আত্মারা এসে তাঁর নিয়তিকে বদলানোর উপায় বাতলে দিয়েছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না! কেউ না! তাঁর নিজের মনও এখনও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দুলছে।

রাত তিনটা।

হানিফ সাহেব ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার পাশে বসে, উঠানের দিকে তাকিয়ে গভীর আগ্রহে অপঘাতে মৃত আত্মাদের অপেক্ষা করছেন। বাইরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অস্পষ্ট চাঁদের আলো। ম্লান চাঁদের আলোতে শূন্য উঠানটাকে মনে হচ্ছে যেন মায়াজগৎ।

হানিফ সাহেবের চোখের সামনেই শূন্য উঠানে শত-শত ছায়া-ছায়া অবয়ব ধীরে-ধীরে আকৃতি নিল। তাদের মাঝে বৃদ্ধ পাগলটাও আছে।

বৃদ্ধ পাগলটা সবাইকে পিছনে ফেলে জানালার কাছে এগিয়ে এল। হানিফ সাহেব চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনাদের কাছে আমি চির ঋণী। কাল রাতে যদি আপনারা এসে আমাকে সতর্ক করে না যেতেন তা হলে আমিও

BanglaBook.org

হয়তো এতক্ষণে আপনাদের মত অপঘাতে মৃত আত্মা হয়ে যেতাম।'

বৃদ্ধ বলে উঠল, 'আমরা কিছুই করিনি। আপনি খুবই ভাল মানুষ, তাই সৃষ্টিকর্তাই আপনাকে রক্ষা করেছেন। আমরা তো যারাই অপঘাতে মারা যাবে তাদের প্রত্যেকের আশপাশে গিয়ে চল্লিশ দিন আগে থেকে ঘোরাঘুরি করি। কিন্তু কেউ আমাদের উপস্থিতি টের পায় না। টের পায় না তার যে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আপনি আমাদের দেখতে পেয়েছেন এই জন্যে–সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য আপনাকে রক্ষা করার, তাই। তা না হলে আপনাকে কোনওভাবেই জানাতে পারতাম না–বরই গাছের গোড়ায়, গর্তে, মৃত্যু যে আপনার অপেক্ষা করছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটার পর হানিফ সাহেব বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি ছাড়া আপনার সঙ্গের অন্য কারও চেহারা স্বাভাবিক মানুষদের মত নয় কেন?'

বৃদ্ধ বলতে লাগল, 'এরা সবাই চল্লিশ দিন পার করে ফেলেছে। মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত জীবিত অবস্থার চেহারা থাকে। আর আত্মা হয়ে ততদিন পৃথিবীতে থাকে–যদি তার অপঘাতে মৃত্যু না হত তা হলে যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকত ততদিন। এরপর আত্মারা আকাশের দূর অজানায় হারিয়ে যায়। মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনে কবরের মধ্যে দেহটা পচে-গলে নষ্ট হয়ে যায় আর আত্মার চেহারাও অন্য রূপ নেয়। আত্মার চেহারা থেকে স্বাভাবিক মানুষের চেহারা উধাও হয়ে যায়। এমনকী বাক্‌শক্তিও আর থাকে না। মুখ দিয়ে হিসহিস-ফিসফিস ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। নারী, পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সব আত্মার একই চেহারা হয়। লক্ষ করে দেখুন, আমার পেছনে যে শত-শত অপঘাতে মৃত অতৃপ্ত আত্মা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই একই চেহারা।'

BanglaBook.org

হানিফ সাহেব বৃদ্ধের পিছনে দাঁড়ানো অন্যান্য আত্মাদের ওপর ভালভাবে চোখ বুলিয়ে দেখেন, সত্যিই প্রত্যেকেরই চেহারা একই। গায়ে কাফনের কাপড় পেঁচানো। পাট কাঠির মত শুকনো, চুল নেই, দাড়ি নেই, ভুরু নেই, নাক নেই, চোখের পাতা নেই, নেই চোখের মণি।

সবার মুখের ওপর চোখ বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ হানিফ সাহেব চমকে উঠলেন—একপাশে দাঁড়ানো একটা মেয়েকে দেখে। মেয়েটাও বৃদ্ধ পাগলের মত স্বাভাবিক মানুষের চেহারার!

হানিফ সাহেব মেয়েটার দিকে আঙুল তুলে বৃদ্ধকে বললেন, 'ওই মেয়েটারও তো আপনার মত স্বাভাবিক মানুষের চেহারা!'

বৃদ্ধ বলল, 'ওই মেয়েটা আজ রাত এগারোটায় আত্মহত্যা করে মারা গেছে। আগেই তো বলেছি মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর্যন্ত আত্মার চেহারা অবিকৃত থাকে।'

হানিফ সাহেব অবাক হওয়া গলায় বলে উঠলেন, 'আমার বড় মেয়ের বয়সী এতটুকু একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে কেন?!'

বৃদ্ধ বলল, 'বাবার বয়সী একটা লোকের কাছে ধর্ষিতা হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে।'

'ছি, ছি, পৃথিবীতে এমন নরপশুও কি আছে?! মেয়ের বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ করতে চায়?!!'

'আপনি সহজ-সরল ভাল মানুষ বলে আপনার কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে। বাস্তবে অমন নরপশুতেই পৃথিবী ভরে গেছে।'

হানিফ সাহেব গভীর মমতা নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখেন, মেয়েটা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মেয়েটার দু'চোখ ছাপিয়ে অঝোর ধারায় লোনা জল ঝরছে। এতটুকু একটা মেয়ে, এই বয়সেই মারা গিয়ে না জানি কতটা ভয় পাচ্ছে!!!

হানিফ সাহেব বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বলে

BanglaBook.org

উঠলেন, 'আয়, মা, আমার কাছে আয় তো, তোর মাথায় হাত বুলিয়ে তোকে একটু আদর করে দিই।'

সাত

দরজায় অনবরত কড়া নাড়ার শব্দে হানিফ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। সকাল সাড়ে সাতটা। বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দেখলেন, দরজার সামনে তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু বুঝে উঠবার আগেই তাঁর বড় মেয়েটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

কাঁদতে-কাঁদতে বড় মেয়েটা বলল, 'বাবা, পরশু রাতে তোমাকে নিয়ে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি! দেখেছি, তুমি যেন মরে গেছ!! এরপর থেকে তোমাকে দেখার জন্য মনটা খুব ছটফট করতে থাকে। তাই আজ রাতের বাস ধরে আমরা ফিরে এসেছি।'

হানিফ সাহেব মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'না, মা, আমার কিচ্ছু হয়নি, আমি ভাল আছি। তুই আর কাঁদিস না।'

মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে হানিফ সাহেবের চোখও ভিজে উঠেছে। মেয়েটা যে তাঁকে এত বেশি ভালবাসে তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি।

হানিফ সাহেবের স্ত্রী রেবেকা কপট রাগী গলায় বলে উঠলেন, 'দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা-মেয়েকে আর কাঁদতে হবে না। আমরা বাড়িতে না থাকায় সেই সুযোগে কত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছ সেই খেয়াল আছে? অফিসে যেতে হবে না? এই ক'দিনে চেহারার কী

BanglaBook.org

হাল বানিয়েছ? ঠিক মত খাওয়া-দাওয়াও বোধহয় করনি। আমি নাস্তা বানাচ্ছি, তুমি অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হও। আমরা অনেকগুলো আম-কাঁঠাল নিয়ে এসেছি। তুমি কাঁঠালের বিচি খুব পছন্দ করো বলে তোমার জন্য কতগুলো বিচিও নিয়ে এসেছি। দুটো রাজহাঁসও এনেছি। সন্ধ্যায় তুমি অফিস থেকে ফেরার পর কাঁঠালের বিচি দিয়ে রাজহাঁসের মাংস আর পোলাও রান্না করে সবাই মিলে খাব।'

অফিসে হানিফ সাহেব নিজের টেবিলে বসার সঙ্গে-সঙ্গে পিয়ন আজিজ এসে বলল, 'বড় সাব আফনেরে দেখা করতে কইছে।'

হানিফ সাহেবের বুকের ভিতর দুরুদুরু করতে লাগল। কাল অফিস কামাই দিয়েছেন, আজও আধ ঘণ্টা লেট করে ফেলেছেন, না জানি বড় সাহেব কী বলবেন?!

শঙ্কিত মনে হানিফ সাহেব বড় সাহেবের রূমে ঢুকলেন। বড় সাহেব তাঁকে ঢুকতে দেখেই অতি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, 'আসুন, আসুন, এতক্ষণ ধরে আপনার অপেক্ষাই করছি। আপনি ছাড়া তো আর কেউ ঠিক সময় মত অফিসে আসে না।'

বড় সাহেবের আন্তরিক ব্যবহারে হানিফ সাহেব আরও ঘাবড়ে গেলেন। না জানি আজ কপালে কী আছে! চাকরিটাই গেল নাকি?!!

বড় সাহেব আবার আন্তরিক গলায় বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।'

হানিফ সাহেব বড় সাহেবের মুখোমুখি চেয়ারে জড়সড় ভঙ্গিতে বসলেন। বড় সাহেব ইন্টারকম তুলে তাঁর রূমে চা-নাস্তা পাঠাতে বললেন।

ইন্টারকমের রিসিভার যথাস্থানে রাখতে-রাখতে বড় সাহেব হানিফ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নুরুল ইসলাম সাহেবের

BanglaBook.org

খবর শুনেছেন?'

হানিফ সাহেব নার্ভাস গলায় বললেন, 'না, স্যর, কী খবর?'

'বলেন কী! এখনও শোনেননি!! নুরুল ইসলাম সাহেব তো গত রাতে পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হয়েছেন।'

হানিফ সাহেব প্রচণ্ড অবাক হয়ে চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'বলেন কী, স্যর!! উনি পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হবেন কেন?!'

'আপনি দেখি কিছুই জানেন না। আজকের প্রতিটা দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায়ও তো নিউজটা এসেছে।'

'স্যর, আপনি এসব কী বলছেন?! নুরুল ইসলাম সাহেবের মত সুফি-পরহেজগার একজন মানুষকে পুলিশ অ্যারেস্টই বা করবে কেন?! আর তিনি পেপারের নিউজই বা হবেন কেন?! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!!!'

'সুফি না বলে শয়তান বলুন। ভণ্ড!! মুখোশধারী ভণ্ড একটা!!'

হানিফ সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, 'স্যর, খোলসা করে বলুন তো কী ব্যাপার? ওনার মত একজন ধর্মভীরু মানুষ শয়তান হবেন কেন?!!'

বড় সাহেব বলতে লাগলেন, 'ঘটনা এমন–গতকাল রাত এগারোটার দিকে ফকিরাপুলের কাছাকাছি একটা আবাসিক হোটেলের তিনতলার বারান্দা থেকে একটি অল্প বয়সী মেয়ে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে আত্মহত্যা করে। ওই এলাকার লোকজন অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করত, ওই হোটেলটায় কোনও অসামাজিক কার্যকলাপ হয়। মেয়েটা লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে আত্মহত্যা করার পর উত্তেজিত জনতা হোটেলটাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে হোটেলের ভিতর থেকে হোটেলের ম্যানেজার, কর্মচারী সহ দশ-বারোজন পতিতা, সাত-আটজন খদ্দের এবং পতিতাদের দুইজন দালালকে গ্রেফতার করে। সেই সাত-আটজন খদ্দেরের মধ্যে নুরুল ইসলাম

BanglaBook.org

সাহেবকেও পাওয়া যায়। পুলিশ প্রথমে নুরুল ইসলাম সাহেবকে অন্যান্য সাধারণ খদ্দেরদের মতই একজন মনে করেছিল। পরে হোটেলের ম্যানেজার, কর্মচারী এবং পতিতাদের দালালদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর আসল তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে ওই হোটেলের মালিকই হচ্ছেন নুরুল ইসলাম সাহেব।

'অনেক দিন ধরেই ওই হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে আসছে। দালালরা দরিদ্র ঘরের অশিক্ষিত সহজ-সরল মেয়েদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওই হোটেলে নিয়ে গিয়ে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করত। যে মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে সেই মেয়েটাকে গতকালই ভুলিয়ে-ভালিয়ে হোটেলে আনা হয়। নুরুল ইসলাম সাহেব যেহেতু হোটেলের মালিক তাই তাঁর একটা নির্দেশ, নতুন কোনও মেয়েকে আনলে সেই মেয়ের প্রথম সতীত্ব হরণ করবেন নুরুল ইসলাম সাহেব নিজে। কাল তিনতলার একটা রুমে নতুন আনা ওই মেয়েটার সতীত্ব হরণ করতে গিয়ে বাধে বিপত্তি। মেয়েটা নুরুল ইসলাম সাহেবের কবল থেকে কোনওক্রমে মুক্ত হয়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে, বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।'

হানিফ সাহেব বড় সাহেবের বলা কথাগুলো শুনতে-শুনতে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা অবিশ্বাস্য লাগছে! নুরুল ইসলাম সাহেবের মত অতি ধার্মিক একজন লোক এমন জঘন্য কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন তা তাঁর এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

বড় সাহেব আবার বলতে লাগলেন, 'পুলিশ তো খোঁজ-খবর করে নুরুল ইসলাম সাহেব সম্পর্কে সব তথ্যই পেয়ে যায়। তারা এটাও জেনে যায় তিনি যে একটা ইনশ্যুরেন্স কোম্পানির ক্যাশিয়ার। পুলিশের মনে প্রশ্ন জাগে ইনশ্যুরেন্স কোম্পানির

BanglaBook.org

ক্যাশিয়ার হয়ে এত টাকা পেলেন কোথায় যে একটা তিনতলা হোটেলের মালিক হয়েছেন। তদন্তে বেরিয়ে আসে–নুরুল ইসলাম সাহেব বিদেশ থেকে আসা তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে ব্যবসার নাম করে পঞ্চাশ লাখ টাকা নেন। টাকা নেবার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সেই বন্ধু নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশ ধারণা করছে সেই বন্ধুকে তিনি নিজে বা অন্য কাউকে দিয়ে খুন করিয়ে গুম করেছেন। বন্ধুর কাছ থেকে মেরে-দেয়া সেই পঞ্চাশ লাখ টাকা এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের এই ইনশ্যুরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা সরিয়ে হোটেলটা কিনেছেন।'

কথার মাঝে পিয়ন আজিজ চা-নাস্তা দিয়ে গেল।

আজিজ চলে যাবার পর বড় সাহেব হানিফ সাহেবকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে-দিতে বলতে লাগলেন, 'আজ থেকে এই ইনশ্যুরেন্স কোম্পানির হেড ক্যাশিয়ার আপনি। আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার সাথে খুবই অন্যায় করা হয়েছে, চুরি না করেও আপনি একবার চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এখন বুঝতে পারছি আসলে চুরিটা কে করেছিল। জরিমানা হিসেবে আপনি যে টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকার ডাবল টাকা আপনাকে ফেরত দেয়া হবে।'

হানিফ সাহেব বড় সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে বসতেই পিয়ন আজিজ এসে অতি বিনয়ী ভঙ্গিতে দুটো খবরের কাগজ আর এক কাপ রং চা দিয়ে গেল।

আনমনে হানিফ সাহেব একটা খবরের কাগজ মেলে ধরতেই প্রথম পৃষ্ঠায় একটা হেড লাইনে তাঁর চোখ পড়ল–'মুখোশধারী শয়তানের মুখোশ উন্মোচন।' ইনসেটে নুরুল ইসলাম সাহেবের ছবি। নুরুল ইসলাম সাহেবের ছবির পাশে যে মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে সেই মেয়েটার ছবি। গত রাতে হানিফ সাহেব এই

BanglaBook.org

মেয়েটাকেই অপঘাতে মৃত আত্মাদের সাথে দেখেছেন।

সন্ধ্যার আগে-আগে হানিফ সাহেব অফিস থেকে ফেরার পথে, পথের পাশের সেই রেস্টুরেন্টের সামনে রাস্তায় অনেক লোকজনের জটলা আর দমকল বাহিনীর গাড়ি এবং দমকল বাহিনীর লোকদের ছোটাছুটি দেখে ভিড়ের মাঝের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার?! লোকটা জানায়, গ্যাসের সিলিণ্ডার বিস্ফোরণ হয়ে রেস্টুরেন্টে আগুন লেগেছে। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার এবং একটা কর্মচারী আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

হানিফ সাহেব ভিড়ের মাঝে মিশে গিয়ে কিছুক্ষণ দমকল বাহিনীর উদ্ধার কাজ দেখে বাড়ির পথ ধরলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে রাতের আঁধার নেমে আসছে। হাঁটতে-হাঁটতে উদাসীন হয়ে হানিফ সাহেব ভাবছেন, যে বৃদ্ধ পাগলকে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার একদিন দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ থেকে সেই পাগল আর ম্যানেজার একই দলের। মৃত্যুর পরে পাগল, সুস্থ, ধনী, গরিব, যুবক, বৃদ্ধ বলে কোনও বিভেদ থাকে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ

রাত পৌনে তিনটা। বজলু সিটি হাসপাতালের সামনে ঘোরাঘুরি করছে। উত্তেজনায় দরদর করে ঘামছে। সে এসেছে হাসপাতাল থেকে একটা লাশ নিতে। পরিচিত কারও লাশ নয়। বেওয়ারিশ লাশ।

হাসপাতালের মর্গে অনেক ধরনের বেওয়ারিশ লাশ থাকে। সেখান থেকে একটা অল্প বয়সী মেয়েমানুষের লাশ বজলু কিনে নিচ্ছে। মর্গের কেয়ারটেকারের সঙ্গে গোপনে এই বন্দোবস্ত করেছে। এ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়েছে মর্গের কেয়ারটেকারকে। কেয়ারটেকার রাত দুটোর দিকে লাশ নেবার জন্য পিকআপ ভ্যান নিয়ে হাসপাতালের সামনে অপেক্ষা করতে বলেছে। ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করেছে। সুযোগ বুঝে কেয়ারটেকার নিজেই মর্গ থেকে স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে এসে ভ্যানে উঠিয়ে দেবে।

পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভার বার-বার হাই তুলছে আর অধৈর্য গলায় বলছে, 'ভাইজান, লাশ আইতে আর কতুক্ষণ লাগবে? যে লোকের লাশ নিবেন সে কি এহনও মরে নাই? কহন মরবে? গিয়া এট্টু বলেন তাড়াতাড়ি মরতে। খুব ঘুম পাইতেছে।'

বজলু কিছু বলছে না। সে অস্থির ভঙ্গিতে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছে আর ফিরে-ফিরে হাসপাতালের গেটের দিকে তাকাচ্ছে। এই বুঝি মর্গের কেয়ারটেকার লাশ নিয়ে গেট

BanglaBook.org

দিয়ে বের হচ্ছে। ব্যাটা এখনও যে কেন আসছে না বুঝতে পারছে না! ভ্যানে করে লাশটা নিয়ে তাকে রাত সোয়া চারটার আগে ধূপপুর জঙ্গলে পৌঁছতে হবে। সোয়া চারটার পর পৌঁছলে কোনও কাজেই আসবে না। সবকিছু বৃথা যাবে।

বজলু একটা ইনশ্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে। তিন কুলে তার কেউ নেই। থাকার মধ্যে গ্রামে বৃদ্ধা মা ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি মারা যান। এরপর থেকে বজলুর একেবারে একাকী জীবন-যাপন। দু'কামরার একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে সে। খুবই সাদাসিধে জীবন তার। অফিস আর বাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বন্ধু-বান্ধব-পরিচিতজন বলতে তেমন কেউ নেই। বলা যায় পরিচিতদের মধ্যে শুধু অফিসের কলিগরা। তাদের সঙ্গেও বজলুর সম্পর্ক তেমন ভাল নয়। বজলু নির্বোধ ধরনের লোক। কারও সঙ্গেই মিশতে পারে না।

বজলুর একটা মোবাইল ফোন আছে। এক সময় মোবাইল ফোনটা তার কোনও কাজেই লাগত না। তার ফোনে কখনও কারও ফোন আসত না। তারও কাউকে ফোন করার প্রয়োজন হত না।

তার মা যখন জীবিত ছিলেন তখন মাঝে-মাঝে ফোনটার ব্যবহার হত। তার মায়ের কোনও ফোন ছিল না। তার মা এর-ওর ফোন দিয়ে তাকে একটা মিসড কল দিতেন। সে তখন আবার ওই নাম্বারে কল ব্যাক করত। কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে কথা হত।

মায়ের মৃত্যুর বছর তিন বাদে এক গভীর রাতে তার মোবাইল ফোনে একটা মিসড কল আসে। সে ঘুম থেকে জেগে অভ্যাসবশত সেই নাম্বারে কল ব্যাক করে। কয়েকবার রিং হবার পর ওপাশে শোনা যায় একটা মেয়ে কণ্ঠ। খুবই মিষ্টি একটা কণ্ঠ বলছে, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

BanglaBook.org

বজলু ঘুম জড়ানো গলা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে বলল, 'আপনি কে বলছেন?'

মিষ্টি কণ্ঠটা বিরক্ত গলায় বলল, 'আমি কে, তা জানেন না–তা হলে ফোন দিয়েছেন কেন? এত রাতে অপরিচিত কারও সঙ্গে ফাজলামি করার জন্য ফোন দিয়েছেন? আমার নাম্বার পেয়েছেন কীভাবে?'

বজলু কিছুটা চটে গিয়ে বলল, 'দেখুন, আমি শুধু-শুধু আপনাকে ফোন দিইনি। আপনার এই নাম্বার থেকে একটু আগে আমার ফোনে একটা মিসড কল আসে। আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়।'

মেয়েটা কিছু মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে বলল, 'ওহ্, সরি! মনে ছিল না! আমি অন্য একটা নাম্বারে ফোন দিতে গিয়ে একটা ডিজিট ভুল লিখে কল দিয়ে ফেলি। বুঝতে পেরে পরক্ষণেই কেটে দিই। সেটাই যে আপনার নাম্বার এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। ভুল হয়ে গেছে! ক্ষমা করে দেবেন! মিসড কল দিয়ে আপনার ঘুম ভাঙানোয় খুবই লজ্জিত!'

বজলু বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, লজ্জিত হবার কিছু নেই। এরকম অনেক সময় হয়ে যায়। আপনি কোথা থেকে বলছেন?'

'আমি কুমিল্লা থেকে বলছি। আমার বাড়ি কুমিল্লায়। আপনি কোথা থেকে বলছেন?'

'চিটাগাং থেকে। আমি চিটাগাঙে একটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করি। দেশের বাড়ি পটুয়াখালী। আচ্ছা, আপনার নাম কী?'

'আমার নাম দিনা।'

এভাবে মোবাইল ফোনে দিনার সঙ্গে পরিচয় হয় বজলুর। দিনে-দিনে সম্পর্ক গাঢ় হয়। একজন আরেকজনকে না দেখেই প্রেমে পড়ে যায়। বজলু প্রায়ই দিনার ঠিকানায় দামি-দামি গিফট

BanglaBook.org

পাঠিয়ে দেয়। দিনাও মাঝে-মাঝে ছোট-খাট দু'-একটা গিফট পাঠায়। এক সময় দু'জন দু'জনকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দিনা সরাসরি দেখা করতে সাহস পায় না। ভয় পায়, যদি দিনাকে দেখে বজলুর পছন্দ না হয়। তখন বজলু দিনাকে ফটো পাঠাতে বলে। দিনা বলে, 'আগে তুমি পাঠাও। এরপর আমি পাঠাব। ছেলেদের আগে ভূমিকা রাখতে হয়।'

বজলু তার একটা ফটো পাঠিয়ে দেয়। বজলুর চেহারা খুবই খারাপ। অত্যন্ত রোগা। চোয়াল ভাঙা। কণ্ঠার হাড় জাগা। মাথার চুলও পাতলা হয়ে এসেছে। গায়ের রঙ পাতিলের তলার মত কালো। চেহারায় কেমন চোর-চোর ভাব। এরপরও নিজেকে যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় করে তুলে, কমপ্লিট স্যুট পরে, ফটো তুলে পাঠিয়ে দেয়।

দিনার কাছে ফটো পৌছনোর পর বজলু দিনাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, আমাকে দেখে কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

দিনা আহ্লাদী গলায় বলে, 'খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি তো খুবই স্মার্ট!'

'আমি যে দেখতে রোগা, কালো—এতে তোমার খারাপ লাগেনি?'

'আরে নাহ্! বোম্বের নায়কদের দেখো, তারা সবাই তো রোগা-পাতলা। আর গায়ের রঙ কালো, এটা কোনও ব্যাপারই না। গায়ের রঙ ফর্সা হলেই কেউ দেখতে যে খুব সুন্দর, এটা ঠিক নয়।'

দিনার কথা শুনে বজলু খুব খুশি হয়। খুশি হয়ে বলে, 'এখন তোমার ফটো পাঠিয়ে দাও। তুমি দেখতে যেমনই হও, তাতে কোনও সমস্যা নেই। আমি তোমাকে চিরকাল ভালবেসে যাব!'

দিনা বলে, 'আচ্ছা, ফটো পাঠিয়ে দেব।'

এরপর থেকে দিনার সঙ্গে বজলুর আর যোগাযোগ হয় না।

BanglaBook.org

বজলু দিনার ফোনে ফোন দেয়, রিং হয়–কিন্তু দিনা ফোন ধরে না। বজলু দুশ্চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। দিনার হলোটা কী!? অসুখ-বিসুখ করল নাকি?!...কী হলো?!

এভাবে পনেরো-ষোলো দিন কেটে যায়। বজলু প্রতিদিন দিনার ফোনে ফোন দিয়েই যায়। অবশেষে কেউ একজন ফোন ধরে। ফোন ধরতেই বজলু ব্যাকুল হয়ে বলে, 'দিনা, তোমার কী হয়েছে?! এতদিন কেন ফোন ধরনি?! আমি তো চিন্তায়-চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম!'

ওপাশ থেকে শোনা যায় অন্য একটা মেয়ের কণ্ঠ। মেয়েটার গলার স্বর বসে-যাওয়া। মেয়েটা বসে-যাওয়া গলায় কাঁদতে-কাঁদতে জানায়, 'আমি দিনার বান্ধবী। দিনা আর নেই! পনেরো দিন আগে রোড-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে!'

কথাটা শুনে বজলুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। হাত থেকে মোবাইল ফোনটা খসে পড়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বজ্রাহতের মত অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়। দু'হাত দিয়ে সজোরে মাথা চেপে ধরে ধীরে-ধীরে বসে পড়ে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

এতদিন ধরে যাকে নিয়ে এত স্বপ্ন বুনেছে, সে মরে গেছে!!! জীবনে একটি বার তার সঙ্গে দেখা হবার আগেই মরে গেছে!!! এ-ও কি মেনে নেয়া যায়?!! তিলে-তিলে জমানো এতদিনের পাহাড় সমান ভালবাসা এভাবে এক নিমিষে ধুলোয় মিশে গেল!! এই কি ছিল তার ভাগ্যে! অভাগার জীবনে একমাত্র যাকে পেল তাকেও স্রষ্টা এভাবে নিয়ে গেল!!!

সেদিনের পর থেকে দিনার ফোন নাম্বারটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। বজলুর জীবনে নেমে আসে একাকীত্ব আর শূন্যতা। বুক ভাঙা কষ্ট আর হাহাকারে তার জীবনটাই ওলট-পালট হয়ে যায়। নাওয়া-খাওয়া-ঘুম কিছুই ঠিক মত হয় না। কোনওক্রমে নিজেকে

BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিদিন অফিস করে। পেটের দায়ে অফিস করতে হয়। চাকরি চলে গেলে খাবে কী?! থাকবে কোথায়?!

অফিস থেকে বজলুকে একটা লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা মোটর সাইকেল দেয়া হয়েছে। অফিস শেষে সেই মোটরসাইকেলে চেপে বজলু শহর ছেড়ে বহুদূরে নিরিবিলি কোথাও গিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকে। কখনও সমুদ্রসৈকতে, কখনও খোলা মাঠের ধারে, কখনও রেললাইনের উপর...

এভাবে একদিন ধূপপুর জঙ্গলের পাশে গিয়ে বসে ছিল। হাইওয়ের পাশেই বিশাল এক ঘন জঙ্গল। খুবই নিরিবিলি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। নীরবে বজলু দিনার কথা ভাবতে-ভাবতে কেঁদে ফেলে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

হঠাৎ একটা বজ্রগম্ভীর গলার স্বরে সে চমকে ওঠে, 'এই, তুই কাঁদছিস কেন?'

বজলু মাথা তুলে দেখে, মাথা ভর্তি লম্বা চুলে জটাধারী এক তান্ত্রিক তার সামনে দাঁড়ানো। পরনে শুধু রক্ত বর্ণের ধুতি। খালি গা। কপালে চন্দনের তিলক। মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে ত্রিশূল। গলায় একটা লাল রঙের উড়নি। কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা।

বজলু অবাক চোখে তান্ত্রিকের দিকে তাকিয়ে থাকে। নির্জন এই স্থানে হঠাৎ করেই যেন ভোজবাজির মত তান্ত্রিক এসে উদয় হয়েছেন!

তান্ত্রিক আবার মেঘের গর্জনের মত গলায় বলে উঠলেন, 'বল, তোর কীসের এত কষ্ট? বল আমাকে। দেখি তোর কষ্ট লাঘব করতে পারি কিনা। তিরিশ বছর ধরে কৈলাসের গুহায় ধ্যান করেছি। আমার এখন অনেক ক্ষমতা। তোর যে কোনও মনোবাসনা পূরণ করে দিতে পারব।'

BanglaBook.org

বজলু বুঝতে চেষ্টা করে কোনও ভণ্ড-বাটপার কিনা। তাকে ফাঁদে ফেলে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেবার ফন্দি আঁটছে নাকি।

তান্ত্রিকের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা যায়। তিনি বলে ওঠেন, 'কী ভাবছিস, আমি ভণ্ড-বাটপার কিনা? নারে, আমি ভণ্ড-বাটপার নই। তিরিশ বছর ধরে সাধনা করছি মানুষের উপকার করার জন্য। আমি জানি, তুই মুসলমান ঘরের সন্তান। এর পরও আমি তোর উপকার করতে চাচ্ছি। আমার কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান–সব সমান। সবাই-ই মানুষ!'

এই কথা শুনে বজলুর তান্ত্রিকের উপর কিছুটা আস্থা জন্মায়। সে হতাশা জড়িত গলায় বলল, 'আমার কষ্ট কোনও দিনও লাঘব হওয়ার নয়!'

তান্ত্রিক ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'আগে বল না, কী তোর কষ্ট? সব আমাকে বল।'

বজলু বলল, 'আচ্ছা, শুনুন তা হলে–এই পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নেই! এক বৃদ্ধা মা ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। বছর দুই আগে এক গভীর রাতে আমার মোবাইল ফোনে একটা মিসড কল আসে। আমি কল ব্যাক করি। ওপাশে শুনতে পাই একটা মেয়ের গলা...'

সব শোনার পর তান্ত্রিক বললেন, 'তোর প্রেমিকা মরে গেছে বলেই তোর মনে এত কষ্ট, এত জ্বালা-যন্ত্রণা?!'

বজলু ধরা গলায় বলল, 'পারবেন আমার দিনাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে?!'

তান্ত্রিক বললেন, 'পারব।'

বজলু চোখ কপালে তুলে বলল, 'পারবেন!? সেটা কীভাবে?! মৃত মানুষকে কি আর কোনও দিনও ফিরিয়ে আনা যায়?!'

তান্ত্রিক বলতে লাগলেন, 'তুই বলেছিস, তোর প্রেমিকাকে তুই কোনও দিনও দেখিসনি। শুধু ফোনে তার গলার স্বর

BanglaBook.org

শুনেছিস। এর মানে, তুই শুধু তার ভিতরের মানুষটাকে চিনিস। তার চেহারা সম্পর্কে তোর কোনও ধারণাই নেই। তোর প্রয়োজন তার শরীরটাকে নয়, শরীরের ভিতরের মানুষটাকে। আমি সেই শরীরের ভিতরের মানুষটাকে এনে দেব। মানে আত্মাটাকে। তবে শরীর ছাড়া আত্মাকে ধরে রাখা যায় না। এজন্য একটা তরতাজা লাশের প্রয়োজন। যে কোনও লাশ হলেই চলবে। এমনকী পুরুষ মানুষের লাশ হলেও সেই লাশে তোর প্রেমিকার আত্মাকে এনে দেয়া যাবে। কিন্তু তোর জন্য ভাল হয় অল্প বয়সী কোনও মেয়েমানুষের লাশ পেলে। তোর প্রেমিকা নিশ্চয়ই কোনও অল্প বয়সী মেয়ে ছিল। এই জন্যেই তোকে অল্প বয়সী মেয়েমানুষের লাশ আনতে বলছি। আমি সেই লাশের মধ্যে তোর প্রেমিকার আত্মাকে স্থাপন করে দেবার পর, তাকে দেখে তোর মনে হবে–তোর প্রেমিকাই সশরীরে তোর কাছে এসেছে। তার দেহ যে অন্য কারও, মনেই হবে না। কারণ, তুই তোর প্রেমিকাকে আগে কোনও দিনও তো সশরীরে দেখিসনি।'

বজলু বিস্ময়ে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'আপনি যা বললেন, সত্যিই কি এমনটা করতে পারবেন?! অন্য কোনও মেয়েমানুষের শরীর হোক গিয়ে, ভিতরের মানুষটা আমার প্রেমিকা দিনা হলেই আমার তাকে ফিরে পাওয়া হবে। আমার ভালবাসা তো দেহের ভিতরের মানুষটার জন্যই। মানুষের দেহ তো শুধুমাত্র খোলস ছাড়া আর কিছুই নয়।'

তান্ত্রিক বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে পরশু শেষ রাতে আমার আস্তানায় একটা লাশ নিয়ে আসবি। আমার আস্তানা এখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে সোজা পাঁচশো গজ ঢুকলেই পাবি। পরশু শেষ রাতে আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ থাকবে। সেই চাঁদে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হবে। গ্রহণের পর চাঁদ থেকে প্রথম যে আলোকরশ্মি বের হবে, সেই আলো লাশের গায়ে ফেলেই লাশের মধ্যে তোর প্রেমিকার

BanglaBook.org

আত্মা স্থাপন করব। চন্দ্রগ্রহণ হবে রাত সোয়া চারটায়। রাত সোয়া চারটার আগে অবশ্যই তোকে লাশ নিয়ে আমার আস্তানায় পৌঁছতে হবে। না হলে কিন্তু সম্ভব হবে না।'

অবশেষে মর্গ থেকে কেয়ারটেকার লাশ নিয়ে এসেছে। লাশটা সাদা কাপড়ে মোড়ানো।

লাশটা কেয়ারটেকার আর ড্রাইভার মিলে ভ্যানে তুলছে। তুলতে-তুলতে কেয়ারটেকার বজলুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভাইজান, আফনের ভাগ্য খুবই ভাল। অল্প বয়সী মাইয়্যামাইনষের লাশ চাইছিলেন, তাই পাইছেন। আইজ রাইত দশটার দিকে এই লাশটা মর্গে আসে। কারা যেন রেফ কইরা মাইয়্যাডারে মাইরা হাইরোডের পাশে ফেলাইয়া গেছে। কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নায়। চেহারা-সুরত মাশাল্লা, খুব সোন্দর! যারা হেরে...করছে, বহুত মজা পাইছে!' কথাটা বলে কেয়ারটেকার খিক-খিক করে কুৎসিত ভঙ্গিতে হেসে উঠল।

ভ্যানে লাশ ওঠানো শেষে কেয়ারটেকার বজলুর সামনে এসে হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বলল, 'ভাইজান, আরও কিছু টাকা বখশিশ দেন। মর্গ থেইকা চুরি কইরা লাশ বেচা বহুত ঝামেলার। মর্গের রেজিস্টাররেও টাকা খাওয়াইতে হইছে। যাতে রেজিস্ট্রি খাতায় কোনও ডগুমেণ্ড না থাহে।'

বজলু বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে এক হাজার টাকার একটা নোট বের করে কেয়ারটেকারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভারকে স্টার্ট দেয়ার নির্দেশ দেয়। যত দ্রুত সম্ভব এখন ধূপপুর জঙ্গলে তান্ত্রিকের আস্তানায় পৌঁছতে হবে।

বজলু লাশ নিয়ে ধূপপুর জঙ্গলে পৌঁছে গেছে। খুব সহজেই তান্ত্রিকের আস্তানা খুঁজে পেয়েছে।

BanglaBook.org

তান্ত্রিকের আস্তানা বলতে জীর্ণ একটা কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের সামনে উঠনের মত এক চিলতে খোলা জায়গা। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের মায়াবী চাঁদ। চাঁদের আলোতে সবকিছু কেমন অপার্থিব লাগছে।

তান্ত্রিক কুঁড়েঘরের সামনের খোলা জায়গায় পদ্মাসন ভঙ্গিতে বসা। তাঁর সামনে পাটির উপর লাশটাকে রাখা হয়েছে। লাশের মাথা আর পায়ের দিকে সুগন্ধি আগরবাতি জ্বলছে। সামনে আর একটা ঘটের ভিতর থেকে বের হচ্ছে ধূপ-ধুনা আর লোবানের তীব্র গন্ধযুক্ত ধোঁয়া। লাশটা আগের মতই সাদা কাপড়ে মোড়ানো। লাশের মুখ দেখেনি এখন পর্যন্ত বজলু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেল। তান্ত্রিক বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। সামনে দুটো মাটির পাত্র। একটি পাত্রে ধুলোর মত কী যেন। অন্যটিতে গোলাপজল জাতীয় সুগন্ধী তরল। মন্ত্র পড়তে-পড়তে একটু পর-পর সেই মাটির পাত্র দুটি থেকে যথাক্রমে ধুলো আর সুগন্ধী তরল লাশটার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

এক সময় চাঁদ পুরোপুরি গ্রাস হয়ে গেল। নেমে এল অন্ধকার। তান্ত্রিক বিড়বিড় করে অনুচ্চস্বরে মন্ত্র পড়েই যাচ্ছেন।

চাঁদটা ধীরে-ধীরে আবার আড়াল থেকে বের হতে লাগল। আশপাশ আলোকিত হয়ে উঠছে। চাঁদের আলো এসে পড়ল লাশটার গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে হিমশীতল দমকা হাওয়ার ঘূর্ণি বয়ে গেল। দমকা হাওয়ার তোড়ে লাশের মুখের উপর থেকে সাদা কাপড় সরে গেল। মুখটা দেখা গেল। অপরূপ রূপবতী এক মেয়ের মুখ। পরক্ষণেই লাশটা সমস্ত শরীর বাঁকিয়ে কেঁপে উঠল। গলা দিয়ে বেরুতে লাগল গোঙানির শব্দ। যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

তান্ত্রিক চোখ খুললেন। খুশিতে বজলুর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল

BanglaBook.org

করে উঠল। আনন্দে অভিভূত হয়ে সে তান্ত্রিকের সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, 'আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ! চিরকৃতজ্ঞ!! বলুন, আপনাকে কী দিয়ে খুশি করব?'

তান্ত্রিক হাত উঁচিয়ে বজলুকে থামতে ইশারা করে বললেন, 'এই লাশের মধ্যে যে আত্মা এসেছে, তা তোর প্রেমিকার আত্মা নয়। যার লাশ তার আত্মাই আবার স্থাপন হয়েছে।'

বাতাস বের হয়ে যাওয়া বেলুনের মত মুহূর্তে বজলুর আনন্দোজ্জ্বল মুখটা চুপসে গেল। সে হাহাকার করে উঠল, 'কী বলছেন!!! এত ঝামেলা করে অল্প বয়সী মেয়েমানুষের লাশ আনলাম! এখন এসব কী বলছেন? যার লাশ তার আত্মাই স্থাপন হবার তো কথা ছিল না?'

তান্ত্রিক বলতে লাগলেন, 'তোর প্রেমিকা তোকে ঠকিয়েছে। তোকে মিথ্যে কথা জানিয়েছে। সে মারা যায়নি। সে জীবিতই আছে। যে মারা যায়নি, তার আত্মা কীভাবে অন্য একটা শরীরে স্থাপন করব? তার ভাল ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে। তাই তোকে মিথ্যে মৃত্যুর খবর জানিয়ে পথের কাঁটা সরিয়েছে। তোকে সে কোনও দিনও ভালবাসেনি। শুধুমাত্র প্রেমের অভিনয় করেছে। তুই সহজ-সরল মানুষ বলে কিছুই বুঝতে পারিসনি।'

বজলু ভেঙে-পড়া গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি তো দিনার আত্মাকে ডেকেছিলেন, সে যেহেতু মরেনি, তাই তার আত্মা আসেনি–কিন্তু যার লাশ তার আত্মা কেন এসেছে? তাকে তো ডাকা হয়নি?'

তান্ত্রিক বললেন, 'যাকে ডেকেছি, সে আসেনি বলে যার লাশ তার আত্মা এমনিতেই এসে পড়েছে।'

বজলু বলল, 'এখন একে আমরা কী করব?'

তান্ত্রিক হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'কী করব মানে! এখন তো সে আর লাশ নয়, জলজ্যান্ত একটা মানুষ! আহত, অসহায় একটা

BanglaBook.org

মেয়েমানুষ। দেখছিস না যন্ত্রণায় কেমন কাতরাচ্ছে। তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতে হবে। যা, এখনই কোনও হাসপাতালে নিয়ে যা। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোল। অনেক পুণ্য হবে তোর। সেই পুণ্যের জোরেই হয়তো জীবনে একদিন ভাল কিছু পাবি।'

বজলু তান্ত্রিকের নির্দেশে মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়। মেয়েটার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যয় বহন করে।

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। মেয়েটা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। মেয়েটার কাছ থেকে বজলু তার নাম-ধাম-পরিচয়, কীভাবে ধর্ষণের শিকার হয়েছে–সব জেনেছে।

মেয়েটার নাম মিনা। গ্রামের মেয়ে। বাবা স্কুল মাস্টার। মা নেই। ঘরে সৎমা। তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়ে চলে গেছে। সন্ধ্যার পরে বান্ধবীর বাড়ি থেকে একা হাইওয়ে ধরে বাড়ি ফিরছিল। পথে মাইক্রোবাসে করে যাওয়া একদল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ তাকে টেনে-হিঁচড়ে মাইক্রোতে উঠিয়ে একটা ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে রাতভর তাকে ধর্ষণ করে। সে একপর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর তার আর কিছুই মনে নেই।

বজলু মিনাকে তার গ্রামে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। কিন্তু মিনা কিছুতেই তার বাড়ি ফিরে যেতে চাইছে না। সে কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে বলে, একটা ধর্ষিতা মেয়েকে তার গ্রামের মানুষ বা তার বাড়ির লোকেরা কিছুতেই আর গ্রহণ করবে না। কলঙ্কিনী বলে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে। কেউ তাকে ঠাঁই দেবে না। তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কেন তাকে বাঁচিয়ে তুলল বজলু! তার মরে যাওয়াই ভাল ছিল!

বজলু কীভাবে মিনাকে বাঁচিয়ে তুলেছে সত্যটা মিনা জানে

BanglaBook.org

না। মিনা জানে বজলু তাকে রাস্তার পাশ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। তান্ত্রিকের মাধ্যমে সে যে পুনর্জীবন লাভ করেছে, এর কিছুই জানায়নি বজলু।

মিনার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বজলু মিনাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

মিনা মেয়েটা খুব ভাল। ঘরের কাজে অত্যন্ত পটু। বজলুর ঘরের সমস্ত সাংসারিক কাজ-কর্ম করে দেয়। রান্না-বান্না থেকে শুরু করে কাপড়-চোপড় ধোয়া, ঘর ঝাড়ু দেয়া, থালা-বাসন ধোয়া, তরকারি কোটা, বিছানা-আলনা গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা...সব করে। ঘরের কোনও কাজে এখন আর বজলুকে হাত দিতে হয় না।

রান্নার হাতও চমৎকার। যা রান্না করে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। বজলুকে এখন আর সস্তা হোটেলের অতিরিক্ত তেল-ঝালের বিস্বাদ খাবার খেয়ে পেটের সমস্যায় ভুগতে হয় না।

বজলুর খাওয়ার সময় সে পাশে বসে খুব যত্ন সহকারে খাবার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়ায়। ইলেকট্রিসিটি না থাকলে হাতপাখা নেড়ে-নেড়ে বাতাস করতে থাকে। বজলুর অনেক যত্ন নেয়। বজলুর যখন যা প্রয়োজন পড়ে হাতের কাছে এনে দেয়। এর মধ্যে বজলু সাঙ্ঘাতিক জ্বরে পড়েছিল। দিন-রাত বজলুর সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে।

মিনার ব্যবহারে বজলুর মায়ের কথা খুব মনে পড়ে, চোখে পানি এসে যায়। মায়ের মৃত্যুর পর সে আবার কারও কাছ থেকে এতটা আদর-যত্ন পাচ্ছে।

শেষ রাতের দিকে বজলুর ঘুম ভেঙে গেল।

মিনা বজলুর বাড়িতে প্রায় তিন মাস ধরে আছে। মিনাকে

BanglaBook.org

আজকাল ঘরের মানুষ বলেই মনে হয়। মিনাকে পেয়ে যেন তার নিঃসঙ্গ-নিরানন্দ জীবনে অনেকটাই ছন্দ ফিরে এসেছে। আজকাল তার বুকের মাঝে মিনার জন্য এক ধরনের গভীর মায়া অনুভব করে। প্রায়ই মনে হয় মিনাকে বিয়ে করে চিরদিনের জন্য তার কাছে রেখে দিলে কেমন হয়? পরক্ষণেই এটা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, একটা ধর্ষিতা মেয়েকে সে বিয়ে করবে?!

আবার এটাও ভাবে, মিনা ধর্ষিতা তাতে কী? তার প্রেমিকা দিনা যদি সত্যিই মারা যেত, আর দিনার আত্মা যদি মিনার এই দেহে স্থাপন হত–তা হলে কি সে সেই ধর্ষিতা শরীরের দিনাকে গ্রহণ করত না? সে ভালবেসেছিল দিনাকে। দিনার শরীরকে নয়। তেমনি শরীর ধর্ষিত হয়, কলঙ্কিত হয়–আত্মা পবিত্রই থেকে যায়। মিনার আত্মা পবিত্র! নিষ্পাপ! মিনার মত ভাল মনের মেয়ে হয় না।

এসব ভাবতে-ভাবতে বজলু শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল। বেড সাইড টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিল। একটা সিগারেট ধরাল। আলো জ্বালেনি বলে ঘর অন্ধকার। বাইরে পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়া শেষ রাতের কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। চাঁদের আলো এসে পড়ছে তার বিছানায়। এই আলোতে তার মিনার সুন্দর মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে! এমন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোতেই মিনাকে সে প্রথম দেখেছিল। সেই যে তান্ত্রিকের সামনে চন্দ্রগ্রহণের পর প্রথম চাঁদের আলোয় মিনার লাশের মুখের উপর থেকে দমকা হাওয়ায় সাদা কাপড় সরে গিয়েছিল।

মিনা এখন তার পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে। এতটা কাছে থাকা সত্ত্বেও মিনাকে সে তার কাছে ডাকতে পারছে না। অদৃশ্য সীমানা তাদের দু'জনের মাঝে। অবশ্যই কাল সে সেই সীমানা ভেঙে ফেলবে। বিয়ে করে মিনাকে তার এই শোবার ঘরে নিয়ে আসবে।

BanglaBook.org

কাল থেকে মিনা আর অন্য ঘরে থাকবে না। তার পাশে একই বিছানায় থাকবে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোতে মিনার সুন্দর মুখটা মন ভরে দেখবে! সারা জীবন ধরে দেখবে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অভিশপ্ত রক্ত

রিকশাওয়ালাটা রোগা। অথচ রিকশাটা চালাচ্ছে ঝড়ের বেগে। রুমার ভয়-ভয় লাগছে, এই বুঝি ভয়ঙ্কর একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে। সে রিকশা থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়বে। মাথা-টাথা ফেটে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে।

সোহেল চত্বরের মোড় ঘুরে কিছুটা সামনে এগোতেই রিকশা জ্যামে আটকা পড়ল। রুমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। শক্ত কাঠ হয়ে না থেকে আরাম করে বসল। ভাবছে, রিকশাওয়ালাকে বলবে নাকি যেন একটু ধীরে-সুস্থে চালায়। অবশ্য বললেও কোনও কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। চ্যাংড়া চেহারার রিকশাওয়ালা– এদেরকে জোরে চালাতে নিষেধ করলে আরও গতি বাড়িয়ে দেয়। এরা মনে হয় কম বয়সী মেয়ে প্যাসেঞ্জারদের আতঙ্কের মধ্যে রেখে এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পায়।

আরও একবার এমনই এক চ্যাংড়া চেহারার রিকশাওয়ালার রিকশায় চড়েছিল রুমা। সেই রিকশাওয়ালাটাও এমন জোরে চালাচ্ছিল। রুমা জোরে চালাতে নিষেধ করল। এরপর রিকশাওয়ালাটা গতি আরও বাড়িয়ে দিল। রুমা রেগে উঠে বলল, 'আস্তে চালাতে বললাম, এখন দেখি আরও জোরে চালাচ্ছেন?'

রিকশাওয়ালাটা পেছনে মুখ ঘুরিয়ে মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে বলল, 'আফা, টাইট হইয়্যা বহেন। কিচ্ছু হইবে না।'

তারপর গতি আরও বাড়িয়ে দিল। গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে

BanglaBook.org

চালাতে লাগল। রুমা ভয়ে-আতঙ্কে শক্ত কাঠ হয়ে যেন উড়তে উড়তে গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

গন্তব্যে পৌঁছনোর পর রিকশাওয়ালাটা গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে-মুছতে বলল, 'আফা, পাঁচটা ট্যাকা বাড়াইয়া দিয়েন। অনেক খাটনি গেছে।'

রিকশাওয়ালার মুখ ভর্তি হাসি দেখে মনে হচ্ছিল 'খাটনি' গেলেও সে বেশ আনন্দ পেয়েছে।

লম্বা জ্যাম। জ্যাম ভাঙতে আর কতক্ষণ লাগবে কে জানে। প্রায় রোজ বিকেলেই সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে রুমার এমন জ্যামে আটকা পড়ার অভিজ্ঞতা হচ্ছে। অফিস শেষে ঘরমুখী মানুষের ভিড়েই বোধহয় রোজ এই সময়ে জ্যামটা লাগে।

রুমা একটা বেসরকারি ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার। মাত্র কয়েক মাস হলো চাকরিটা পেয়েছে। মাইনে বেশ ভালই। আটটা-পাঁচটা অফিস। কাগজে-কলমে আটটা-পাঁচটা হলেও অফিস থেকে বের হতে ছয়টা-সোয়া ছয়টা বেজে যায়।

জ্যাম মনে হয় ছুটতে শুরু করেছে। রিকশা-গাড়িগুলো ধীরে-ধীরে সামনের দিকে এগোচ্ছে। মাথা ভর্তি সাদা চুলে ভরা এক বৃদ্ধা ধীরে-ধীরে সামনে এগোতে থাকা রিকশা-গাড়ির যাত্রীদের দিকে ছুটে-ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। সবাই বৃদ্ধাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। রিকশা-গাড়ির হর্নের শব্দে বৃদ্ধা ঠিক কী বলতে চাইছে বোঝাও যাচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে, বৃদ্ধা রাস্তার ভ্রাম্যমাণ পাগলি।

বৃদ্ধার গায়ে ময়লা-নোংরা পোশাক। মাথায় উস্কখুস্ক পাটের আঁশের মত ঘিয়ে জঙ্গুলে চুল। চুলগুলো মুখের উপর পড়ে ঢেকে রয়েছে তার সমস্ত মুখ। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। হাত ভর্তি ময়লা

BanglaBook.org

জমা বড়-বড় নখ। নখগুলো কিছুটা পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো। সেই নখ দিয়ে অনবরত সে মাথা চুলকাচ্ছে।

রুমার রিকশা বৃদ্ধার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। অন্য সব যানের মত রুমার রিকশার দিকেও বৃদ্ধা ছুটে এসেছে। বৃদ্ধার দু'হাত ভর্তি নখের আঁচড়ের চেরা ক্ষত। ক্ষতগুলো দিয়ে চুইয়ে বের হচ্ছে টাটকা রক্ত। হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে সেই রক্ত দেখিয়ে-দেখিয়ে বৃদ্ধা এলোমেলো কিছু বকছে, '...রক্ত...রক্ত...রক্ত লাগবে রক্ত...এই নে রক্ত...আমার গায়ের সমস্ত রক্ত নিয়ে নে...'

বোঝাই যাচ্ছে বদ্ধ উন্মাদ। কী আশ্চর্য! রিকশাওয়ালাটা রিকশা থামিয়ে তামাশা দেখতে লাগল। সেই সুযোগে বৃদ্ধা পাগলিটা একেবারে রুমার সামনে এসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে রুমাকে ছুঁতে চাইছে আর মুখে বলেই যাচ্ছে, 'রক্ত...রক্ত লাগবে রক্ত...'

রুমা ভয়ে গুটিসুটি মেরে আতঙ্কিত গলায় কোনওক্রমে ধমকে উঠল, 'এই, পাগলি, যাও, যাও এখান থেকে যাও, সরো, দূরে সরো...' রিকশাওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে যোগ করল, 'রিকশাটা থামিয়ে রেখেছেন কেন?! জলদি এখান থেকে চলুন। জলদি চলুন।'

রিকশাওয়ালার কোনও বিকার ঘটল না। সে মুখ টিপে-টিপে হাসছে। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

গুটিয়ে রিকশায় বসা রুমার ডান হাতটা মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধা পাগলিটা স্পর্শ করে ফেলল। স্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গে রুমা প্রচণ্ড একটা আর্তচিৎকার দিয়ে উঠল। তার কাছে মনে হলো যেন সে জ্বলন্ত গনগনে লাল অঙ্গারের ছ্যাঁকা খেয়েছে। প্রচণ্ড জ্বলুনি হতে লাগল। জায়গাটা পোড়া ক্ষতের মত কালো হয়ে গেল। জেগে

BanglaBook.org

উঠল বড়সড় একটা ফোস্কা।

যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে রুমা রিকশা থেকে ছিটকে নেমে, 'কেউ আমাকে এই পাগলির হাত থেকে রক্ষা করেন, প্লিজ, কেউ রক্ষা করেন...' বলে চিৎকার করতে-করতে ছুটতে লাগল। পিছু-পিছু পাগলিটাও ধাওয়া করতে লাগল। তাই দেখে রিকশাওয়ালাটা আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। দাঁত বের করে হেসে ফেলল।

রুমা রাস্তার ডিভাইডার টপকে ডান পাশের রাস্তায় চলে গেল। ডান পাশের রাস্তা দিয়ে হুসহাস করে ছুটছে ভারী-ভারী যান। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য রুমা রাস্তার মাঝ বরাবর পৌঁছতেই প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা একটা মাইক্রোবাসের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল রাস্তা। আশপাশের লোকজন ছুটে এল।

দুই

সিটি হসপিটাল।

রুমাকে অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে একটা মেজর অপারেশন করা হবে। ডাক্তার-নার্সদের ব্যস্ত ছোটাছুটি।

রুমার বাবা-মা অপারেশন থিয়েটারের সামনে ওয়েটিং লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন। অপারেশন থিয়েটারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। রুমার মা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেই যাচ্ছেন। রুমার বাবারও দু'চোখ ছাপিয়ে নামছে লোনা জলের বন্যা। তাঁদের একমাত্র মেয়ে এখন জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি! ডাক্তাররা তেমন একটা ভরসা দিতে পারছে না। বাঁচার সম্ভাবনা নাকি খুবই কম!

BanglaBook.org

ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে, বাকিটা আল্লাহর হাতে।

অপারেশন থিয়েটারের ট্রান্সলুসেন্ট গ্লাসের দরজা খুলে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে এল এক নার্স। রুমার বাবা-মা দু'জনেই সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। নার্সকে বেরুতে দেখেই তাঁরা দু'জন ছুটে গেলেন তার কাছে।

নার্স মেয়েটা বলল, 'এখনই এক ব্যাগ এবি নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন। তা না হলে...আপনাদের মেয়ের রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ। এই গ্রুপের আর কোনও রক্ত আপাতত আমাদের হাতে নেই। আমরা বিভিন্ন হসপিটাল এবং ব্লাড ব্যাংকগুলোতে খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু তার আগে এখনই এক ব্যাগ রক্ত না হলে চলছে না।'

রুমার বাবা-মা দু'জনেই একসাথে বলে উঠলেন, 'আমার রক্ত নিন।'

নার্স বলল, 'চলুন তা হলে, রক্ত পরীক্ষা করে দেখি আপনাদের কারও রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ কিনা। এই গ্রুপের রক্ত খুবই রেয়ার।'

রুমার বাবা-মা দু'জনের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁদের কারওই এবি নেগেটিভ রক্ত নয়।

রুমার বাবা-মা দু'জনেই অস্থির হয়ে পাগলের মত তাঁদের বিভিন্ন আত্মীয়-পরিজনদের ফোন করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে যদি কাউকে পাওয়া যায় যার রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ সেই আশায়। কর্তব্যরত নার্সও বিভিন্ন হসপিটাল এবং ব্লাড ব্যাংকগুলোতে খোঁজ নিতে লাগল। কিন্তু কোথাও থেকে আশার খবর পাওয়া গেল না। এমন সময় ইন্টারকমে রিসিপশন থেকে ফোন এল। রিসিপশন থেকে জানাল, কীভাবে যেন বৃদ্ধা এক পাগলি রিসিপশনে ঢুকে পড়েছে। সে আবোল-তাবোল উল্টো-পাল্টা বকছে। তবে তার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে–সে রক্ত দিতে

BanglaBook.org

চাচ্ছে। গার্ড ডেকে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে রক্ত না দিয়ে কিছুতেই যাবে না বলে বসে আছে।

সব শোনার পর নার্স রিসিপশনিস্টকে বলল, 'ঠিক আছে, পাগলিটাকে কারও সাথে ব্লাড ট্রান্সমিশন রুমে পাঠিয়ে দাও।'

পাগলির রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ। রুমার বাবা-মাকে খবরটা জানানো হলো। তাঁরা খবরটা শুনে ওয়েটিং লাউঞ্জ থেকে ছুটে গেলেন রক্ত পরিসঞ্চালন কক্ষে। তাঁরা একটি বার সেই বৃদ্ধাকে দেখতে চান, যে তাঁদের একমাত্র মেয়ের এমন চরম মুহূর্তে তাকে বাঁচানোর জন্য রক্ত দিতে এসেছে। বৃদ্ধাকে মাথা নত করে ধন্যবাদ জানাবেন তাঁরা। জানাবেন কৃতজ্ঞতা।

রক্ত পরিসঞ্চালন কক্ষে ঢুকে রুমার বাবা-মা দু'জনেই বৃদ্ধা পাগলিটাকে দেখে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন। নোংরা-ময়লা বিচ্ছিরি বেশভূষার এক বৃদ্ধা। যেন নর্দমা থেকে উঠে এসেছে। গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। মাথা ভর্তি পাটের আঁশের মত জঙ্গুলে চুলগুলো ঢেকে রেখেছে তার মুখখানা। গায়ের রং ঠিক কালো নয়, কেমন ছাই বর্ণ। দেহটা কুঁজো মানুষের মত। হাত ভর্তি ময়লা জমা বড়-বড় নখ। দেখেই কেমন গা ঘিন-ঘিন করে ওঠে।

রুমার বাবা-মা এই ভেবে শিউরে উঠলেন, এমন কুৎসিত একটা পাগলির রক্ত ঢুকানো হবে তাঁদের মেয়ের শরীরে! এ ছাড়া কী-ই বা করার আছে! মেয়েকে বাঁচাতে হলে সবকিছুই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে।

রুমার মা এগিয়ে গেলেন পাগলিটার কাছে। কৃতজ্ঞতাসূচক কথা বলতে লাগলেন, 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব! এখনই এক ব্যাগ রক্তের ব্যবস্থা না হলে কী যে হত! ...আপনি এর বিনিময়ে যা চাইবেন তাই দেব।'

BanglaBook.org

বৃদ্ধা পাগলিটা খল-খল করে কুৎসিত ভঙ্গিতে হেসে উঠে বলল, 'আমি যা চাইব তাই দিবি?' হাত বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নে, নেহ্ তা হলে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত নিয়ে নে।'

রুমার বাবা-মা বুঝতে পারলেন একেবারে রাস্তার বদ্ধ উন্মাদ। একে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিছু হবে না। তার চেয়ে বরং কিছু নগদ টাকা-পয়সা দিয়ে দেয়াই ভাল।

রুমার বাবা পাঁচশো টাকার কতগুলো কড়কড়ে নোট বাড়িয়ে ধরলেন পাগলিটার দিকে। তাই দেখে পাগলি বিকট গা শিউরানো শব্দে হেসে উঠল। হাসির দমকে তার মুখ ঢেকে থাকা চুলগুলো দু'পাশে সরে গেল। এই প্রথম তার চেহারাটা ভালভাবে সম্পূর্ণ দেখা গেল। দেখা গেল তার চোখ দুটো। কী আশ্চর্য! পাগলিটা তো অন্ধ! তার দু'চোখেই কালো মণির কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। চোখ দুটো খোসা ছাড়ানো পচা লিচুর মত ঘোলাটে। মুখখানা যেন আগুনে ঝলসানো, কুঁচকানো ভাঁজ-ভাঁজ শত-শত বলিরেখায় পরিপূর্ণ।

পাগলিটার চেহারা দেখে রুমার বাবা-মা'র বুক ধক করে উঠল। এমনকী নার্স মেয়েটাও মনে হয় একটু কেঁপে উঠল। এত কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর চেহারা কোনও মানুষের হতে পারে, বোধহয় তা তাদের কল্পনাতেও ছিল না।

রুমার বাবা-মা ভেবে অবাক হলেন, বদ্ধ উন্মাদ, তার ওপর এমন একজন অন্ধ—কীভাবে এই হসপিটালে এসে পৌঁছল! আর টাকা বাড়িয়ে ধরার সঙ্গে-সঙ্গে কেন অমন বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে উঠল?! তার তো টাকা দেখতে পাওয়ার কোনও কারণই নেই।

রুমার বাবা টাকাটা হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই অন্ধ পাগলিটা বেডের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলতে লাগল, 'নে, নেহ, তাড়াতাড়ি সব রক্ত নিয়ে নে। আর সময় নষ্ট করিস না। না হলে মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে না।'

BanglaBook.org

নার্স মেয়েটা রুমার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'স্যর, একে টাকা দিয়ে কোনও লাভ হবে না। টাকা-পয়সা সামলে রাখার মত হুঁশ এর নেই। তার চেয়ে বরং রক্ত দেয়া শেষে কিছু খাবার কিনে দিয়েন। এমনিতেও রক্ত দেয়া শেষে তরল খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হয়। আপনারা এখন গিয়ে লাউঞ্জে অপেক্ষা করেন। আমি রক্তটা নিই।'

রুমার বাবা-মা একরাশ বিস্ময় নিয়ে লাউঞ্জে ফিরে গেলেন। এমনিতেই তাঁরা তাঁদের একমাত্র মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে রয়েছেন, তার ওপর পাগলিটার হঠাৎ আগমন এবং তার অদ্ভুত আচরণ তাঁদেরকে একেবারে হতবিহ্বল করে দিয়েছে।

পাগলির রক্তে রক্তের ব্যাগটা অতি দ্রুতই ভরে গেল। নার্স পাগলির হাত থেকে রক্ত নেয়ার সুচটা খোলার জন্য হাত বাড়াল। ঠিক তখন পাগলি হুংকার দিয়ে উঠল, 'আরও রক্ত নে, মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে আমার শরীরের আরও রক্ত ওর দরকার। সব রক্ত নিয়ে নে।'

নার্স বোঝাতে চাইল একজন মানুষের শরীর থেকে একবারে এর চেয়ে বেশি রক্ত নেয়া ঠিক নয়। কিন্তু পাগলি কিছুতেই মানল না। আরও রক্ত দেবার জন্য সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল। তার অপ্রকৃতিস্থতা চরম রূপ নিল।

কিছুতেই পাগলিকে মানাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রক্ত নেবার জন্য আর একটা খালি রক্তের ব্যাগ লাগিয়ে দিল নার্স। ভাবল আরও হাফ ব্যাগ রক্ত নিলেও নেয়া যায়। পাগলির শারীরিক অবস্থা বেশ ভালই আছে। ব্লাড প্রেশার যথেষ্টই নরমাল। সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।

নার্স দ্বিতীয় রক্তের ব্যাগটা লাগিয়ে দেবার পর পাগলিকে একা রেখে প্রথমে ভরা ব্যাগটা নিয়ে অপারেশন থিয়েটারের দিকে

BanglaBook.org

গেল। অপারেশন থিয়েটারে রক্তের জন্য অপেক্ষা করছে। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন।

নার্সের কাছে একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লাগছে, মানুষের শরীর থেকে রক্ত নেবার বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত রক্তে বেশ একটা গরম ভাব থাকে। রক্তের ব্যাগটা হাতে ধরলেই সেই গরম অনুভূতিটা টের পাওয়া যায়। কিন্তু পাগলির রক্তটা একেবারে হিমশীতল! যেন এই মুহূর্তে রক্তটা নেয়া হয়নি, নেয়া হয়েছে অনেক আগে–ফ্রিজে রাখা ছিল।

নার্স রক্তের ব্যাগটা অপারেশন থিয়েটারে পৌঁছে দিয়েই আবার রক্ত পরিসঞ্চালন কামরায় ফিরে এল। পরিসঞ্চালন কামরার দরজা খুলতেই সে প্রচণ্ড আঁতকে উঠল। সমস্ত কামরা ভর্তি কুয়াশার মত ঘন ধোঁয়া। আগুন লাগল নাকি?! কাশতে-কাশতে ঘন ধোঁয়া ভেদ করে সে ভিতরে এগিয়ে গেল। এ কী কাণ্ড! বেডে শোয়া অবস্থায়ই পাগলির সমস্ত দেহটা একেবারে পুড়ে অঙ্গার হয়ে রয়েছে। পোড়া বিকৃত মুখটার মাঝে খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিমের মত সাদা চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আছে। কী বীভৎস দৃশ্য!

নার্স মেয়েটা জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

শুধু পাগলির দেহটাই পুড়ে অঙ্গার হয়েছে। অথচ কামরার অন্য সবকিছুই একেবারে অক্ষত। এমনকী পাগলির অঙ্গার দেহটা যে বেডের উপর, সেই বেডের চাদরটা পর্যন্ত অক্ষত। পাগলির শরীর থেকে আরও রক্ত নেবার জন্য লাগানো দ্বিতীয় ব্যাগটাও অক্ষত এবং রক্তে পরিপূর্ণ।

ওদিকে অপারেশন থিয়েটারে পাগলির রক্ত রুমার শরীরে প্রবেশ করাতেই রুমার শারীরিক অবস্থার অতি দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। যেন মৃত্যুপথযাত্রী একটা মানুষ ঘুরে জীবনের দিকে ছুটে আসছে। নিমিষে হার্ট-বিট, শ্বাস-প্রশ্বাস, ব্লাড প্রেশার, পালস...

BanglaBook.org

সবকিছু স্বাভাবিক রূপ নিচ্ছে। অপারেশন করারত ডাক্তারদের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে এল। অবাক, বিস্মিত আর আনন্দিত ডাক্তাররা ভাবল, এটা নিশ্চয়ই মিরাকল! নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার সরাসরি হস্তক্ষেপ! তাদের একবারও মনে হলো না, পাগলির ওই রক্তেই অস্বাভাবিক কোনও ক্ষমতা রয়েছে। তারা তো তখন পর্যন্ত জানেই না এটা কার রক্ত। আর এটাও জানে না রক্ত পরিসঞ্চালন কক্ষে কী ঘটেছে।

তিন

রুমার শারীরিক অবস্থা এখন বেশ ভাল। অ্যাক্সিডেন্টের জখমগুলো এবং অপারেশন করা স্থানের সেলাইয়ের ক্ষত ভালভাবে শুকিয়ে গেলেই সে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে যেতে পারবে। এ ছাড়া তেমন কোনও জটিল সমস্যা তার শরীরে নেই। সে এখন কারও সাহায্য নিয়ে একটু-আধটু হাঁটা-চলাও করতে পারে।

রুমা বেশিরভাগ সময় বেডে শুয়ে-শুয়ে গল্প-উপন্যাস পড়ে কাটায়। কখনও আবার তার কেবিনের বারান্দায় গিয়ে বসে। খোলা আকাশে মেঘেদের দলকে ছুটতে দেখে। পাখিদের উড়ে যেতে দেখে। অনেক দূরের মাঠে কম বয়সী ছেলেদের সাদা পোশাকে ক্রিকেট খেলতে দেখে খুব ভাল লাগে তার।

রক্ত দেয়া শেষে পাগলির দেহটা যে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিল, এই দৃশ্য সেই নার্স মেয়েটা ছাড়া আর কেউই দেখেনি। সেদিন নার্স মেয়েটাকে যখন রক্ত পরিসঞ্চালন কক্ষ থেকে অজ্ঞান অবস্থায়

BanglaBook.org

উদ্ধার করা হয় তখন বেডের উপর পাগলির পোড়া অঙ্গার দেহ বলতে কিছুই ছিল না। ছিল না কোনও পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়া। সবকিছু ছিল একেবারে পরিপাটি, স্বাভাবিক। যেমনটা সবসময় থাকে। নার্স মেয়েটার জ্ঞান ফেরার পর সবাইকে ঘটনাটা বলে। কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। সে সবাইকে বার-বার বোঝাতে চায় যে ওই পাগলিটা স্বাভাবিক কেউ ছিল না। পাগলির চেহারা, আচার-আচরণ, রক্ত–কিছুই স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু কেউই তার কথা বিশ্বাস করে না। সবাই ধারণা করে, অতিরিক্ত কাজের চাপে কোনও মানসিক সমস্যা হয়েছে তার। কিছুদিনের জন্য তাকে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়।

তবে ওই নার্স মেয়েটার একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব কেউ দিতে পারে না। তা হলো, পাগলিটাকে কি কেউ হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছে? রিসিপশনিস্ট, গার্ড, সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়। সবাই স্বীকার করে কেউই পাগলিটাকে যেতে দেখেনি। কিন্তু তাতে কী আসে-যায়! হয়তো তাদের সবার অলক্ষে কোনও এক সময় পাগলি হাসপাতাল থেকে চলে গিয়েছে। হাসপাতালে এত মানুষ আসা-যাওয়া করে, সবার দিকে লক্ষ্য রাখা কি সম্ভব?

গভীর রাত। সমস্ত হাসপাতাল জুড়ে পিনপতন নীরবতা।

রুমার কেবিনের দরজায় কে যেন টুক-টুক করে শব্দ করছে। এত রাতে কে এল?! হাসপাতালের কোনও নার্স কি রুটিন চেকআপ করতে এসেছে? রুমার তো মাঝ রাতে কোনও ওষুধ বা ইঞ্জেকশন নেবার নেই। তা হলে এত রাতে নার্স এসে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে কেন?

রুমা তার ঘুমন্ত মায়ের দিকে তাকাল। রুমার মা কেবিনের এক্সট্রা বেডে বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন। রুমার অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে

BanglaBook.org

মা-ই সর্বক্ষণ পাশে থাকছেন। দেখাশোনা করছেন। গত দিনগুলোতে তাঁর ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে! একে তো সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে থেকেছেন, তার ওপর রুমার সেবা-শুশ্রূষা করা। অনেকগুলো রাত না ঘুমিয়ে রুমার শিয়রে বসে কাটিয়েছেন।

রুমা ভাবল, মাকে ঘুম থেকে না জাগিয়ে সে নিজেই উঠে দরজা খুলে দেখবে কে এসেছে। সে এখন কারও সাহায্য ছাড়াই দেয়াল-টেয়াল ধরে হাঁটা-চলা করতে পারে।

রুমা কেবিনের দরজা খুলল। দরজার সামনে হাসপাতালের কোনও নার্স দাঁড়িয়ে নয়, খুবই বয়স্ক একজন লোক দাঁড়ানো। লোকটার মুখটা কেমন শুকনো আর মলিন।

বৃদ্ধ লোকটা রুমাকে দেখেই অনুনয় করে বলে উঠলেন, 'মাগো, খুব বিপদে পইড়্যা আইছি। আমি এই হাসপাতালের এক রোগী। এই তলার উত্তর মাথার ক্যান্সার ইউনিটের কেবিনে আছি। আইজ রাইতে আমার লগে আমার ছেলে-মেয়ে বা বাড়ির কেউ নাই। ডাক্তাররা আমারে মাঝ রাইতেও কী যেন একটা ট্যাবলেট খাইতে দিছে। অতগুলান ট্যাবলেটের মধ্যে কোন্‌টা খাইতে হইবে তা তো বুঝতেছি না। নার্স আইস্যা খাওয়ানোর কথা ছিল। কিন্তু কোনও নার্সরে আশপাশে দেখতেছি না। মাগো, তুমি মনে হয় শিক্ষিত মাইয়্যা—তুমি যদি আমার কেবিনে গিয়া একটু দেখাইয়া দিতা।'

বৃদ্ধের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে না বলতে পারল না রুমা। একটু যেন ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে এগোতে লাগল রুমা। নীরব-নিস্তব্ধ করিডর। রুমা দু'পাশের দেয়াল ধরে-ধরে কোনওক্রমে হাঁটছে। একটার পর একটা বদ্ধ রুমের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে তারা। দু'জনেই খালি পায়ে, তাই হাঁটার কোনও শব্দ হচ্ছে না।

BanglaBook.org

হঠাৎ রুমা তার সামনে-সামনে বৃদ্ধ লোকটার চলার ভঙ্গি দেখে চমকে উঠল। লোকটা যেন মেঝেতে পা ফেলে-ফেলে হাঁটছেন না, কেমন শূন্যে ভর করে ভেসে-ভেসে যাওয়ার মত দেখাচ্ছে!

নিশ্চয়ই রুমার কোনও ভুল হচ্ছে! মাঝ রাতের এই সুনসান নিস্তব্ধতা তাকে বিভ্রম দেখাচ্ছে।

করিডরের একেবারে উত্তর মাথায় পৌঁছবার পর হঠাৎ লোকটা যেন কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন। রুমার গা কিছুটা ছমছম করতে লাগল। উত্তর মাথার রুমের দরজাটা ভেজানো। এটাই কি তা হলে বৃদ্ধের কেবিন? বৃদ্ধ কি কোনও এক ফাঁকে রুমার অলক্ষে ভিতরে ঢুকে গেছেন? সেটাই হবে হয়তো। রুমার ভিতরে ঢুকে দেখা উচিত।

রুমা ভেজানো দরজায় হাত রাখল। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে হালকা নীলচে অস্পষ্ট নরম আলো। তাপমাত্রা হিমশীতল। ফিনাইলের কড়া গন্ধের সাথে কেমন বিদঘুটে ভাপসা গন্ধের মিশেল।

স্বল্প নীলচে আলোতে কিছুটা চোখ সয়ে আসতেই রুমা বুঝতে পারল বেশ বড়সড় একটা কামরা। কামরা ভর্তি সারিবদ্ধ করে রাখা কতগুলো স্ট্রেচার। বেশ কিছু স্ট্রেচারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা মানুষ রয়েছে। সাদা কাপড়ের উপর দিয়ে মনুষ্যাকৃতিগুলো ফুটে রয়েছে। শোয়া অবস্থায় শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে তারা।

রুমার বুঝতে দেরি হলো না যে এটা হাসপাতালের মর্গ রুম। সাদা কাপড়ে যারা ঢাকা রয়েছে তারা সব লাশ।

রুমা জমে যাওয়া পায়ে কোনওক্রমে পিছু হটতে লাগল। তখনই ঝড়ো হাওয়ার মত দমকা একটা হাওয়া বয়ে গেল। হিমশীতল দমকা হাওয়া। হাওয়ার তোড়ে তার পিছনে মর্গ রুমের

BanglaBook.org

দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। লাশগুলোর উপর থেকে সাদা কাপড়গুলো খসে পড়ল। রুমের একমাত্র নীলচে আলোর বাতিটা ক্রমাগত জ্বলতে-নিভতে লাগল।

আতঙ্কে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলল রুমা। যেন কেউ তার গলা চেপে ধরেছে। হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। থরথর করে কাঁপছে সমস্ত শরীর।

লাশগুলোর মধ্যে একটা লাশকে রুমা চিনতে পারল। সেটা হচ্ছে সেই বৃদ্ধ লোকটার লাশ যিনি রুমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

রুমার আতঙ্কিত চোখের সামনে হঠাৎ লাশগুলো তড়াক করে শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল। ওগুলোর বোজা চোখ খুলে গেল। নিষ্প্রাণ, রক্তশূন্য, স্থির, পলকহীন চোখ। চোখগুলো সোজা তাকিয়ে রয়েছে রুমার দিকে। রক্ত জল করা চাহনি! চাহনির মাঝে অশুভ ছায়া।

ভোর বেলা রুমাকে মর্গ রুম থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

জ্ঞান ফেরার পর রুমা গত রাতে তার সঙ্গে কী ঘটেছে সব জানায়। রুমার কথা শুনে হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স সবাই একেবারে হতবাক হয়ে যায়। রুমার বর্ণনায় যে বৃদ্ধ তাকে মর্গ রুমে ডেকে নিয়েছেন বলে জানিয়েছে–সেই বৃদ্ধ লোকটা সেদিন সন্ধ্যা রাতেই মারা গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ অনেক দিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মৃত একটা লোক কীভাবে রুমাকে ডেকে নেবেন?!

BanglaBook.org

চার

রুমা হাসপাতাল থেকে রিলিজড্ হয়ে বাসায় ফিরেছে। বলতে গেলে সে এখন একদম সুস্থ। এরপরও আরও সপ্তাহখানিক বাসায় রেস্টে থেকে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম শুরু করবে। অফিসে জয়েন করবে।

রুমাদের বাড়িতে একটা কুকুর আছে। বেশ নাদুস-নুদুস বিশালদেহী সরাইলের কুকুর। অনেক দিনের পোষা। কুকুরটার নাম ভুলু। রুমার খুব আদরের। রুমার সামনে পড়লেই কুকুরটা লেজ নেড়ে, মাথা নুইয়ে, কান দুটো ঘাড়ের সাথে চেপে ধরে কুঁই-কুঁই এক জাতীয় শব্দ করে। বোধহয় তখন কুকুরের ভাষায় মনিবকে শ্রদ্ধা জানায়। রুমা মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেয়। কুকুরটা আদর পেয়ে একেবারে মাটিতে বসে পড়ে। মাথাটা একেবারে নুইয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। সুযোগ পেলে জিভ বাড়িয়ে রুমার পা চেটে দিতে চায়। অবশ্য এই ব্যাপারটায় রুমার গা ঘিন-ঘিন করে। তাই রুমা সাবধান থাকে যেন কোনওভাবেই পা চাটতে না পারে।

রুমা যখন অফিস থেকে বা বাইরে থেকে বাসায় ফেরে তখন বাসার কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছতেই কুকুরটা ছুটে এসে রুমার চলার পথের সঙ্গী হয়। গা ঘেঁষে যেন নেচে-নেচে হাঁটে। খুশির ডাক ছাড়ে, লেজ নাড়ে, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায়। হয়তো কুকুরটা তখন এটাও বলে, মনিব, এখন আপনার ভয়ের কিছু নেই—আমি আপনার সাথে আছি। রুমা রিকশায় থাকলে রিকশার পাশে-পাশে ছুটে চলে।

BanglaBook.org

রুমা বাড়ি থেকে বের হবার সময়ও একই ব্যাপার। রুমাকে

বাড়ি থেকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।

এতটাই ভাব রুমা আর ভুলু নামের কুকুরটার মাঝে।

কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফেরার পর ভুলু রুমাকে একটুও সহ্য করতে পারছে না। রুমাকে দেখলেই ক্রোধের ঘড়-ঘড় শব্দ করতে-করতে, দাঁত খিঁচিয়ে, হিংস্র রূপ নিয়ে আক্রমণ করতে চায়।

যেদিন রুমা হাসপাতাল থেকে প্রথম বাড়িতে পা রাখল, সেদিন ভুলু যে কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল ভাবা যায় না। যেন রুমাকে বাগে পেলে কামড়ে-ছিঁড়ে মেরে ফেলবে। অনেক কষ্টে রুমার বাবা ভুলুকে শিকল পরিয়ে বেঁধে ফেলেন। শিকলে বাঁধা অবস্থায়ও ভুলু হিংস্র রূপে বার-বার রুমার দিকে তেড়ে আসতে চায়। শিকলে টান খেয়ে-খেয়ে পিছিয়ে যায়। ওকে তখন এতটাই হিংস্র দেখায় যে ভয় লাগে কখন আবার শিকল ছিঁড়ে রুমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরপর থেকে রুমাকে দেখলেই ভুলু ভয়ঙ্কর খেপে যায়। রুমাকে বাড়ির জানালায় বা বারান্দায় দাঁড়াতে দেখলেও, দেখামাত্র ক্রোধান্বিত পাগলা কুকুরের মত করতে লাগে। বিকট হিংস্র গর্জন শুরু করে। বাইরে থেকে একতলা বাড়ির জানালা-বারান্দার গ্রিলে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে। যেন পারলে গ্রিল ভেঙে রুমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হাসপাতাল থেকে ফেরার দিন রুমা ভেবেছিল, হয়তো অনেক দিন পর ভুলু তাকে চিনতে পারেনি—বাইরের লোক মনে করেছে। কিন্তু আজকাল বিষয়টা রুমাকে খুব ভাবায়।

কুকুররা মানুষ চেনে গন্ধ দিয়ে। মানুষের গায়ের গন্ধেই কুকুরেরা চিনে নেয় সেই লোকটা তার পূর্ব পরিচিত অথবা মনিব কিনা। ভুলু কি তা হলে রুমার গায়ের গন্ধ চিনতে পারছে না? অবশ্য রুমারই আজকাল নিজের গায়ের গন্ধটা বড্ড অপরিচিত

BanglaBook.org

লাগে। নিজের গা থেকে নিজেই কেমন ইঁদুর মরা-ইঁদুর মরা বিচ্ছিরি গন্ধ পায়। প্রথমে ভেবেছিল অনেক দিন গোসল না করায় হয়তো গা থেকে অমন গন্ধ বেরুচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর থেকে সুগন্ধি সাবান-শ্যাম্পু মেখে, গরম পানি দিয়ে, রোজ অনেকক্ষণ ধরে ভালভাবে গোসল করছে। কিন্তু তাতেও গায়ের গন্ধ যাচ্ছে না। বরং যতই দিন যাচ্ছে আরও বেড়ে যাচ্ছে।

আরও একটা বিষয় রুমাকে ভাবায়। রুমা যখন ড্রেসিং-টেবিলের বড় আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে বা সাজতে বসে তখন হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়–যেন আয়নায় তার চেহারার বদলে কুৎসিত ভয়ঙ্কর একটা চেহারা ফুটে উঠে নিমিষে মিলিয়ে যায়। এটা অবশ্য বিভ্রমও হতে পারে। হয়তো সে ভুল দেখে। সেই রাতে হাসপাতালের মর্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা শুনে ডাক্তাররা বলেছিল–বড় ধরনের কোনও অ্যাক্সিডেন্টের পর অনেকের ক্ষেত্রে কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রবণবিভ্রম অথবা গন্ধ বিভ্রমও হতে পারে। এ ছাড়া ঘুমের মধ্যে হাঁটা, দুঃস্বপ্ন দেখা, চেনা খাবারের স্বাদ অন্য রকম লাগা, বিষণ্ণ বোধ করা, অহেতুক ভয় পাওয়া, কান্না পাওয়া, রেগে যাওয়া...এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। এক সময় ধীরে-ধীরে সব সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। এমনিতে ঠিক না হলে তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া উচিত।

BanglaBook.org

পাঁচ

মাঝ রাত। দুঃস্বপ্ন দেখে রুমার ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নটা এতই কুৎসিত, নোংরা আর ভয়ঙ্কর ছিল যে ভাবতেও

ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে রুমা। গা ঘিন-ঘিন করছে। কান্না পাচ্ছে।

রুমার বুকের ভিতর এখনও বেদম দুরমুশ পিটাচ্ছে। বুকটা হাপরের মত ওঠা-নামা করছে। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে চুপচুপে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ।

স্বপ্নে রুমা একটা মর্গ রুম দেখেছে। সেই রাতে হাসপাতালের মর্গ রুমটা যেমন দেখেছিল তেমনই বড়সড় একটা মর্গ রুম। রুমে হালকা নীলচে অস্পষ্ট আলো। সারিবদ্ধ করে রাখা অনেকগুলো স্ট্রেচার। স্ট্রেচারগুলোর উপরে সাদা কাপড়ে ঢাকা লাশ। রুমা সেই সারিবদ্ধ করে রাখা স্ট্রেচারে শোয়ানো লাশদের মাঝ দিয়ে দুরু-দুরু বুকে হেঁটে যাচ্ছে। পিনপতন নীরবতা। হঠাৎ সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা লাশের হাত তড়াক করে কাপড়ের নীচ থেকে বেরিয়ে তার দিকে ছুটে আসে। খপ করে তার একটা হাতের কব্জি চেপে ধরে। লাশের হাতটা একেবারে বরফ শীতল। রুমা ভয়ে-আতঙ্কে পাগলের মত আর্তনাদ করতে থাকে। সেই সঙ্গে লাশের হাতটা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিছুতেই সে পেরে ওঠে না। একেবারে বজ্রআঁটুনিতে ধরে থাকে লাশের হাতটা। লাশটার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে এক পর্যায়ে রুমার আর্তনাদ রূপ নেয় কান্নায়। বোধহয় সেই কান্না দেখেই লাশটা সাদা কাপড়ের নীচ থেকে হো-হো করে সমস্ত রুম কাঁপিয়ে হেসে ওঠে। সাদা কাপড়ের উপর থেকে হাসির দমকে লাশটার শরীরের দুলুনি দেখা যায়। রুমা তার স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। সে পাগলের মত লাশের হাতটায় তার অন্য হাত দিয়ে আঁচড়-খামচি দিতে থাকে। কিন্তু তাতেও লাশের হাতটার বজ্রআঁটুনি একটুও আলগা হয় না। এক পর্যায়ে মুখ বাড়িয়ে রুমা লাশের হাতটায় কামড়েও দেয়। তখনই লাশটা শোয়া অবস্থা থেকে তড়াক করে উঠে বসে। লাশের মুখটা দেখা যায়। জল্লাদের মত চেহারার কোনও এক

BanglaBook.org

পুরুষের লাশ। কিছু বুঝে উঠবার আগেই লাশটা রুমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুমাকে মেঝেতে ফেলে গায়ের উপর চেপে বসে। লাশটার কবল থেকে মুক্তির সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় রুমার। পরাজিত রুমার চিল চিৎকার আর কান্নার শব্দে ভেঙে খানখান হয়ে যেতে থাকে সুনসান নীরবতা।

চিৎকারের শব্দে যেন অন্য লাশগুলোও জেগে ওঠে। সেগুলোও স্ট্রেচার থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে রুমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

গায়ের উপর চেপে থাকা জল্লাদের মত চেহারার লাশটা রুমার মুখ চেপে ধরে। থেমে যায় চিৎকারের শব্দ। রুমার মুখ থেকে বেরোয় শুধু চাপা গোঙানি।

এরপর লাশটা যা করে তা ভাবতে এখনও রুমা কেঁপে-কেঁপে উঠছে! সমস্ত শরীর রি-রি করছে! গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে! পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠছে! বমি পাচ্ছে!

লাশটা তাকে ধর্ষণ করে! এবং অন্য লাশগুলোও হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে সেই একই উদ্দেশ্যে।

রুমা কিছুটা ধাতস্থ হতেই বিছানা থেকে নেমে পড়ল। ডাইনিং রুমে যাবে সে। তার খুব পানি পিপাসা পেয়েছে। ডাইনিঙে গিয়ে প্রাণ ভরে পানি খাবে। ঘুম ভাঙার পর তাড়াহুড়ো করে অন্ধকারে বেড সুইচ টিপে বাতি জ্বালতে গিয়ে, বেড সাইড টেবিলের উপরে রাখা পিরিচ দিয়ে ঢাকা পানির গ্লাসটা কাত করে ফেলে দিয়েছিল।

ডাইনিঙে পৌঁছে একটা চেয়ার টেনে বসল রুমা। বসে আরাম করে পানি খাবে। বুকটা এখনও ধড়ফড় করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

পর-পর দু-গ্লাস পানি ঢেলে খেল রুমা। তৃষ্ণার্ত বুকটা বেশ

BanglaBook.org

অনেকটা জুড়াল। লম্বা একটা হাই দিল। হাই দেয়া শেষ হতেই রান্নাঘরের দিক থেকে কেমন মৃদু খুটখাট শব্দ শুনতে পেল। মনে হচ্ছে কেউ রান্নাঘরে রান্না করছে। হাঁড়ির ভিতরে খুন্তি অথবা চামচ দিয়ে নাড়ার শব্দ। এত রাতে কে রান্না করবে?!

রুমা ডাইনিঙের চেয়ার ছেড়ে উঠে রান্নাঘরের দিকে এগোতে লাগল। মশলা পোড়া ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে লাগছে। যতই সামনে এগোচ্ছে ততই গন্ধটা বাড়ছে।

রুমার ধারণা ঠিক–সত্যিই রান্নাঘরে কেউ কিছু রান্না করছে। যে রান্না করছে তাকে পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে। কে হতে পারে? রুমার মা? না, রুমার মা নন। যে রান্না করছে সে অনেক রোগা-পাতলা একটা মহিলা। পরনে জবরজং প্রিন্টের কম দামি শাড়ি।

রুমা বুঝতে পারল, ওটা বোধহয় তাদের বাসার কাজের মহিলা রহিমা। কিন্তু রহিমা এত রাতে কী রান্না করছে?!

রুমা পেছন থেকে ডাকল, 'বুয়া, এই, বুয়া, এত রাতে তুমি কী রান্না করছ?'

রহিমা মুখ না ঘুরিয়ে থমথমে গলায় বলল, 'মগজ রানছি, মগজ! খাইবেন? খাইলে অনেক মজা পাইতেন।'

রুমা ধমকের সুরে বলল, 'এত রাতে তোমাকে কে মগজ রাঁধতে বলেছে?'

'কী করমু কন, আফা, মগজগুলান সব রাস্তায় পইড়্যা আছিল! মরা মাইনষের মাথার মগজ!'

রুমা চড়া গলায় বলে উঠল, 'কী সব আবোল-তাবোল বকছ?! তোমার মাথা কি ঠিক আছে?'

'না, আফা, মাথা ঠিক নাই। মাথাটাই তো ট্রাকে পিষ্যা দিল। এই দ্যাহেন...' বলতে-বলতে রহিমা তার মুখটা ঘুরাল। রহিমার মুখটা দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রুমার।

থিকথিকে রক্তে মাখা একটা মুখ। মাথাটা সম্পূর্ণ থেঁতলানো।

BanglaBook.org

সেই থেঁতলানো মাথা থেকে মগজ মিশ্রিত ঘন আঠাল রক্ত বেয়ে নামছে।

রুমা বিকট স্বরে ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে উঠল। রুমার চিৎকারের শব্দে রুমার বাবা-মা ঘুম থেকে জেগে ছুটে এলেন।

রুমা বিকারগ্রস্তের মত একটানা চিৎকার করেই যাচ্ছে আর ভয়ে কাঁপছে। রুমার মা রুমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'কী হয়েছে, মা, তোর?! কী হয়েছে?! এত রাতে রান্নাঘরে কী জন্যে এসেছিস?'

রুমার বাবাও রুমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলতে লাগলেন, 'কী দেখে ভয় পেয়েছিস? কী দেখে?! এত রাতে রান্নাঘরে কী করছিস?'

রুমা মা-বাবাকে দেখে সংবিত ফিরে পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, 'রহিমা বুয়া!! রহিমা বুয়ার মাথাটা থেঁতলানো! থেঁতলানো মাথা থেকে রক্ত-মগজ বেয়ে-বেয়ে নামছে।'

রুমার বাবা-মা দু'জনেই সাঙ্ঘাতিক অবাক গলায় বলে উঠলেন, 'কোথায় রহিমা?! এত রাতে রহিমা আসবে কোত্থেকে?! গত সপ্তাহেই না রহিমা ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্য ওর দেশের বাড়ি গেছে!'

'না, না, রহিমা বুয়া একটু আগেও এখানে ছিল। মগজ রাঁধছিল। ওর নিজের মাথার মগজ! ট্রাকের চাকায় পিষে গিয়ে ওর মাথার সমস্ত মগজ ছিটকে রাস্তায় পড়েছে, সেই মগজ!'

রুমার মা মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'চুপ কর, মা, চুপ কর। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে তোর যে কী হয়েছে! উল্টো-পাল্টা আচরণ করছিস!'

রুমার বাবা বললেন, 'কালই রহিমার দেশের বাড়ি খবর পাঠিয়ে, রহিমাকে আসতে বলছি। রহিমা আসার পর নিজেই বুঝতে পারবি তুই যা বলছিস তা ঠিক নয়। রহিমার কিচ্ছু হয়নি।

BanglaBook.org

শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছিস। হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখেছিস, নয়তো বা ঘুম-ঘুম চোখের অতি কল্পনা।'

পরের দিন রহিমার দেশের বাড়িতে খবর নিয়ে জানা গেল, রহিমা বাড়ি যাবার পথে একটা ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে। ট্রাকের চাকা রহিমার মাথাটা পিষে একেবারে থেঁতলে দিয়ে যায়। রক্ত-মগজ ছিটকে পড়ে রাস্তায়।

ছয়

রুমার বাবা-মা রুমাকে পরামর্শ দিয়েছেন—রুমার আর ঘরে শুয়ে-বসে সময় না কাটিয়ে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম শুরু করা উচিত। সর্বপ্রথমে অফিসে জয়েন করা, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আগের মত সময় কাটানো, শপিং করা, দর্শনীয় জায়গায় বেড়াতে যাওয়া...এসব করলে তার মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন, উদ্বেগ, ভয়...দূর হয়ে যাবে।

রহিমার বিষয়টা সম্পর্কে বলেন, ওটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। মাঝে-মাঝে এমনটা হয়। দেখা যায় না, অনেকেই কোনও নিকট আত্মীয় মারা যাবার আগে তাঁকে স্বপ্নে দেখে; তাই বলে এর পেছনে কোনও অলৌকিক ব্যাপার রয়েছে বলে মনে করার যৌক্তিকতা নেই।

রুমা বাবা-মায়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে অফিস করা শুরু করেছে। মাঝে-মাঝে অফিস শেষে কোনও কফি হাউসে বা রেস্টুরেন্টে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে আড্ডাও দিচ্ছে। ছুটির দিনে মায়ের সাথে শপিং করতে যাচ্ছে। কখনও আবার বন্ধু-বান্ধবী বা

BanglaBook.org

মা-বাবার সাথে পার্কে, নদীর পাড়ে, চিড়িয়াখানায় বা দর্শনীয় কোনও জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছে।

কিন্তু কোনও কিছুতেই রুমা তেমন উৎসাহ পায় না। পায় না কোনও আনন্দ। মনমরা হয়ে থাকে। সবসময়ই তার মনের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। কেমন গা ছমছম লাগে। সারাক্ষণই মনে হয় তাকে ঘিরে আশপাশে কারা যেন আছে। তাদেরকে চোখে দেখা যায় না। তারা শরীরধারী নয়, অশরীরী!

অফিস শেষে রুমা রিকশায় করে বাড়ি ফিরছে। রিকশাটা চলছে গোরস্থান রোড ধরে। এই রাস্তার ধারে বিশাল একটা মুসলিম গোরস্থান রয়েছে। সেই জন্যই এই রাস্তার নাম গোরস্থান রোড।

রুমা তার রিকশা থেকে অনেকটা সামনে দেখতে পেল, অনেকগুলো লোক লাশ সমেত একটা খাটিয়া কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে–'আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা–হা ইল্লাল্লা-হু...'

লোকগুলো বোধহয় লাশটাকে গোরস্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

লাশ বহনকারী লোকগুলোর কারণে রাস্তায় একটা ছোট-খাট জ্যামের মত হয়েছে। রিকশা-গাড়িকে লোকগুলোর পিছন-পিছন পাশ কাটিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে হচ্ছে।

রুমার রিকশাটা এখন একেবারে লোকগুলোর পিছনে। রুমার চোখ পড়ে খাটিয়ার উপরে সাদা কাফনে মুড়ানো লাশটার দিকে। লাশটার দিকে চোখ পড়তেই তার বুকটা ধক করে উঠল। ভয় লাগা সত্ত্বেও কেন যেন সে লাশটা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারল না। একদৃষ্টে লাশটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ রুমা দেখতে পেল খাটিয়ার মধ্যে লাশটা ধীরে-ধীরে উঠে বসছে। এটা কী করে সম্ভব!!! সে কি চোখে ভুল দেখছে?!

BanglaBook.org

লাশটা উঠে হাঁটু মুড়ে বসল। মুখের উপর জড়ানো সাদা কাফনও ধীরে-ধীরে খুলে পড়ল। মুখটা দেখা গেল। রোগা চিমসে চেহারার এক লোকের মুখ। মুখ ভর্তি খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। গাল ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে। চোয়াল, কণ্ঠার হাড় বিচ্ছিরিভাবে জেগে রয়েছে। যেন লোকটা যক্ষ্মায় মারা গেছে।

লাশটার চোখ দুটো খুলে গেল। ঘোলাটে চোখ। লাশটা সোজা রুমার দিকে তাকিয়ে বিকৃত-ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গিতে হাসল।

রুমা যেন এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল। ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করে উঠে চোখ সরিয়ে ফেলল। অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে ভয়ার্ত অস্পষ্ট গলায় প্রলাপ বকার মত কিছু এলোমেলো বকতে লাগল।

রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আফা, আফনের কী হইছে?! এমন করত্যাছেন ক্যান?!'

রুমা ভীত গলায় কোনওক্রমে বলল, 'ওদিকে তাকিয়ে দেখো—খাটিয়ার মধ্যে লাশটা উঠে বসেছে!!'

রিকশাওয়ালা হাসি মাখা গলায় বলল, 'আফায় যে কী কন! আফনে নিজেই চাইয়া দেহেন, লাশ যেমন থাকার কথা তেমনই আছে।'

রুমা রিকশাওয়ালার কথায় সাহস সঞ্চয় করে আবার খাটিয়ার দিকে তাকাল। তাকিয়ে দেখে, রিকশাওয়ালা যা বলছে তা ঠিক। সে তা হলে এতক্ষণ ভুল দেখেছে!!! এসব কী হচ্ছে তার সঙ্গে! লোকজন তো তাকে পাগল ভাবতে শুরু করবে! রিকশাওয়ালা হয়তো এতক্ষণে তাকে তেমনই কিছু ভেবে নিয়েছে।

রুমা যতটা সম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এখন তাড়াতাড়ি চলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

বাড়িতে ফিরেই রুমা ওর মাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ-ভেউ করে

BanglaBook.org

কাঁদতে লাগল।

রুমার মা ওর কান্না দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'মা, তুই এমন করে কাঁদছিস কেন?! কী হয়েছে তোর?! বল, মা, কী হয়েছে?...'

রুমা কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'মা, আমি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি!!!'

'কেন, মা, তোর এমনটা কেন মনে হচ্ছে?!'

রুমা অফিস থেকে ফেরার পথে গোরস্থান রোডে ঘটে যাওয়া ঘটনা সবকিছু জানাল মাকে।

সব শুনে রুমার মা নানানভাবে রুমাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন। রুমা পুরোপুরি ধাতস্থ হবার পর বললেন, 'যা, মা, এখন গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নে। আজ সারা দিন যা গরম পড়েছে! অনেকক্ষণ ধরে ভালভাবে গোসল করলে সারা দিনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হবে। মনটাও পুরোপুরি শান্ত হবে। মন থেকে সমস্ত ভয়-ডর চলে যাবে। নিজেকে একেবারে সজীব-সতেজ লাগবে। আমি তোর জন্য বরফ কুচি দেয়া লেবুর শরবত বানিয়ে রাখছি।'

রুমা শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে শ্যাম্পু মাখা মাথা দু'হাত দিয়ে আঙুল চালিয়ে-চালিয়ে ধুচ্ছে। তার চোখ বন্ধ। চোখ খুলে রাখলে শ্যাম্পুর ফেনা চোখে গিয়ে চোখ জ্বালা করবে। হঠাৎ রুমা টের পেল, তার হাত দুটো ছাড়াও আরও একটা হাত পিছন থেকে তার মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাচ্ছে। হাতটা বরফের মত ঠাণ্ডা। রুমা ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। পিছনে কুৎসিত, বিকৃত, ভয়ঙ্কর চেহারার এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। রুমার ভীত চোখ দেখে বৃদ্ধা খল-খল করে বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে কালো ধোঁয়ার মত হয়ে বাথরুমের টালি বসানো

BanglaBook.org

দেয়ালের ভিতর মিলিয়ে গেল। আয়নায় নিজেকে দেখার সময়ও হঠাৎ-হঠাৎ রুমা নিজের জায়গায় এই বৃদ্ধার চেহারাটাই দেখতে পায়।

রুমা আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করতে-করতে বাথরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। রুমার চিৎকার শুনে রুমার মা ছুটে এলেন।

'আবার কী দেখে ভয় পেয়েছিস?! বাথরুমে আবার কী দেখতে পেয়েছিস?!'

রুমা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'কুৎসিত চেহারার এক বুড়িকে। মুখটা যেন আগুনে ঝলসানো! তার ওপর অন্ধ! চুলগুলো পাটের আঁশের মত! লম্বা-লম্বা নখ...আয়নায় নিজেকে দেখার সময়ও মাঝে-মাঝে এই বৃদ্ধার চেহারাটাই ফুটে উঠতে দেখি। মা, আমি মনে হয় পাগল হয়ে গেছি!'

রুমার মুখে বৃদ্ধার চেহারার বিবরণ শুনে ওর মা এতটাই অবাক হয়েছেন যে তাঁর মুখ থেকে কথা বের হতে বেশ সময় লাগল। তিনি তোতলাতে-তোতলাতে কোনওক্রমে বললেন, 'কী বলছিস, মা, তুই!! তুই সেই অন্ধ বৃদ্ধাকে দেখতে পাস?!'

রুমা তার মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারল তার মা বৃদ্ধার ব্যাপারে আগে থেকেই কিছু জানেন।

রুমা ব্যাকুল গলায় বলল, 'মা, বাবা আর তুমি মনে হয় আমার কাছে কিছু লুকিয়েছ। ওই কুৎসিত বুড়ি সম্পর্কে তোমরা আগে থেকেই কিছু জানো। যা জানো আর গোপন করে না রেখে আমাকে জানাও। আমার এই ভয় পাওয়া রোগের পেছনে নিশ্চয়ই ওই বুড়িরই কোনও হাত আছে।'

রুমার মা বলতে লাগলেন, 'না, মা, বুড়ি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। তুই যেমন চেহারার বুড়ির কথা বললি তেমন চেহারারই এক বুড়ি এসে তোকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিল। তোকে জানাইনি এই ভেবে যে অমন কুৎসিত চেহারার এক বুড়ির রক্ত

BanglaBook.org

তোর শরীরে–এটা জেনে তোর যদি মন খারাপ হয়, গা ঘিন-ঘিন করে, নিজেকে অশুচি ভাবিস...এসব কথা ভেবে। তুই সুস্থ হতে-হতে, হাসপাতালে থাকাকালীন–নার্স-ওয়ার্ডবয়দের মধ্যে কানা-ঘুষো শুনছিলাম, সেই রাতে নাকি বুড়ির রক্ত নেয়া শেষে বুড়ি কোথায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছিল। কেউ তাকে হাসপাতাল থেকে বেরোতে দেখতে পায়নি, অথচ তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ওসব কানাঘুষো নিয়ে মাথা ঘামাইনি, তোকে নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলাম। তোকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলাই ছিল তখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তোকে বাঁচানোর জন্য রক্তের প্রয়োজন ছিল, বুড়ির কাছ থেকে রক্ত পেয়ে যাই–সেটাই সেই মুহূর্তে যথেষ্ট ছিল। বুড়িটা বাঁচল, না মরল, না গায়েব হলো–তা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়।'

রুমা কিছু মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ওই কুৎসিত চেহারার বুড়ি আমাকে রক্ত দিয়েছে, তোমার মুখে এটা শুনে এখন আমার মনে পড়ল–ওই পাগলি বুড়ির কারণেই তো আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। পাগলিটা আমাকে, "রক্ত লাগবে...রক্ত..." বলে তাড়া করছিল।'

রুমার মা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এসব কথা তো কিছুই আমাদের জানাসনি!!'

রুমা ধরা গলায় বলল, 'মা, আমার কিচ্ছু মনে ছিল না! অ্যাক্সিডেন্টে সব আমি ভুলে গিয়েছিলাম! এই মাত্র মনে পড়ল।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাত

নির্জন গভীর রাত। আজ আবার দুঃস্বপ্ন দেখে রুমার ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নটা এমন ছিল—রুমা যেন ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে সাজছে। হঠাৎ আয়নায় তার চেহারাটা বিকৃত হতে লাগল। মুখের চামড়া কুঁচকে ভাঁজ-ভাঁজ আর কালো হয়ে গেল। উঁচু নাকটা বসে গিয়ে কুঁচকানো মুখের মাঝে মিলিয়ে গেল। শুধু নাকের ফুটো দুটো দেখা গেল। ঠোঁট দুটো ফুলে উঠে গাড়ির টায়ারের মত রূপ ধরল। কান দুটো খরগোশের কানের মত লম্বা হয়ে গেল। চুলগুলো লালচে উষ্কখুষ্ক জঙ্গুলে রূপ নিল। চোখ দুটো ঘোলাটে হতে-হতে একেবারে সাদা হয়ে গেল। সে বুঝতে পারে মাঝে-মাঝে আয়নায় নিজের চেহারার পরিবর্তে কুৎসিত বৃদ্ধার যে চেহারা ফুটে উঠতে দেখে, এটা সেই চেহারা নয়। এটা তার নিজেরই চেহারা! নিজের চেহারারই বিকৃত রূপ!

ঘুম ভাঙার পর রুমা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে স্বপ্নটা নিয়ে ভাবছে। বেড সুইচ টিপে বাতিটাও জ্বালল না। আজকাল তার ভয়-ডর একেবারেই কমে গেছে। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে সে এত সব ভয়ানক দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছে যে এখন ভয়-ডর তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

রুমা সিটি হসপিটালে গিয়ে সেই নার্সের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। সেই নার্স, যে ওই কুৎসিত বৃদ্ধার শরীর থেকে রক্ত নিয়েছিল।

নার্স মেয়েটা রুমাকে সেই রাতের ঘটনা সব জানিয়েছে। রক্ত

BanglaBook.org

দেয়া শেষে বৃদ্ধার পুড়ে অঙ্গার হওয়া, এরপর অঙ্গার দেহটা অদৃশ্য হওয়া, নার্সের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি–সেই কথা, সব জানিয়েছে রুমাকে।

অন্য কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক রুমা নার্স মেয়েটার সব কথা বিশ্বাস করেছে। নার্স মেয়েটার সাথে সে-ও একমত–ওই বৃদ্ধা কোনও স্বাভাবিক মানুষ ছিল না, অশুভ কিছু ছিল। ওই বৃদ্ধার রক্ত আজ তার শরীরে বলেই সে বিভিন্ন ভীতিকর অস্বাভাবিক দৃশ্যের মুখোমুখি হচ্ছে।

রুমা বেড সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ডাইনিঙে গিয়ে পানি খেল। শুনতে পেল রান্নাঘরে কেউ খুটখাট শব্দ করে রান্না করছে। নিশ্চয়ই অশরীরী রহিমা! অশরীরী রহিমা গভীর রাতে রান্নাঘরেই থাকে।

অশরীরী রহিমার উপস্থিতি টের পেয়েও রুমার কোনও ভাবান্তর হলো না। রোজকার ঘটনা! সে এখন এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে নিজের রুমে ফিরে এল। বাথরুমে ঢুকবে বলে পা বাড়িয়েছিল। শুনতে পেল, বাথরুমের ভিতরে কারা যেন ফিসফাস করে কথা বলছে। আবার কারা! অশরীরীরা! অশরীরীরা আজকাল রুমার আশপাশেই থাকে।

রুমা বাথরুমে না ঢুকে ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। নিজের সুন্দর মুখটা একটু আয়নায় দেখবে। মনে হয় না খুব বেশি দিন তার মুখটা এমন সুন্দর থাকবে। ধীরে-ধীরে তার চেহারা বোধহয় স্বপ্নে দেখা মুখের রূপই ধারণ করবে। কিছুটা পরিবর্তন হতে শুরুও করেছে। গায়ের বিচ্ছিরি গন্ধটা বেড়েই চলছে। দামি পারফিউমের সুন্দর গন্ধও এখন আর সেই বিচ্ছিরি গন্ধকে চাপা দিতে পারছে না। শরীরের দুর্গন্ধের কারণে সে আজকাল বাইরের লোকদের সামনে তেমন একটা যায় না। সারাক্ষণ ঘরের মধ্যেই থাকে। ঘর অন্ধকার করে রাখে। অন্ধকারে

BanglaBook.org

থাকতে তার ভাল লাগে।

রুমা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগল। কী সুন্দর একটা মুখ! চোখ দুটো বড়-বড় আর আন্তরিক! মাথা ভর্তি দীঘল কালো লম্বা চুল! ফর্সা-নিখুঁত মুখমণ্ডল! নাকের ডগাটা লালচে, ভেজা-ভেজা!

হঠাৎ আয়নায় রুমার চেহারার পরিবর্তে দেখা গেল সেই কুৎসিত চেহারার বৃদ্ধাকে। রুমা মোটেও চমকাল না। এমনটা তো প্রায়ই হয়।

আয়নায় বৃদ্ধা খলখল করে হাসতে লাগল।

রুমা ধমকে উঠল, 'হাসার কী হলো?! হাসছ কেন?'

বৃদ্ধা হাসতে-হাসতে বলল, 'তোমার কথা ভেবে হাসছি। তোমার এই সুন্দর মুখটা আমার চেহারার মত কুৎসিত হয়ে যাবে।'

রুমা গর্জে উঠল, 'তোমার জন্যই তো আজ আমার এই দশা।'

বৃদ্ধা বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

রুমা আগের মত চটা গলায় বলল, 'না, তোমার কোনও সাহায্যের আমার দরকার নেই। তুমি সাহায্যের নামে আরও কী ক্ষতি করতে চাও?!'

'ঠিক আছে, তোমাকে আমার সাহায্য নিতে হবে না। কিন্তু আমার অবস্থা এমনটা কী করে হলো সেটা তোমার জানতে ইচ্ছে করে না? জানতে চাও না, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কেন তোমার জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছি—এসব?'

রুমা কিছু বলল না, চুপ করে রইল। বৃদ্ধা বলতে লাগল, 'দশ-বারো বছর আগে আমিও তোমার মত একটা যুবতী মেয়ে ছিলাম। এমন বুড়ো মানুষদের মত চেহারা ছিল না। তোমার মত অতটা হয়তো সুন্দরী ছিলাম না, তাই বলে দেখতে একেবারে

BanglaBook.org

খারাপও ছিলাম না। নাম ছিল দীপালি। গরীব হিন্দু পরিবারের মেয়ে। এইচ.এস.সি পর্যন্ত লেখাপড়াও করেছিলাম। সংসারে সচ্ছলতা আনতে শহরে এসে সিটি হসপিটালে নার্সের চাকরি নিই। সব ভালই চলছিল। তখন সিটি হসপিটালে মর্গের কেয়ারটেকারের কাজ করত শুকুর নামে একজন। আমি তাকে শুকুর ভাই বলে ডাকতাম। মহিষের মত বলশালী চেহারার লোক। যে কেউই প্রথম দেখায়ই বুঝতে পারবে লোক বেশি সুবিধের নয়। অবশ্য আমি তখন বুঝতে পারিনি। রাতের বেলা সে মর্গের ভিতরে বসে মদ-টদ খেত। মাঝে-মাঝে লুকিয়ে-সুকিয়ে তার দু'-একজন বন্ধু-বান্ধবও নিয়ে আসত। মর্গের ভিতরে বসে তারা মদ খেত, তাস খেলত, হাসি-ঠাট্টা করত। মর্গের নিরিবিলি পরিবেশ হয়তো তাদের কাছে মদ খাওয়া, জুয়া খেলার জন্য আদর্শ জায়গা ছিল। অবশ্য এসব আমি কিছুই জানতাম না। পরে জানতে পারি। মাত্র তো কিছুদিন হয়েছিল নার্সের চাকরিটা নিয়েছিলাম।

'এক রাতে, রাত দেড়টা কি পৌনে দুটো বাজে। কেবিনের এক পেশেন্টকে ইঞ্জেকশন দেবার ছিল। ইঞ্জেকশন দেয়া শেষে করিডর ধরে ফিরছি। শুকুর ভাইকে দেখতে পাই। সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, "দীপালি, আজ সন্ধ্যায় মর্গে যে লাশটা রাখা হইছে, সে ই লোকটা বোধহয় মরে নাই। দু'-একবার গোঙানির মত শব্দ করছে। তুই এসে একটু পরীক্ষা কইরা দেখবি? এত রাইতে ডাক্তারদের জানাইলে, ধমক খাইতে হইবে। ডাক্তারগুলান হইছে সব এক নম্বরের হারামি।"

'আমি কিছু না ভেবে বলি, "ঠিক আছে, চলেন, গিয়ে দেখি।"

'শুকুর ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে মর্গে ঢুকি। সে যে লাশটাকে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয় সেই লাশটার হাতের নাড়ি ধরে দেখতে থাকি। অবাক হয়ে যাই, সত্যিই লাশটার পালস পাওয়া যায়! এর মানে লোকটা জীবিত! উত্তেজিত গলায় বলি, "শুকুর

ভাই, এখনই ডাক্তারদের জানাতে হবে। এখনই! লোকটা জীবিত!!"

'শুকুর ভাই হা-হা করে হাসতে থাকে। অবাক হয়ে আমি তার হাসিরত মুখের দিকে তাকাই। ঠিক তখনই স্ট্রেচারে শোয়া, লাশ মনে করা লোকটার হাত আমার কাঁজ এঁটে ধরে। শুকুর ভাই হাসতে-হাসতে বলে, "ওই দেখ্, আমারও একটা লাশ জাইগ্যা উঠছে।"

'তাকিয়ে দেখি সত্যিই পাশের স্ট্রেচারে আরও একটা লাশ সাদা কাপড় ঠেলে উঠে বসছে। তত্ক্ষণে আমি বুঝে যাই এরা কেউই লাশ নয়। এদের মতলব খারাপ।

'আমি চিৎকার দেবার আগেই শুকুর এসে আমার মুখ চেপে ধরে।'

বলতে-বলতে আয়নার মধ্যে বৃদ্ধা ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'তিনজন মিলে সেই মর্গ রুমেই কতগুলো লাশের সামনে সারা রাতভর আমাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে! বাধা দেয়ার কেউ থাকে না। ওই তিনজন ছাড়া যারা থাকে তারা তো সবাই লাশ।'

রুমা কণ্ঠে সহানুভূতি নিয়ে, বলে উঠল, 'তুমি এদের বিরুদ্ধে কিছু করলে না?'

'কী আর করব বলো! আমার মত গরিব ঘরের অসহায় একটা মেয়ের পক্ষে কী-ই বা করার আছে! হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানাই। তারা তদন্তের ব্যবস্থা নেয়। শুকুর প্রমাণ করে দেয়–সেই রাতে সে হাসপাতালেই ছিল না। সন্ধ্যা রাতেই মায়ের অসুখের কারণে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। উল্টো আমিই খারাপ চরিত্রের মেয়েমানুষ। তার সঙ্গের সেই দু'জন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, আমি নাকি টাকার বিনিময়ে এর-ওর সাথে রাত কাটাই। সেই রাতে ওদের সঙ্গে কাটিয়েছি। এক অটো-

রিকশাওয়ালা এসে সাক্ষ্য দেয়, সেই রাতে রাত দুটোর দিকে তার অটো-রিকশায় করেই ওই দু'জনের সাথে ফকিরাপুলের এক বাসায় যাই। খুব ভোরে হসপিটালে ফিরে আসি।

'সব শুনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়। এক বুক কষ্ট, লজ্জা আর অপমান মাথায় নিয়ে গ্রামে ফিরে আসি। ভাবি আত্মহত্যা করে এই কষ্ট, লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে মুক্তি নেব। আবার ভাবি যারা আমার এমন সর্বনাশ করল তাদের কিচ্ছু হবে না? তারা এভাবে পার পেয়ে যাবে? প্রতিশোধ নিতে কী করতে পারি আমি? কেউ কি আছে আমার হয়ে ওদেরকে শাস্তি দেবে?

'মনে পড়ে এক তান্ত্রিকের কথা, যাকে সবাই শ্মশান তান্ত্রিক নামে চেনে। আমাদের গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে নদীর পাড়ে একটা শ্মশান আছে। সেই শ্মশানেই শ্মশান তান্ত্রিক থাকে।

'শ্মশান তান্ত্রিককে গ্রামের কেউ ভাল চোখে দেখে না। সবাই তাকে ভয় পায়, ঘৃণা করে। সে খুবই ভয়ঙ্কর এক তান্ত্রিক! জাদু-টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র, বাণ মারতে জানে। সে কোনও পোশাক পরে না। উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। শুধুমাত্র গায়ে চিতার ছাই মেখে রাখে। দিনের বেলা তাকে দেখা যায় না। শ্মশানের পাশের বিশাল বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। রাতে বেরিয়ে আসে। শ্মশান পোড়ানো শবদেহের রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট পোড়া-ঝলসানো মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। শব সাধনা করে। শব সাধনা করতে কুমারী মেয়েদের মৃতদেহ লাগে। কুমারী মেয়েদের মৃতদেহের বুকের উপর বসে এই সাধনা করতে হয়। তার কিছু গোপন ভক্ত-অনুরাগীও আছে। তারাই কুমারী মেয়েদের মৃতদেহ জোগাড় করে দেয়। মনে হয় কবর থেকে চুরি করে আনে। অথবা অন্য কোনওভাবে। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের ধারণা, সুবিধে মত কোনও কুমারী মেয়েকে একা বাগে পেলে হত্যা করেও শব সাধনায় লিপ্ত হতে দ্বিধা বোধ

BanglaBook.org

করে না তান্ত্রিক।

'এক গভীর রাতে গোপনে সেই তান্ত্রিকের কাছে যাই। আমার সাথে যে অন্যায় হয়েছে সব তাকে জানাই। প্রতিশোধ নিতে তার সাহায্য চাই।

'সব শুনে তান্ত্রিক সাহায্য করতে রাজি হয়। তান্ত্রিক গমগমে গলায় বলে, "তোর প্রতিশোধ তুই-ই নিবি। আমি শুধু তোর মধ্যে প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা দিয়ে দেব।"

'শুরু হয় আমার গোপনে-গোপনে যজ্ঞে বসা আর তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা।

'সাধনার এক পর্যায়ে তান্ত্রিক বলে, "এখন তোর শরীরে মৃত মানুষের রক্ত নিতে হবে। তা হলেই তুই প্রতিশোধ নিতে পারবি।"

'আমি অবাক হয়ে বলি, "মৃত মানুষের রক্ত?!"

' "হ্যাঁ, মৃত মানুষের রক্ত তোর শরীরে ঢুকাতে হবে।"

"মৃত মানুষের রক্ত তো জমে যায়। সেই রক্ত কীভাবে নিজের শরীরে নেব!"

'তান্ত্রিক বলে, "মৃত্যুর সাথে-সাথেই রক্ত জমে যায় না।"

'বুঝে যাই কী করতে হবে। তান্ত্রিককে আবার প্রশ্ন করি, "মৃত মানুষের রক্ত শরীরে নিলে কী হবে?! তাতে কীভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে?!"

"মৃত মানুষের রক্ত শরীরে নেয়ার পর মৃত আত্মাদের তুই দেখতে পাবি। তাদের সাথে কথা বলতে পারবি। তারা তোর যে কোনও নির্দেশ পালন করবে। সবসময় তোর আশপাশে থাকবে। মর্গ রুমে যে লাশগুলোর সামনে তোকে লাঞ্ছিত করা হয়, সেই লাশেরাই তোর হয়ে প্রতিশোধ নেবে।"

'আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি কবে একটা সদ্য মৃত লাশের দেহ থেকে রক্ত বের করে নিজের শরীরে ঢুকাব। গ্রামের কেউ

BanglaBook.org

অসুস্থ শুনলেই সেখানে ছুটে যাই। সবসময় অসুস্থ লোকটার পাশে-পাশে থাকি। মৃত্যুর অপেক্ষা করি। নার্সের চাকরি করতাম বলে অসুস্থ লোকের পাশে আমাকে পেয়ে সবাই খুশিই হত। অবশেষে একদিন সুযোগ এসে যায়। আমার চোখের সামনে একটা লোকের মৃত্যু হয়। দেরি না করে সবার অলক্ষে মৃত লোকটার হাতের শিরায় সুঁই ঢুকিয়ে, সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে খানিকটা রক্ত নিয়ে নিজের শরীরে প্রবেশ করাই।

'তান্ত্রিকের কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি হয়। মৃত মানুষের রক্ত শরীরে নেবার পর আত্মাদের দেখতে শুরু করি। প্রথমটায় বেশ ভয় লাগত। পরে সব ঠিক হয়ে যায়। আত্মাদের কাছ থেকে জেনে নিই কীভাবে প্রতিশোধ নিতে হবে।

'আত্মাদের নির্দেশ মত একদিন শহরে গিয়ে লুকিয়ে সিটি হসপিটালের মর্গে ঢুকে প্রত্যেকটা লাশের কানে-কানে বলে আসি প্রতিশোধ নেবার কথা।

'পরের দিনই পেপারে দেখতে পাই: সিটি হসপিটালের মর্গের ভিতর মর্গের কেয়ারটেকার সহ তিনজনের রহস্যজনক মৃত্যু। কেউ বলতে পারে না মর্গে তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল।

'এদিকে আর একটা ঘটনা ঘটে—তান্ত্রিক গ্রামের এক অল্প বয়সী কুমারী মেয়েকে একা পেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে শব সাধনায় বসে। এই ঘটনায় সমস্ত গ্রামবাসী তান্ত্রিকের উপর ভয়ানক খেপে যায়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। সবাই একত্রিত হয়ে শব সাধনারত অবস্থায়ই তান্ত্রিককে পাকড়াও করে ফেলে। সবাই মিলে খুব নির্মমভাবে তান্ত্রিককে মেরে ফেলে। মেরে তান্ত্রিকের লাশটা শ্মশানের মাটিতেই পুঁতে দেয়।

'আমার প্রতিশোধ নেয়া শেষ হলেও মৃত আত্মারা আমার সঙ্গ ছেড়ে যায় না। শুরু হয় আমার অভিশপ্ত জীবন। যেন নরকের অভিশাপ নেমে আসে আমার উপর। আত্মাদের নিয়েই বাস,

BanglaBook.org

আত্মাদের নিয়েই থাকা। স্বাভাবিক জীবন-যাপন বদলে যায়। নিজের চেহারাটা পরিবর্তন হতে থাকে। দিনে-দিনে চেহারাটা প্রেতাত্মাদের মত কুৎসিত রূপ নেয়। চুলগুলো বুড়ো মানুষদের মত সাদা হয়ে যায়। গা থেকে আসে মৃত মানুষের দুর্গন্ধ। স্বাভাবিক কোনও খাবারও খেতে পারি না। খেতে গেলে বমি আসে। আমার লোভ জাগে মরা-পচা খাওয়ার প্রতি। লোকালয় ছেড়ে থাকতে শুরু করি বিভিন্ন শ্মশানে-কবরস্থানে। সেসব জায়গায়ই আমি খুঁজে পাই আমার পছন্দের খাবার আর আত্মা সঙ্গীদের। জীবন্ত একটা প্রেতাত্মায় পরিণত হই। লোকে আমাকে দেখলে ভয় পায়, ঘৃণা করে, দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

'নরক জীবন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকি। বুঝতে পারি মৃত্যুই আমার একমাত্র পথ। কিন্তু মৃত্যুও আমাকে ধরা দেয় না। উঁচু স্থান থেকে লাফিয়ে পড়ি, চলন্ত গাড়ির নীচে চাপা পড়ি, কেরোসিন ঢেলে নিজের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিই, ট্রেনের নীচে কাটা পড়ি...কিন্তু কিছুতেই আমার মৃত্যু হয় না। মৃত্যু হবে কীভাবে–মৃত মানুষের রক্ত শরীরে নিয়ে আমি তো আগে থেকেই মৃত! ভাবি ওই অভিশপ্ত রক্ত শরীর থেকে বের করে ফেললেই বুঝি মৃত্যু হবে। নিজের মুখ-হাত-পা নখ দিয়ে আঁচড়ে-খামচে চিরে শরীর থেকে সব রক্ত বের করে ফেলতে চাই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরের সমস্ত ক্ষত শুকিয়ে রক্ত বের হওয়া থেমে যায়।

'মৃত্যুর জন্য পাগলের মত হয়ে উঠি। দিশেহারার মত মুক্তির পথ খুঁজতে থাকি। এক সময় মনে হয় আমার এই অভিশপ্ত রক্ত অন্য কাউকে দিতে পারলেই বুঝি মুক্তি মিলবে।'

রুমা ক্রোধান্বিত গলায় বলে উঠল, 'তখন তুমি আমাকে ওই অভিশপ্ত রক্তের শিকার বানাও। নিজের মুক্তির লোভে অন্যের জীবনকে অভিশপ্ত করো।'

BanglaBook.org

'না, তাতেও আমার মুক্তি মেলেনি। শরীরটা ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এখনও আমার আত্মার মুক্তি মেলেনি।'

রুমা গর্জে উঠল, 'তাতে কী! মাঝখান থেকে তুমি তো আমার জীবনটাও ধ্বংস করলে। এখন আমিও তোমার মত একটা জীবন্ত প্রেতাত্মা হয়ে যাব!'

'এখন আমি তোমার এবং আমার দু'জনেরই মুক্তির উপায় জানি।'

রুমা ব্যগ্র গলায় বলল, 'কীভাবে?! কীভাবে এই অভিশপ্ত রক্ত থেকে মুক্তি মিলবে?!'

'যেহেতু আমি ওই শ্মশান তান্ত্রিকের নির্দেশে এবং তার মন্ত্রবল ব্যবহার করেই ওই অভিশপ্ত রক্ত শরীরে নিয়েছিলাম–তাই ওই রক্ত তাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'সেটা কীভাবে?!!! তাকে তো গ্রামবাসীরা মেরে ফেলেছে!'

'তান্ত্রিকের দেহাবশিষ্টের উপরে তোমার শরীরের খানিকটা রক্ত ফেললেই তাকে এই অভিশাপ ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

আট

রুমা তার বাবা-মায়ের সাথে শিবপুর গ্রামে এসেছে। এটাই দীপালিদের গ্রাম। এই গ্রামের শ্মশানেই পুঁতে ফেলা হয়েছিল তান্ত্রিকের লাশটা।

রুমা আর ওর বাবা-মা গ্রামের লোকজনদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে শ্মশানের ঠিক কোন্ স্থানে তান্ত্রিককে পোঁতা হয়েছিল। দু'জন মাটি কাটা কোদালিও ঠিক করে ফেলেছে। মাঝ রাতে গোপনে কোদালিদের দিয়ে শ্মশানের সেই স্থানটা খোঁড়াবে।

BanglaBook.org

চারদিক অন্ধকার। খাঁ-খাঁ করছে। দমকা হাওয়ার মত হাওয়া বইছে। একটা হ্যাজাক বাতির আলোতে বলশালী দুই কোদালি তান্ত্রিককে পুঁতে ফেলা শ্মশানের সেই স্থানটা অতি দ্রুত খুঁড়ে চলেছে। পাশে দাঁড়িয়ে রুমা আর রুমার বাবা-মা দেখছে।

খুঁড়তে-খুঁড়তে এক পর্যায়ে দেখতে পাওয়া গেল তান্ত্রিকের মাথার খুলি আর হাড়গোড়। কোদালিরা খোঁড়া বন্ধ করল। রুমা ব্লেড দিয়ে তার হাত চিরে হাড়গোড়গুলোর উপর রক্ত ফেলতে লাগল।

প্রতি ফোঁটা রক্ত ঝরার সঙ্গে-সঙ্গে রুমার মনে হতে থাকে, তার শরীরটা যেন হালকা হয়ে যাচ্ছে, ভেতর থেকে অভিশাপ বের হয়ে যাচ্ছে।

রুমার শরীরের বেশ অনেকটা রক্ত তান্ত্রিকের হাড়গোড়ের উপর ঝরানো শেষে কোদালিরা আবার জায়গাটা আগের মত মাটি ফেলে ভরাট করে দিল।

পরিশিষ্ট

রুমা এখন পুরোপুরি অভিশাপমুক্ত। এখন আর সে আত্মাদের দেখতে পায় না। ভুলু নামের পোষা কুকুরটার সঙ্গে এখন আবার তার আগের মত খাতির। তার জীবনটা আবার খুশিতে আর আনন্দে ভরে উঠেছে। তার বিয়ের কথা-বার্তা চলছে।

গভীর রাত। বাইরে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। রুমা তার বিছানায় বেঘোরে ঘুমাচ্ছে।

অনেক দিন পর আজ আবার রুমা একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে সে শিবপুর গ্রামের শ্মশানটাকে দেখতে পাচ্ছে। সেখানেও সাঙ্ঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। ক্ষণে-ক্ষণে বিজলি চমকাচ্ছে। বিজলি

BanglaBook.org

চমকানোর আলোতে দেখা যাচ্ছে–শ্মশানের যে স্থানে তান্ত্রিককে পোঁতা হয়েছিল সেখানকার ভিজে নরম মাটি ঠেলে, মাটির ভিতর থেকে একটা মানুষ উঠে আসছে।

বাস্তবিকই রুমার কাছ থেকে অনেক দূরের শিবপুরের সেই শ্মশানে একটা মানুষ মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে। এই মানুষটাই শ্মশান তান্ত্রিক। সে পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার মৃত হাড়গোড়ের উপর রুমার শরীরের অভিশপ্ত রক্ত পড়ার পর থেকে তার দেহ আবার নতুনভাবে গড়তে শুরু করে। আজ এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে সে পুনর্জন্ম লাভ করল। এখন তার ক্ষমতা আরও বেড়ে গেছে। ইচ্ছে করলে সে যে কোনও মানুষের রূপ ধারণ করতে পারবে। তার ক্ষমতা আরও বাড়াতে, সমস্ত পৃথিবীকে বশে আনতে, অমর হওয়ার জন্য তাকে আবার শব সাধনা করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয়–যে মেয়েটার শরীর থেকে অভিশপ্ত রক্ত পেয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছে সেই মেয়েটাকেই শব সাধনায় ব্যবহার করতে পারলে। মেয়েটা কুমারী। প্রয়োজনে মেয়েটার বিয়ের পাত্র সেজে সে মেয়েটাকে হাসিল করবে।

***

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org